মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স : কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৫৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ ১৩৬১

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

বেঙ্গল পাবলিশার্স,

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রাকর—রঞ্জনকুমার দাস

শনিরঞ্জন প্রেস,

৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড,

কলিকাতা—৩৭

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

এক

১

নয়নতারা ক্লাব ও পাঠাগারের বড় হল ঘরটাতে আজ সন্ধ্যায় একটি সভা বসেছে। গোড়ায় এটির নামকরণ হয়েছিল স্থানীয় একজন প্রবল প্রতাপান্বিত ম্যাজিস্ট্রেটের নামে, যদিও স্বর্গীয়া নয়নতারার উপযুক্ত ছেলে ভৈরবই চাঁদা দিয়েছিল সব চেয়ে বেশি—দি ব্যাণ্ডেন পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাণ্ড ক্লাব। ক'বছর আগে একুশ সালে বাংলা ঘুরবার সময় গান্ধীজী ঘণ্টা তিনেকের জন্য এখানে পদার্পণ করে এক স্তূপ বিলাতী কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যান, সেই আগুনে পুরানো নামটি পুড়ে এই নাম হয়েছে।

ক্লাব শব্দটাকে বদলে সঙ্ঘ করার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু মতভেদ ঘটে। সঙ্ঘ বলতে নাকি রাজনৈতিক গন্ধ এসে যায়! াবশেষ কোন রাজনৈতিক আন্দোলন চালাবার উদ্দেশ্যেই সঙ্ঘ করা হয়, এই শহরেই যেমন দু-তিনটি আছে। এটা হল বিশুদ্ধ ক্লাব, দশজন ভদ্রলোকের মেলামেশা গল্পগুজব ব্রিজ খেলার এবং মাঝে মাঝে তরুণদের সহযোগিতায় পূজা পার্ব্বণ অভিনয় ইত্যাদি আনন্দ করার স্থান। অনর্থক রাজনীতির গন্ধওলা সঙ্ঘ নামে দরকার কি?

তবে লাইব্রেরিকে পাঠাগার করতে কারো আপত্তি হয় নি। ভৈরবের ইচ্ছা ছিল এই সুযোগে নিজের নামটা জুড়ে দেবে। চেষ্টা করলে হয়তো পারত। দুটি কারণে ভরসা হয় নি। ব্যাণ্ডেন সায়েব উঠতে উঠতে তখন অনেক উঁচুতে উঠে সশরীরে বর্ত্তমান, নাম খারিজের জন্য তার রাগটা নিজের উপর নেওয়া উচিত হত না। তা ছাড়া ব্যাণ্ডেনের বদলে নিজের নামটা দিলে লোকেও গোলমাল করত। হয়তো পাল্টা প্রস্তাব করত মৃত বা জীবিত কোন স্মরণীয় স্বদেশী নেতার নাম দিতে। তখন আর না বলার পথ থাকত না, ভৈরব নিজেও

তো স্বদেশী! তার চেয়ে মা'র স্মৃতিরক্ষা করে ভাল হয়েছে। চারিদিক বজায় থেকেছে।

হঠাৎ ডাকা জরুরী সভা, সভ্যেরা কিন্তু গাদাগাদি করে এসেছে। শহরের উকিল ডাক্তার চাকুরে পেন্সনভোগী ভদ্রলোকেরা। ঘর জোড়া মস্ত লম্বা টেবিলের চারিদিকে ঘিরে বসেছে প্রায় পঞ্চাশ জন বিশিষ্ট সভ্য। কয়েকজন সাধারণ ও অল্প-বিশিষ্ট সভ্যকে দেয়াল ঘেঁষে বেঞ্চি পেতে বসতে দেওয়া হয়েছে, তারা কিন্তু দাঁড়িয়েই আছে। এদের মধ্যে অনেকে হয় সময়মত এসে চেয়ার বা বেঞ্চ দখল করতে পারে নি, অথবা মুরুব্বি গোছের বিশিষ্ট মানুষ দেখে সবিনয় হাসির সঙ্গে আসন ছেড়ে দিয়ে ভদ্রতা রক্ষা ও আত্মরক্ষা করেছে। বাইরের বারান্দার দুটি বড় বড় দরজায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে একদল ছেলে।

একটি ছেলে বসে আছে ঘরের মধ্যে, টেবিলের একমাথায় মান্যগণ্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে চেয়ারে। বাড়ন্ত গড়নের একটু কাঠখোট্টা চেহারা ছেলেটির, বয়স অনেক বেশি মনে হয়। মুখে বয়সের ছাপটা ঠিক ধাঁধার মত, আদুরে কচি ছেলের ঢল ঢল কোমলতার সঙ্গে এমন খানিকটা পাকা বখাটে ভাব মিশে আছে যে, তার মধ্যে যখন যেটা চোখে পড়ে সেটাকেই খাপছাড়া মনে হয়। ছেলেটির নাম প্রকাশ, হাই স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। এই প্রকাশ্য সভায় আজ প্রকাশের এক গুরুতর অপরাধের বিচার হবে এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হবে। শাস্তি যা দেবার সেটা অবশ্য ভৈরব নিজেই দেবে; তার ভাগ্নের কান মলতে বা তাকে বেত মারতে অন্য কেউ হাত তুললে সেটা উল্‌টে হবে ভৈরবের অপমান। ভৈরব না নিয়ে এলে এ বেসরকারী আদালতে বজ্জাত ছোঁড়াকে বিচারের জন্য হাজির করবার ক্ষমতাই বা ছিল কার? ভৈরব ব্যাপারটা গ্রাহ্য না করলে অবশ্য অন্য ব্যবস্থা হত। ভৈরব নিজেও টের পেত এত বড় ব্যাপারটা উপেক্ষা করার মজা।

ভৈরব আর ভুবনের মধ্যে আছে সামাজিক মান-কষাকষি। মান থেকে মন।

যারা ভুবনের কাছে বসেছে, নীচুগলায় জোর দিয়ে তারা বলে, সহজে ছাড়বেন না কিন্তু। ঘা'টা যেন ভৈরবেরও লাগে। তফাত থেকে উঠে এসেও দু-একজন তাকে প্রায় এই কথাই বলে যাচ্ছে। আগেও অনেকবার বলেছে।

তাই কি ছাড়ি?—ভুবন বলেছে মৃদু হেসে।

প্রকাশ কি শাস্তি পাবে না পাবে তা নিয়ে ভুবনের খুব বেশি মাথাব্যথা নেই, যে কোন একটা শাস্তি পেলেই হল। আসলে শাস্তি যা পাবার এখন থেকেই পাচ্ছে ভৈরব, তাতেই ভুবন খুশি। শহরের দশজন ভদ্রলোকের সামনে প্রকাশ্য ভাবে ভৈরবকে যে অপদস্থ হতে হচ্ছে, মাথা তার হেঁট হয়ে যাচ্ছে, এটাই ভুবনের আসল লাভ। শুধু ক্ষমা চাওয়ার মধ্যেও যদি শেষ হয় ব্যাপারটা, সে ক্ষমা চাওয়া হবে ভৈরবেরই। এমন গণ্যমান্য মামা হাজির থাকতে স্কুলের একটা ছেলের আবার কিসের ক্ষমা চাওয়া, বিশেষ করে এ রকম সভায়! শুধু ওই ছোঁড়া হলে, স্কুলে হেড মাস্টারকে জানালেই সোজাসুজি ওর শাস্তি হত। এত কাণ্ড করবার দরকার কি ছিল তবে!

টেবিলের উত্তর পাশের লম্বা সারির মাঝামাঝি গম্ভীর মুখে বসে আছে ভৈরব। মাথা তার হেঁট নয়, মুখে লজ্জা বা অপমানের চিহ্নও নেই। তবু তার দিকে চেয়ে খুশি হয়ে উঠছে ভুবন। সভার কাজ একবার আরম্ভ হলে হয়। সব তার রেডি করাই আছে। ক্লাবের সভ্য তিনজন ভদ্রলোককে দিয়ে সে জোর গলায় ঘোষণা করবে, প্রকাশের অমার্জ্জনীয় অপরাধের পেছনে ভৈরবের পরামর্শ ছিল, উসকানি ছিল। মৃদু ক্ষমার সুরে তারা উল্লেখ করবে ছেলেটির অল্প বয়সের কথাটা, পিছনে খুঁটি না থাকলে কি এত সাহস হয় এইটুকু ছেলের! ইঙ্গিতের পর ইঙ্গিত ছড়াবে নানা কৌশলে যে আসল অপরাধী ভৈরব। অনেকের মন বিষিয়ে যাবে, তিতো হয়ে উঠবে লোকটার বিরুদ্ধে। অনেকে বিরক্ত হবে।

একটা ব্যাপার শুধু ভাল লাগছে না ভুবনের। মনে বড় একটা খটকা লেগেছে তার। কলকাতা থেকে অনন্তলালের কাল মফস্বলের এই শহরে এবং আজ এই সভায় হঠাৎ আবির্ভাব। এই শহরেরই সে ছেলে, আত্মীয়স্বজনেরা এখনো তার পুরানো ভিটে দখল করে বসবাস করছে। ভৈরবের সঙ্গেও বুঝি প্যাঁচালো একটা কি সম্পর্ক আছে তার। পরীক্ষা পাসের কৃতিত্বে অনন্ত এ শহরের মুখোজ্জ্বল করেছিল; শহরের মুখ সে আরও উজ্জ্বল করেছে ব্যারিস্টারীতে অল্পসময়ে অসাধারণ পশার জমিয়ে এবং গত আন্দোলনে যোগ

দিয়ে নেতা হিসাবে নাম করে। নাম ও সম্মান তার আরও বেড়েছে আইন সভার ইলেকসনে দাঁড়িয়ে। শহরে তার পদার্পণের খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে, শহরবাসীর পক্ষ থেকে সম্বর্দ্ধনা-সভার আয়োজন তাড়াতাড়ি গড়ে তোলা হচ্ছে। আগে থেকে উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার আয়োজন গড়ে উঠবার যথেষ্ট সময় না দিয়ে, কোন খবর না দিয়ে এমন আচমকা তার কলকাতা ছেড়ে এখানে আসবার মানে হয়তো কল্পনা করা গেলেও যেতে পারত। বিশেষত যখন সস্ত্রীক এসেছে। এটা তার দেশবাড়ী, যতই রোজগার করুক আর উপরে উঠুক, দেশবাড়ীতে বেড়াতে আসবার সখ কি মানুষের হয় না? কিন্তু বিনা নোটিশে, বিনা সম্বর্দ্ধনার আয়োজনে, এমন কি, বিনা আহ্বানে সে এ সভায় আসে কেন? এটাই উদ্ভট ঠেকছে ভুবনের কাছে।

কথা বলছে প্রায় সকলেই, পরস্পরে অথবা একজন কয়েকজনকে শুনিয়ে। তবু সভা যেন সংহত, সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে টের পাওয়া যায়। সকলের মধ্যে প্রত্যাশা ও আগ্রহের ভাবটা স্পষ্ট। এলোমেলো ভাব কেটে গিয়ে সভা এবার থমথম গমগম করছে। সভার কাজ আরম্ভ হলেই সকলে চুপ করে সেদিকে মন দেবে, গমগম চাকের গুঞ্জন থেমে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

গোড়ায় বুড়ো শিবকালী সরকার মশায়কে সভাপতি করা হবে ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব উলটে পালটে গেল।

সভাপতি হবার জন্য বুড়ো শিবকালীবাবুর নাম প্রস্তাব করার ঠিক কয়েক সেকেণ্ড আগে অনন্তলাল উঠে দাঁড়ায়। সানন্দ হাসিমুখে একবার সকলের মুখে চোখ বুলিয়ে ঘরের লোকের মত সহজ স্বরে বলে, সভার কাজ এবার আরম্ভ করা যাক্, কি বলেন আপনারা? মিছামিছি দেরি করে লাভ কি! তা ছাড়া আমার ওপর হুকুম জারি হয়েছে যে এখান থেকে ফিরবার পথে বয়ন-সঙ্ঘ হয়ে যেতে হবে। ওঁরা নাকি সারাদিনের কাজ-কর্মের পর সাতটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত চরকা কাটেন, দুটো তাঁত বসিয়েছেন। দেশ-গাঁয়ে ফিরে জানা শোনা চেনা মানুষের এমন একটা বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার কেন্দ্র যদি না দেখে যাই, আজ আমার ঘুম হবে না নিশ্চয়।

হাসি মুখ, শান্ত নির্ব্বিকার। এখন মোটে সওয়া সাতটা, এগারটা বাজতে

অনেক দেরি। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। একুশ-বাইশের আন্দোলনের জোয়ার কেটে ভাঁটা এসেছে অনেক দিন, মানুষের মনে বড় হতাশা, বড় ব্যাকুলতা। আশেপাশে কিছুই ঘটছে না, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আগামী নির্ব্বাচনে ভৈরব আর ভুবনের লড়াই ছাড়া। এখন একমাত্র ভরসা তো অনন্তলালের মত মানুষেরা, যদি তারা কিছু করতে পারে!

সভার আবহাওয়ায় কেমন একটা পরিবর্ত্তন আসে। টেবিলের পূব-পশ্চিম কোণে কয়েকজন কি বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে। ভুবন অবস্থাটা অনুমান করে তাড়াতাড়ি শিবকালী সরকার মশায়কে সভাপতি করার ব্যবস্থা করে ফেলবার জন্য উঠতে না উঠতে ওদিকের কোণ থেকে মনোমোহন ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আমাদের বড় ভাগ্য যে অনন্তবাবুর মত লোককে অকস্মাৎ ঘটনাচক্রে আমরা আজ আমাদের মধ্যে পেয়েছি। আমি অনন্তবাবু বললাম, যদিও অনন্ত বলাই উচিত ছিল, কারণ, ছেলেবেলায় একদিন ওর সঙ্গে এই শহরে ধূলোমাটি মেখে খেলা করেছি, তুই-তুকারিও করেছি, যদিও অনন্ত আমার দু-তিন ক্লাস নীচেই পড়ত। কিন্তু নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনায় উনি আজ এমন স্তরে উঠে গেছেন যে ধূলো-মাটির খেলার সাথীদের কাছেও উনি মহাপুরুষ। যাই হোক, আমি লম্বা বক্তৃতা দেব না, সভাপতির নাম প্রস্তাব করতে উঠে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিলে আপনারাও হাসবেন। যাই হোক, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে আমরা যখন ভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত অনন্তবাবুকে আজ আমাদের এই সভায় পাইয়াছি, তিনি আজ সভাপতিত্ব করিয়া আমাদের বাধিত ও আনন্দিত করিবেন।

আধবুড়ো শ্রীধর উকিল উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব সমর্থন করে বলে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। সত্য কথা বলিব কি, আমার প্রাণটা কেমন যেন আনচান করছে। সময় বয়ে যায়, কাল-স্রোতের মত। আজ যে শিশু, কাল সে বালক, পরশু তরুণ, পরদিন সে আবার বৃদ্ধ, আমারি মত মরণের প্রতীক্ষায় ধুঁকছে। কিন্তু জীবন কি? মরণ কি? কেহ কি কোনদিন তাহা জানিয়াছে? হাঃ, হাঃ, হাঃ! ও সমস্যার সমাধান নাই। একমাত্র সত্য— কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের প্রতীক আমাদের এই অনন্তলাল। কর্ম্মণ্যেবাধিকার বলিয়া যে একমাত্র সার্থক মন্ত্র আছে, জগতে সেই মন্ত্রের সাধক, ভবিষ্যৎ মহাপুরুষ।…

শান্ত সমাহিত স্তব্ধ সভা। অনন্ত উঠে দাঁড়ায়। আপনজনের মত মৃদু হাসি আর শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে আবার তাকায় চারিদিকে। বলে, আমায় কি বিপদে ফেললেন বলুন তো? এতদিন পরে ফিরে এলাম, কোন কিছু জানি না, আমাকেই করে দিলেন সভাপতি! আপনাদের স্নেহ প্রীতির সম্মান আমি তুচ্ছ করব না। ভুল চুক হলে দায়ী কিন্তু আপনারা।

অনন্ত বসে, ভুবন ও তার অনুগতদের মধ্যে গুঞ্জন আরম্ভ হয়। ভুবন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, একটা গুরুতর, অতি গুরুতর বিষয়ে এ সভা ডাকা হয়েছে। সভাপতি মহাশয় অনুমতি দিলে—

অনন্তও উঠে দাঁড়ায়। বিক্ষুব্ধ জনতাকে সংযত করার ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে বলে, নিশ্চয়। নিশ্চয়। এবার সভার কাজ আরম্ভ হবে। এই ছেলেটির দুষ্টামির—

দুষ্টামির! ভুবন গর্জন করে ওঠে, আমাকে আগে বলতে দিতে হবে। আমি ব্যাপারটি সভায় উপস্থিত করতে চাই।

অসহায় হতাশভাবে অনন্ত এদিক ওদিক সকলের মুখের দিকে তাকায়, ভুবনের বাহাদুরিতে, গর্জ্জনে, সে বড় বিব্রত, বিরক্ত, আহত হয়েছে। ভুবনের দিকে চেয়ে জোর গলায় কিন্তু বিনা গর্জ্জনে সে বলে, সবাই বলবেন, যার যা কিছু বলার আছে। কিন্তু হৈ হৈ রৈ রৈ হলে তো আমি এখানে থাকতে পারব না। একটা সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হৈচৈ আমার বিশ্রী লাগে, কুৎসিত লাগে। দেশের সব কাজ করা যখন বাকি আছে, দেশকে স্বাধীন করার চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন করা—

তিন দরজায় জমায়েৎ ছেলেরা উল্লাস জানায়। ভুবন হঠাৎ চমকে ওঠে। সভা আবার থমথম গমগম করে।

আমি বলি কি, খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে অনন্ত বলে, যে ছেলেটির বিচারের জন্য আমরা জমা হয়েছি, তাকেই আগে তার যা কিছু বলার আছে বলতে দেওয়া হোক। এটা নিশ্চয় ইংরেজের আদালত নয়, যেখানে স্বরাজ চাই বলেছিলাম প্রমাণ হতে না হতে আমার ছ'মাস জেল হল? ছেলেটি আগে বলুক, দোষ করেছে কি করে নি। যদি স্বীকার না করে, তখন দোষ প্রমাণ

করার ফ্যাসাদটা বাধ্য হয়েই মানতে হবে। কিন্তু সব যদি মেনেই নেয় ছেলেটি, মিছামিছি হাঙ্গামা করে কি লাভ! একটি স্কুলের ছেলে, অবুঝ ছেলে, একটা কাজ করে বসেছে বলে তার বিরুদ্ধে এমন একটা কাণ্ড করা আমার কাছে বড় লজ্জার বিষয় মনে হয়। পাকা, আই মিন, প্রকাশ, উঠে দাঁড়িয়ে বল তো তোমার কি বলার আছে?

প্রকাশ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, আমি স্বীকার করছি যে আমার দোষ হয়েছিল। রাখালবাবুকে মারা আমার উচিত হয় নি। এক বছর ধরে চাওয়া মাত্র ওই বইগুলি রাখালবাবু আমাকে দিয়েছেন—

কোন্ বইগুলি প্রকাশ?—অনন্ত প্রশ্ন করে।

পাকা চোখ নামিয়ে চুপ করে থাকে।

খানিক চুপ করে থেকে অনন্ত আর একবার আরও স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করলে প্রকাশ মরিয়া হয়ে বলে, কতকগুলি উপন্যাস আর সেক্সের বই।

কি কি বই?—অনন্ত প্রশ্ন করে।

আগে থেকে শেখানো-পড়ানো আছে, তবু প্রকাশ এবার রেগে যায়, আপনি জানেন না?

অনন্ত ধমক দিয়ে বলে, আমার জানার কথা হচ্ছে না প্রকাশ। তুমি কি জান বলো।

প্রকাশ একটু চুপ করে থেকে কলের মত বলে যায়, পঁচিশ-ছাব্বিশখানা খারাপ ধরণের বই লাইব্রেরিতে আছে। আর সেক্স-সাইকলজির কুড়ি-বাইশটা বই আছে। সেক্রেটারির পারমিশন ছাড়া ওসব বই ইস্যু করা বারণ। আমি আজ এক বছর বিকেলে খেলা বন্ধ করে এসে রাখালের, মানে, রাখালবাবুর কাছ থেকে এসব বই নিয়ে পড়েছি, নটার আগে ফেরত দিয়ে বাড়ি চলে গেছি। সেদিন স্যাণ্ডার্সের প্রিন্সিপলস্ অব লাভ বইটা চাইতেই কোথাও কিছু নেই খেঁকিয়ে উঠে রাখাল বলল, যা যা ফচকে ছোঁড়া, লভের বই পড়তে হবে না।

ফচকে ছোঁড়া বলেছিল রাখালবাবু তোমাকে?

লাইব্রেরিয়ান রাখালের বয়স কুড়ি-বাইশ, অনেক দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। ভুবনের বাড়ীতে সে থাকে। তার তীক্ষ্ণ গলার প্রতিবাদ শোনা যায়।

আমি যদি বলে থাকি—

অনন্ত বলে, আপনি চুপ করুন।—বলেছিল?

বলেছিল। আরও বলেছিল, আমার মামা এবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকসনে হেরে যাবে, চামারটাকে কেউ ভোট দেবে না। তাইতে রাগ সামলাতে না পেরে আমি ওকে মেরেছি। একটা ঘুষি আর লাথি খেয়েই যে মর মর হয়ে হাসপাতালে যাবে, আমি তা ভাবতে পারি নি।

চুপ কর প্রকাশ! অনন্ত প্রচণ্ড ভাবে তাকে ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। সভাকে সে বলে, ছেলেটা লজ্জায় দুঃখে ভয়ে ভাবনায় আধমরা হয়ে গেছে। প্রকাশ! তোমায় ক্ষমা চাইতে হবে।

রাখালকে, মানে রাখালবাবুকে মারার জন্য আমি ভারি দুঃখিত।

বাস্! বাস্! অনন্ত সোল্লাসে বলে ওঠে, রাখালবাবুর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আবার গড়ে উঠবে নিশ্চয়। অন্যায় করার দুঃখই তোমার নবজন্ম দিক। বন্দে মাতরম্!

কি ঘটনা কিসে দাঁড়াল! ব্যাপারটার আসল ও গুরুতর অংশটাই রয়ে গেল আড়ালে, চাপা পড়ে গেল। প্রকাশ যা বলল তা মিথ্যে নয়, বানানো নয়, কিন্তু যা নিয়ে আজকের এই সভার এত আড়ম্বর এটুকু তার তুচ্ছ একটা দিক মাত্র। আসল ঘটনা সকলের জানা, সেটাকে আরও ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে তুলে ভৈরবকে সভায় অপদস্থ করার যে আয়োজন ভুবন করেছে তাও প্রায় কারো অজানা ছিল না। পাহাড়কে এ ভাবে ইঁদুর বিয়োতে দেখে অনেকে কৌতুক বোধ করল। পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে জমকালো নাটক দেখতে এসে শুরুতেই অভিনয় ফেঁসে যেতে দেখার মত ব্যক্তি-গতভাবে বঞ্চিত হবার ক্ষোভও অনুভব করল অনেকে। তবে এটাও ভাবল অনেকে যে, অন্য দিকে ক্ষতিপূরণ হয়েছে। অনন্তের কৃতিত্বে কমবেশি মুগ্ধ হয়ে

গেছে সকলেই। অনায়াসে হাসিমুখে খেলার ছলে সে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এমন একটা মান্যগণ্য জমায়েতের মনের গতির! এমন না হলে এত কম বয়সে ব্যারিস্টারিতে এত পশার, নেতা-গিরিতে এমন নাম করতে পারে কেউ!

দু-চারজনের ক্ষীণ এবং ভুবনের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ আর অভিযোগ সভাভঙ্গের বিশৃঙ্খলায় কোথায় ভেসে যায়। চেয়ার ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অনন্ত বিনা বাক্য-ব্যয়ে সভা ভেঙ্গে দিয়েছে। অনেকে তাড়াতাড়ি উঠে কাছে গিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ভুবন অসহায় ক্রোধে অগত্যা নিজে নিজেই ফোঁস ফোঁস করে নিজের লোকের কাছে।

পাকা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল অনন্তের দিকে। চোখে তার ধাঁধা দেখার অবাক জিজ্ঞাসা। এখন মুখ দেখলে মনে হবে, ছেলেটা বুঝি হাবা-গোবা, ভাবুকতা আর পাকামির মেশানো ছাপটা মিলিয়ে গেছে। অনন্তের বাহাদুরি তাকে মোটেই মুগ্ধ করে নি, ওটা বাহাদুরিও হয়ে ওঠে নি তার কাছে, অন্য একটা শব্দ এসেছে মনে সংজ্ঞা হিসাবে—চালবাজি—তার মনে আঘাত লেগেছে কঠিন। ছেলেবেলা থেকে এই মানুষটাকে সে বোধ হয় অন্য সবার চেয়ে ভয় ও ভক্তি করে এসেছে, তার কাছে অনন্ত অনেক উঁচু, অনেক বড়, দৃঢ়চেতা কর্তব্যনিষ্ঠ চরিত্রবান মানুষ। সে যে এমন ছল চাতুরী অভিনয় জানে, দেশ ও স্বাধীনতার নামে ফাঁকি দিয়ে বোকা বানাতে পারে এতগুলি মানুষকে এমন গা-ছাড়া অবহেলার সঙ্গে, এ কথা সে ভাবতেও পারত না। হাঙ্গামা যে অল্পেই মিটে গেছে এজন্য তার বিশেষ দুঃখ নেই, কিন্তু কি দরকার ছিল এ ভাবে অল্পে হাঙ্গামা মেটাবার? একটুখানি সত্য নিয়ে পাক দিয়ে চালাকি করে এমন মিথ্যা খাড়া করবার? তেমন গুরুতর প্রয়োজন থাকলেও সে নয় বুঝতে পারত এ রকম ঘোরপ্যাঁচ চালবাজির মানে। বিশেষ বই ইস্যু করা নিয়ে রাখালের সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল, কিন্তু ফচকে ছোঁড়া বলার জন্য সে তাকে মারে নি। সে নিজেও কতবার কত বন্ধুকে বলেছে কথাটা। ভুবন এসে রাখালের পক্ষ নিয়ে তাকে ধমক দেওয়ায় তার মেজাজ বিগড়ে যায়। রাগারাগি করে সে চলে গিয়েছিল, ভৈরবকে দিয়ে একখানা স্লিপ লিখিয়ে এনেছিল। ভৈরব অবশ্য জানত না সে কি বই চায়

কিংবা তার স্লিপের জোরে লাইব্রেরি থেকে সে একেবারে পঞ্চাশ-ষাটখানা বিশেষ বই দাবি করে বসবে! মামার সঙ্গে এ ছলনাটুকু সে করেছিল। রাখালের সঙ্গে ঝগড়ার কথা, নিজের আসল মতলবের কথা গোপন রেখে সরল ভাবে চিট্‌টা চেয়ে নিয়েছিল। প্রকাশ্য সভায় এটা মেনে নিতেও রাজি ছিল প্রকাশ। কিন্তু সে যা করেছে, করেছে তার নিজের মামার সঙ্গে, মামাকে যদি সে ঠকিয়ে থাকে তাই নিয়ে বোঝা-পড়া হবে মামার সঙ্গে তার, এর সঙ্গে অন্যের তো কোন সংস্রব নেই। রাখাল কোন্ সাহসে কি যুক্তিতে স্লিপ দেখেও বইগুলি তাকে দিতে অস্বীকার করবে, মামা তার ক্লাব আর লাইব্রেরির প্রেসিডেন্ট? ভৈরবের চিট্ নিয়ে এলেও ভুবনবাবু এবং আরও কয়েকজন কোন্ আইনে রাখালের পক্ষ নিয়ে তাকে ধমকাতে আসবে? বার বার সে জোর দিয়েছিল এই কথাটাতে। রাগে কাঁপতে কাঁপতেও ধীর শান্ত ভদ্রভাবে সকলকে সে বলেছিল, প্রেসিডেন্টের লিখিত অনুমতি সে নিয়ে এসেছে, লাইব্রেরি থেকে যে বই খুশি, যতগুলি বই খুশি নিয়ে যাবার অধিকার তার আছে। তার সঙ্গে তর্ক না করে পরে যেন তারা তার মামার সঙ্গে বোঝাপড়া করে। এরি মাঝে বলা নেই কওয়া নেই রাখাল তাকে দিয়েছিল ধাক্কা। তখন সে মেরেছিল রাখালকে। ভুবনদের সামনেই মেরেছিল।

বাড়িতে আলোচনার সময় অনন্ত বলেছিল, ওরা বলবে তুমি আগে রাখালের গায়ে হাত তুলেছিলে, জোর ক'রে আলমারি ভেঙে বই নিতে গিয়েছিলে।

আমার বন্ধুরা ছিল, তারা দেখেছে—

অনন্ত ঘাড় নেড়েছিল।

তা ঠিক। পাকা তা জানে, মানেও। তার বন্ধুদের, বিশেষ ক'রে কানাই তিনু পাঁচু নরেশদের কথার বিশেষ দাম কেউ দেবে না। এটুকু না বুঝবার মত বোকা সে নয়। হাঙ্গামা করার জন্য, রাখালকে মারার জন্য সে যে সত্যি সত্যি বন্ধু চারটিকে সঙ্গে নিয়ে যায় নি, এরা শুধু বইগুলি বয়ে আনার জন্য সঙ্গে গিয়েছিল, কেউ যে ওরা একটি কথাও বলে নি আগাগোড়া, রাখালকে মারার

সময় কাছে পর্য্যন্ত যায় নি, কেবল ভুবনবাবুরা সাত-আট জন রুখে তেড়ে এসে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এ কথাও কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু কি আসত যেত তাতে? লোক নয় বিশ্বাস করত দল বেঁধেই সে হাঙ্গামা করতে গিয়েছিল, রাখালকে মেরেছিল। রাখালকে মেরেছে এ কথা তো সে অস্বীকার করতে চায় নি, সেজন্য সভায় দুঃখ প্রকাশ করতে সে রাজি হয়েছিল অনন্তের কাছে, দুঃখ প্রকাশও করেছে। ভুবনবাবুরা তার গুরুজনের মত, বয়সে বড় মান্যগণ্য ভদ্রলোক, একটা অন্যায় কথা না বলে থাকলেও তার ব্যবহারকে বেয়াদপি মনে করে ওদের মনে যদি আঘাত লেগে থাকে, ওদের কাছেও সে নয় দুঃখ প্রকাশ করত!

তার বদলে বিশ্রী দোষে সে দোষী হল, ভীরু কাপুরুষ দাঁড়িয়ে গেল সবার চোখে। সে যে মামার কাছ থেকে স্লিপ নিয়ে এসেছিল, সে কথা উঠল না। সবাই জানল, রাখাল তাকে দয়া করে কিছুদিন লাইব্রেরির বই পড়তে দিয়েছিল, অনুগ্রহটা বন্ধ করায় হীন অকৃতজ্ঞ বখাটে ছোঁড়া সে, দল বেঁধে এসে রাখালকে মেরেছে। রাখাল তাকে গাল দিয়েছিল, এ সব বাজে সাফাই গেয়ে আজ নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছে।

আরও জানল সবাই, অনন্তের কুটিল ব্যারিস্টারি চালবাজির ফলে সহজে রেহাইও পেয়েছে।

সে সভায় না এলে যেন কেউ তার কিছু করতে পারত, কোর্টে নালিশ করা ছাড়া।

ভৈরব পারে নি, অনন্ত তাকে রাজি করিয়েছিল। তাও ক্ষমা চাইতে নয়, দুঃখ প্রকাশ করতে। রাখালের জন্য তার সত্যই দুঃখ হয়েছিল, মার খেয়ে তাকে এলিয়ে পড়তে দেখে খেয়াল হয়েছিল, কি রোগা দুর্ব্বল একজনকে সে মেরেছে। অনন্ত সকলকে বোকা বানিয়েছে, তাকেও ঠকিয়েছে। কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে কি জবাব দেবে, অনন্ত যখন তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, তখনও সে বুঝতে পারে নি তার আসল মতলব। সে ভেবেছিল এমনি জিজ্ঞাসাবাদের ভেতর দিয়ে আজেবাজে কথা বাদ দিয়ে অনন্ত যেটা আসল কথা, প্রধান কথা সমস্ত ব্যাপারটার, যা সত্যিকারের মানে তার কাজের, তাই টেনে বার

করবে ; দেখিয়ে দেবে যে তার অধিকার ছিল বই দাবি করার, তবে রাখালকে মারা তার উচিত হয় নি।

খারাপ লাগছে, না? মুন্সেফ সুরেনবাবু কাঁধে হাত রেখে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করে। শান্ত স্নিগ্ধ মিষ্টি তার মুখখানা, একটু শীর্ণ। সুন্দর কীর্ত্তন গাইতে পারে। এখানে বদলি হয়ে এসে কয়েক মাসের মধ্যে শহরের শিক্ষিত ভদ্র-সমাজকে কীর্ত্তন শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিয়েছে। এমনি তার কথাবার্তা চাল-চলন বা খাওয়া পরা জীবন যাপনে বৈষ্ণবত্বের কোন লক্ষণই প্রায় ধরা পড়ে না, মাছ মাংস খায়, ইংরেজী সাহিত্যই বেশী পড়ে, শ'কে নিয়ে অত্যন্ত উৎসাহী, দশজনের মতই সাধারণভাবে দশজনের সঙ্গে মেলে মেশে, হাসি গল্প করে। সরলতা আর নম্র মিশুক স্বভাবের শুধু একটা আকর্ষণ তার আছে, তাকে সকলের ভাল লাগে। কিন্তু কীর্ত্তনে মানুষটা সত্যই গুণী। আসরে গাইতে নামলে তার মধ্যে আশ্চর্য্য এক পরিবর্ত্তন আসে, সে জীবন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, নিজেও বিভোর হয়ে যায় কীর্ত্তনে, উপস্থিত সকলের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় খাঁটি আবেশ, গভীর ব্যাকুলতা।

প্রকাশও দু-তিনবার তার কীর্ত্তন শুনতে গিয়ে ভেতরে জোরালো নাড়া খেয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে সে কীর্ত্তন শিখতে আরম্ভ করেছিল সুরেনের কাছে। তার গলার সাধারণ গান শুনে সুরেনও আগ্রহের সঙ্গে তাকে শেখাতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই শেখার আগ্রহে প্রবল জোয়ার-ভাঁটার খামখেয়ালি লীলাখেলা দেখে শিষ্যের কীর্ত্তন গাওয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মনে রীতিমত খটকা লেগেছে।

তার স্নেহ ও সহানুভূতিতে ফাঁকি ছিল না। শিষ্য বড়ই প্রিয় পদার্থ—স্নেহ করতে ভাল লাগে, অবশ্য যদি বশম্বদ হয়। কিন্তু খাঁটি জিনিসটাও এখন ক্লেদের মত লাগল পাকার কাছে। ভৈরব উঠে চলে গেছে ; শান্ত নির্ব্বিকার ভাবে এর ওর তার সঙ্গে দু-একটি কথা বলতে বলতে। পাকা জানে, আজ এখানে এখন ভৈরব দশজনের চোখের সামনে অনন্তের সঙ্গে একটা কথাও বলবে না, দু'জনের যেন চেনা পরিচয়ও নেই। যদিও সকলেই জানে তারা আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ। অনন্তকে ঘিরে ভদ্রলোকের ভিড় ক্রমে ক্রমে বাড়ছে।

আধ-বুড়ো শ্রীধর উকিলের নিজের দিকে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টাটা এমন করুণ! সুরেনের কথায় নীরবে মাথা নেড়ে পাকা তাড়াতাড়ি হল থেকে বেরিয়ে যায়। ভদ্র বেশ, ভদ্র ভাষা, ভদ্র ভিড়ের ঘাম আর নিশ্বাস চুরুট সিগারেটের গন্ধের চাপে তার ফাঁপর ফাঁপর লাগছিল।

২

কাঁকর বিছানো পথের দুদিকে টেনিসকোর্ট। সাধারণ বন্ধু দু-চারজন নাম ধরে ডাকে পিছন থেকে। সে সাড়াও দেয় না, ফিরেও তাকায় না। যে বন্ধুদের সঙ্গ সে মনে মনে চাইছিল তারা অবশ্য ডাকাডাকির হাঙ্গামা না করেই তার সঙ্গ ধরে।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পাকা বলে কানাইকে, বিড়ি দে।

নরেশ তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়া-মার্কা সিগারেট বার করে।—একটা ছিল, তোর জন্যে রেখেছি। জবর লোক বটে তোর অনন্তমামাটা সত্যি ভাই। হবে না কেন? ব্রেন আছে তো!

আগে একটা বিড়ি দে। পরে সিগ্রেট খাব।

পাঁচু বলে, কি ব্যাপার! আগে বিড়ি, পরে সিগ্রেট?

তিনু বিড়ি দেয়, চারজনকেই। পাকার একটানে চড়চড় করে আধখানা পুড়ে যায় বিড়িটা। পথে নেমে এসে এদের সঙ্গ পেয়ে তার প্রাণ জুড়িয়েছে। ফুঁসে-ওঠা ঈর্ষা অভিমানের আগুন থিতিয়ে গিয়ে অনন্তের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী খেদটা আর ফুটন্ত অবস্থায় নেই। অত বেশি অস্থির হবার জন্য বরং একটু লজ্জাই বোধ হচ্ছে তার। চাঁদের কাঁচা আলোয় পড়ে আছে লাল কাঁকরের লম্বা সড়ক। কার গাড়ি ধুলো উড়িয়ে দিয়ে গেছে, নাকে চেনা মেটে গন্ধের মত লাগছে ধুলোটা।

কালীনাথকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনজনে বিড়ি লুকিয়ে ফেলে, পাকা

ছাড়া। মনের তলা থেকে তার হাতে টান লাগে জ্বলন্ত বিড়িটা পিছন দিকে সরিয়ে ফেলতে নয়তো ফেলে দিয়ে জুতোর নীচে পিষে ফেলতে। কিন্তু বিড়ি লুকনোটা হবে কালীদা'কে ফাঁকি দেবার চেষ্টা। বিড়ি ফুঁকলেও হবে কালীদা'কে অসম্মান করা। তাই রফা সে করে বিড়িটা মুঠিতেই একটু আড়াল করে ধরে রেখে।

প্রৌঢ়বয়সী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক কালীনাথ নয়, বছর সাতাশ বয়সের যুবক মাত্র, ধুতি আর হাতকাটা শার্ট পরা সাদাসিদে বেশ, শক্ত ব্যায়ামী শরীর, ধীর পদক্ষেপ। ছেলেদের কাছে কিন্তু অনেক গুরুজনস্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের চেয়ে তার শ্রদ্ধা ও সম্মান বেশি। গত আন্দোলনে যোগ দিয়ে মাসকয়েকের জন্য জেলে গিয়েছিল। ফিরে এসে চরকাব্রতীদের ঢিমে রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ থেকে সরে গিয়ে অন্য কাজে মন দিয়েছে। একটা ব্যায়াম-সমিতি করেছে ছেলেদের জন্য, ডন বৈঠক সাঁতার কুস্তি বক্সিং ছোরাখেলা যুযুৎসু সবকিছু শেখানো হয়, চরিত্র গড়া হয় আর মানানো হয় কঠোর ডিসিপ্লিন। অনেক কিশোরের মা-বাবা, ছেলেকে হঠাৎ মেয়ের মত লাজুক হয়ে উঠে শুকিয়ে চিমসে মেরে যেতে দেখে যারা ভড়কে গিয়েছিল, ছেলে ব্যায়াম-সমিতিতে যোগ দেওয়ার পর আবার তার চোখ-মুখে স্বাস্থ্যের জ্যোতি ফুটতে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। একটা সেবাসঙ্ঘের পিছনেও কালীনাথ আছে। গত বন্যায় এই সঙ্ঘের রিলিফের কাজ দেখে বড়রাও কালীনাথকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে।

শুধু শ্রদ্ধা নয়, সকলে একটু ভয়ও করে তাকে। দু'দণ্ড তার সঙ্গে মিশলে মানুষ টের পায়, শুধু তেজী সাহসী ত্যাগী নয়, কাজের নিষ্ঠায় চরিত্রের দৃঢ়তায় লোহার মত শক্ত নয়, কি যেন প্রচণ্ড একটা শক্তি আছে তার মধ্যে, ভয়ঙ্কর আবেগের জমানো বিস্ফোরক। তাকে ঘিরে একটা রহস্যের আবরণ নামে অনুভূতিগত কল্পনায়। মনে হয়, সে বুঝি বিপজ্জনকও বটে।

কালীনাথের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করে পাকা। ওর সামনে সে নার্ভাস হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে তার মধ্যে প্রবল একটা বিদ্রোহের ভাবও জাগে। হঠাৎ অবাধ্যতার অবজ্ঞায় মানুষটাকে হুট করে উড়িয়ে দিতে প্রচণ্ড তাগিদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

তুমি তিন দিন যাও নি প্রকাশ, এই ব্যাপারের জন্য কি ?

একটু ইতস্তত করে পাকা।

ঠিক তা নয়, ভোরে ঘুম ভাঙ্গে নি।

ঘুম ভাঙ্গে নি! এ তো চলবে না পাকা। আমার ক্লাবের ছেলে তুমি, ভোরে তোমার ঘুম ভাঙ্গে না! কাল আসবে ?

কাল ? কাল নয় কালীদা, পরশু।

আচ্ছা। কিন্তু তোমার মনে আছে তো এটা তোমার ফার্স্ট স্টেজের শেষ মাস ? ঢিল দিলে চলবে না আর। ক্লাবের নিয়ম কিন্তু ভারি কড়া।

দু'পা এগিয়ে মুখ ফিরিয়ে কালীনাথ ব'লে যায়, তোমায় একটা খবর দি। রাখালের বেশি লাগে নি। হাসপাতালে যাওয়ার কোন দরকার ছিল না।

কানাই বলে, আমারও সন্দ ছিল। ভুবনটা কম ঝানু!

পাঁচু বলে, কি ব্যাপার, মাইরি! মোটে লাগে নি রাখালের ? হি হি করে পাঁচু হাসে, পাকা মোদের বক্সিং শিখছেন, এক ঘুষিতে রাখাল কুপোকাৎ! তাই তো বলি !

তোকে একটা মারব ?

মার। মাইরি মার।

সামনে বেঁকে পাঁচু দাঁড়ায়, বলে, গাঁটের ব্যথা কমেছে ? ছাল ওঠে নি তো রাখালকে মেরে ? আহা বাট!

পাঁচু গাঁয়ের ছেলে, তার বাবা ধনদাস চার ক্রোশ দূরের আটুলিগাঁর গেরস্ত চাষী। পাঁচু এখানে আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে স্কুলে পড়ে। এমনি পাঁচুর চালচলনে গেঁয়ো ছাপ আছে, হাবাগোবাই মনে হয় তাকে। কিন্তু পাকাকে খোঁচা দেবার ব্যঙ্গ করবার সুযোগ পেলেই কী স্মার্ট যে সে হয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে! শহুরে বন্ধু ক'টিকেও যেন ছাড়িয়ে যায়।

তিনু বলে, ভুবনটাকে একদিন দিলে হয় না ক্লাব থেকে ফেরার পথে ?

কানাই বলে, ধেৎ!

কানাই লম্বা, কালো, রোগা। কম কথা কয়।

ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে, গতবার ইচ্ছা করে ম্যাট্রিক দেয় নি। কারণ কেউ জানে

না, বাড়ীর লোকেরাও না। তার সঙ্গে পাকার ভাব হওয়ার ইতিহাস এই যে, তার বাবা রসিকের সাইকেল সারাই-এর দোকানে পাকা প্রায়ই তার পুরানো সাইকেলটা নিয়ে যেত টুকিটাকি মেরামতের জন্য। বন্ধুত্ব জমাট বাঁধতে তাদের মাসখানেকও লাগে নি। তারা দু'জন একা থাকলে কানাই-এর মুখ ফোটে।

পাকা বলে, কোথায় যাওয়া যায়!

তিনু প্রস্তাব করে, তামাক খাবি তো দোকানে যাই চ'।

পাকার উৎসাহ জাগে।—তাই চ'।

তিনুর বাবা ধনেশ সাধুখানের আছে মুদী-দোকান। দোকানে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের, বিশেষ ক'রে পাকাকে, তামাক লজেন্স বিস্কুট খাওয়াবার লোভটা তিনুর সদা জাগ্রত। রোজই প্রস্তাব করে দু-চারবার, যখন তখন। পাকা কান দেয় না, রাজি হয় কদাচিৎ। নেমন্তন্নটা যখন সে গ্রহণ করে খুশির যেন সীমা থাকে না তিনুর।

সৈদবাজার এলাকায় ধনেশের দোকান। ভৈরবের বাড়ীও ওই এলাকায়। সৈদবাজারের আরম্ভ কোথায় শেষ কোথায় দুশো বছর আগে হয়তো সুনির্দিষ্ট ছিল, আজ কোন মহাপুরুষের সাধ্যও নেই সেটা আবিষ্কার করে। ডাকপিয়ন জৈনুদ্দিন আজ একুশ বছর এ শহরে চিঠি বিলি করছে, খাম পোস্টকার্ডের ঠিকানার নামগুলিই তার কাছে সৈদবাজার। রাস্তার দুপাশে শুকনো নালায় ফণিমনসা, পাতাকচু আর বুনো চারার ঝোপ। পথে পুরু ধুলোর আস্তরণ বিছানো। পুরানো ইটের ভাঙ্গাচোরা চৌকো মহলওলা বাড়ীই এই পুরানো শহরের বৈশিষ্ট্য, ইটের স্তূপ হয়ে এখানে সেখানে পোড়ো বাড়ীও পড়ে আছে অনেক, তাতে বাস করে সাপ আর শেয়াল। শহরের প্রাচীনতাই যেন এভাবে স্তূপাকার হয়ে স্থানে স্থানে পড়ে আছে। কতকগুলি বাড়ীর খানিকটা অংশ ভেঙ্গে পড়েছে, বাকিটাতে বসবাস করছে মানুষ। এত বেশি পুরানো যে-সব বাড়ী নয়, সেগুলিরও গড়নের ধাঁচে আর বিবর্ণতায় প্রাচীনতার ছাপ। শহরের এসব এলাকায় নতুন বাড়ী প্রায় চোখে পড়ে না। নতুন বাড়ী দেখা যায় শহরের পুব দিকে, ওদিকের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শহর এখনো নিজেকে বাড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে হাল ফ্যাসনের বাড়ী তুলে তুলে।

ধনেশের বাড়ীর দেয়াল কাঁকর-মেশানো মাটির, পাথরের মত শক্ত, ছাত টিনের। সামনের বারান্দা ঘিরে একাংশ মুদীর দোকান করা হয়েছে। মুদীখানার এদিকের অংশটা ফাঁকা, শুধু পুরানো ভারি তক্তাপোশ পাতা আছে। তিনু তাড়াতাড়ি পাটি বিছিয়ে দেয়। হুঁকোতে জল বদলে রান্নাঘরের আখা থেকে জলন্ত কয়লা দিয়ে তামাক সেজে আনে। হুঁকোটা নতুন, তাদের ব্যবহারের জন্যই তোলা থাকে। ধনেশ নিজেই দোকান থেকে হুঁকোটা দিয়েছে তাদের জন্য। দুদিন বাদে তিনু ম্যাট্রিক দেবে, পাকার মত উঁচু ঘরের ছেলেরা তার বন্ধু, গর্ব্বে ধনেশের বুক আজকাল দশ হাত হয়ে থাকে। পাকা তামাক টেনে চলেছে একমনে, ভাবে বিভোর হয়ে। কালি-পড়া লণ্ঠনটার মৃদু লালচে আলোর মনে হয়, সে যেন এখানে নেই, হারিয়ে গেছে।

একাই ফুঁকে দিবি নাকি? কানাই বলে শেষ পর্য্যন্ত। পাকা চমকে ওঠে। আজ চটে না, লজ্জা পেয়ে হুঁকোটা বাড়িয়ে দেয়। তিনু জানায় যে অনেকটা তামাক দিয়েছে, সহজে ফুরোবে না। ফুরোলে আর এক ছিলিম সেজে আনবে, সামান্য তামাক তো।

কি ভাবা হচ্ছিল ভাবুকমশায়ের? নরেশ বলে খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে।

তা দিয়ে দরকার কি বাবুমশায়ের? পাকা বলে মুখ বাঁকিয়ে।

কি ছোটলোকের মত তামাক টানা! শেষ করে যাই চল।

আমরা ছোটলোক, তামাক টানি। তুই যা নরেশ।

নরেশ সরকারী ডাক্তার ধরণী গোস্বামীর ছেলে। এখানে তামাক খেতে আসা সে তেমন পছন্দ করে না, কড়া তামাক টানতেও পারে না, কাশি আসে। এ দলে আগে তার মেলামেশা ছিল না, পাকার প্রেমে পড়ে এসে ভিড়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ছিল, এদের সঙ্গে এত আড্ডা দিয়ে শহর চষে পাকামি করে বেড়িয়েও গত পরীক্ষায় ফিফ্‌থ্ হয়ে ক্লাসে উঠেছে। তার আগের পরীক্ষায় হয়েছিল সেকেণ্ড। বাড়ীতে তাকে নিয়ে অফুরন্ত হতাশা আর দুর্ভাবনা। নানা ভাবে শাসন তোষণ পেষণ চলে অনিবার। এমনিই ছেলেটা খুব নিরীহ, চেহারাও কোমল, ফরসা মুখখানা সুশ্রী মেয়েলি লাবণ্যে ভরা। একান্ত বাধ্য ছিল সবার কথার, বাপকে ভয়ানক ভয়

করত। তার যে এ কি অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে ভেবে দিশেহারা হয়ে যায় বাড়ীর লোক। ধরণীর প্রচণ্ড শাসনে দু-একটা দিন ভাল ফল দেখা যায়, স্কুল থেকে সময়মত বাড়ী ফেরে, বিকালে খেলে বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যা বেলা পড়তে বসে। পরদিনই হয়তো দশটায় খেয়ে দেয়ে স্কুলে গিয়ে ফেরে রাত দশটায়, বিকালে জলখাবার খেতেও বাড়ী আসে না।

নরেশের জন্য একটু করুণার প্রশ্রয় দেওয়া প্রেমের ভাব আছে পাকার। পাকার অবহেলা নরেশ সইতে পারে না, অন্য কারো সঙ্গে পাকার বেশি ঘনিষ্ঠতা দেখলে সে ঈর্ষায় জলে যায়। মাঝে মাঝে দারুণ অভিমানে সে পাকাকে বর্জন করে। কিন্তু বাপের ভয়ে যদি বা দু-চার দিন দূরে থাকতে পারে, নিজের অভিমান নিয়ে একটা দিনও পারে না। মান অভিমান বিসর্জন দিয়ে পাকার কাছে ছুটে যায়। পাকা কড়া কথা বললে পাংশু বিবর্ণ হয়ে যায় তার মুখ। দেখে বোধ হয় খুশিই হয় পাকা।

ছেলের বন্ধুদের তামাক টানার আসরে ধনেশ এসে উঁকি দেয়। তার মুখভরা খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি, কোঁচা দিয়ে আট হাতি ধুতি পরা।

সে সাগ্রহে সবিনয়ে বলে, বাবারা, শনিঠাকুরের পেসাদ পেয়ে যেতে হবে। ঘর দিয়ে এনে দেবার জো নেই পেসাদ, ভেতরের উঠানে একবারটি যেতে হয়।

তিনুর হাতে হুঁকো ছিল, নামিয়ে রাখে। তার তামাক খাওয়ায় ধনেশের অনুমোদন আছে। স্কুলে না পড়লে হয়তো এ বয়সে তামাক ধরা নিয়ে একটু খিটিমিটি বাধাতো, কিন্তু ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে ছেলে, তার চেয়েও ছেলের আজ বিদ্যা বেশি, তামাক ধরার বয়স তার অবশ্যই হয়েছে। স্কুলের ছুটির দিন এক সঙ্গে ভাত খেয়ে উঠে তামাক খেয়ে আজকাল সে ছেলের জন্য হুঁকোটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে উঠে আড়ালে সরে যায়।

নিকানো উঠানের একপাশে শনি-ঠাকুরের পূজার ব্যবস্থা, বেঁটে ফরসা নন্দ ঠাকুর পুরোহিত।

পাকা বলে, কেমন আছেন পুরুত ঠাকুর ?

কেউ পুরুত বললে নন্দ ঠাকুরের ভীষণ রাগ হয়, সঙ্গে সঙ্গে দশটা সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে প্রায় গায়ের জোরে বুঝিয়ে দেয় যে, সে কুলীন বামুন, পুরুত নয়।

তবে পাকাকে সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়ে দেবার সাহসও নন্দ ঠাকুরের নেই। একবার কটমট করে তাকিয়ে সে পুঁথি পড়ে যায়।

পাড়ার দশ-বারোটি মেয়ে-বৌ বসবার এত জায়গা থাকতে এককোণে ঘেঁষাঘেঁষি গাদাগাদি করে বসে পাঁচালি শুনছে। তারা যেন জমাট বাঁধতে চায়, একেবারে মিশে গিয়ে দলা পাকিয়ে যেতে চায় পরস্পরের সঙ্গে। পরনে মোটা শাড়ী, তবু যেন শুধু আঢাকা গায়ের চামড়াই সম্বল করে এসেছে পাঁচালি শুনতে, প্রসাদ পেতে। লজ্জায় তাই যেন পর্দ্দা খুঁজছে সবার মধ্যে, তারাই সকলে যেন তাদের প্রত্যেকের বোরখা।

কেন? পাকার মনে জিজ্ঞাসা জাগে। দশ জনের মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে নিজেকে একেবারে লোপ করে দিতে চায় কি? এ তো লজ্জা নয়, এ নিছক ভয়, হাড়ে মাসে জড়ানো ভীরুতা। একটি রাখাল যেন হাতের লাঠি উঁচিয়ে আছে, গরু ছাগলের পাল ঠেলাঠেলি করে ঘেঁষে এসে বাঁধছে দল।

ফল মূল বাতাসা নারকেলের সন্দেশ আর শিন্নি—তারা সকলে খুশি হয়ে খায়। খিদেও পেয়েছিল। উঠোনে পূজা, প্রসাদ ঘরে নেওয়াও বারণ। শনি বোধ হয় খুশিই হয়েছে আজ শনিবারের সন্ধ্যায় অনেক ঘরে এরকম পূজা পেয়ে—পূজা দেবে অথচ পূজার প্রসাদ ঘরে নিতে শিউরে উঠবে এটা তো আসলে অবজ্ঞা নয়, ভয়ের পূজা। এরকম ভয়ের পূজায় মানুষও খুশি হয়, দেবতার তো কথাই নেই, মানুষের দেবতা তো মানুষেরই বানানো। নলিনী দারোগা বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে হাঁটুক তাও কেউ চায় না, সে সাপ, সে মারী,—তাতেই নলিনীর কত আনন্দ! ছড়ি ঘুরিয়ে হেলে দুলে চলন দেখলেই টের পাওয়া যায়।

শনি ঠাকুর শুধু পূজা পেয়েই খুশি।

কাড়াকাড়ি করে তারা প্রসাদ খায়, হাসি আনন্দে হাল্কা হয়ে যায় বিপজ্জনক দেবতার ভয়ার্ত্ত পূজার কৃত্রিম থমথমে ভাব। তিনুর সুখ বুকের মধ্যে উথলে মুখে হয়ে থাকে একগাল হাসি। শুধু পাঁচু একটু বিষণ্ণ মনমরা হয়ে যায়।

বলে, আমাদের বাড়ী প্রত্যেক শনিবারে শনিপূজা হয়। প্রত্যেক পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ পূজা।

তাদের সামনেও তিমুর মা ঘোমটা দিয়েছে। ঝকঝকে মাজা গ্লাসে জল এনে দেয় তিমুর বিধবা দিদি, আধ হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকা কিন্তু পিঠে বুকের পাশে কাপড় নেই। তিমুর বুড়ী পিসী মেয়েদের প্রসাদ দেয় হাতে হাতে। পাঁচু উৎসুক চোখে চেয়ে চেয়ে ছাখে। তাদের গাঁয়ের বাড়ীতে হয়তো এমনি প্রসাদ বিতরণ চলছে।

সে আবার বলে, পাকা, যাবি?

কোথা?

মোদের গাঁয়ের বাড়ী? আমি আজ যাব, সাথে আয় না?

বলতে বলতে পাঁচু উৎসাহিত হয়ে ওঠে, আমি গিয়ে যদুকাকাকে বলি, তুইও চট করে বাড়ী গিয়ে সাইকেলটা নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি রওনা দিলে সাইকেলে বারোটা নাগাদ পৌঁছে যাব।

তোর সাইকেল কই?

একটাতেই হবে। একজন রডে বসব, তুই একবার চালাবি আমি একবার চালাব।

তা হয়। সাইকেলও আর একটা জোগাড় করা যায় সহজেই। আবছা চাঁদের আলোয় জনহীন পথে যোল মাইল সাইকেল চালিয়ে গিয়ে মাঝরাতে নিঝুম গাঁয়ে একজনের বাড়ীতে ওঠা, অচেনা গাঁয়ে ঘুরে অজানা লোকের সঙ্গে মিশে একটা দিন কাটানো,—মনে টান লাগে পাকার। কিন্তু অনন্তমামারা কাল বিকালের গাড়ীতে চলে যাবে। নতুনমামীর সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি। পাঁচুর সঙ্গে গেলে দেখা হবে না।

পাকা ভাবে, নাইবা হল দেখা! তাকে কিছু না জানিয়ে নতুনমামী এসেছে কলকাতা থেকে, তা সে আসুক। হয়তো সময় ছিল না চিঠি লেখার, হয়তো ছল করেই জানায় নি। কিন্তু কাল সন্ধ্যায় ওরা পৌঁচেছে, সারাদিনের মধ্যে একবার কি নতুনমামী আসতে পারত না তাদের বাড়ী? অনন্তমামা দু'বার এল। স্কুল কামাই করে সে পথ চেয়ে কাটাল সারাটা দিন। নিজে থেকে সে কালও যাবে না দেখা করতে। কিন্তু কাল যদি নতুনমামী আসে? আটুলিগাঁ চলে গেলে যদি দেখা না হয় তার সঙ্গে?

মন্দ কি হয়? নতুনমামী টের পায় তার জন্য কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই পাকার। প্রায় দু'বছর পরে কাছাকাছি এসেছে দু'জনে কিন্তু পাকার কাছে সে এতই তুচ্ছ যে তার সঙ্গে দেখা না করেই বন্ধুর বাড়ী চলে গেছে আটুলিগাঁ!

না, তা হয় না। যেচে গিয়ে দেখা না করুক, একেবারে শহর ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না। এমন তো হতে পারে যে নতুনমামীও সারাদিন আশা করে বসে ছিল পাকার পথ চেয়ে! তাদের এ বাড়ীতে এত লোকের ভিড়, নতুনমামী এলেই বাড়ীর সবাই তাকে ঘিরে ধরবে, পাকার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলার সুযোগ মিলবে না। তার চেয়ে এটা বুঝে পাকা যদি তার কাছে যায়, বেশ হয় তা হলে—একথা যদি ভেবে থাকে নতুনমামী?

ভাবতে ভাবতে নিজের ওপর চটে যায় পাকা। নিরিবিলি তার সঙ্গে কথা বলার আশায় তার পথ চেয়ে বসে থাকতে গরজ পড়েছে নতুনমামীর! সব তার মনগড়া ছেলেমানুষী। নতুনমামী কি খবর দিয়ে ডেকে পাঠাতে পারত না তা হলে? অনন্তমামাকে বলে দিতে পারত না তাকে যেতে বলতে? তবু, কালকের দিনটা শুধু নতুনমামী আছে এখানে। শহর ছেড়ে একেবারে আটুলিগাঁ চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কি ভাবছিস? পাঁচু ধৈর্য্য হারায়।

না ভাই, আমার যাওয়া হয় না। আর এক শনিবার যাব। তোর বুঝি মন কেমন করছে বাড়ীর জন্যে?

না—পাঁচু অস্বীকার করে।

আমার সাইকেল নিয়ে তুই যেতে পারিস।

পাঁচুর সাইকেলের লাইট নেই। মফস্বলের শহরে আবার সাইকেলের লাইট, অমাবস্যার অন্ধকারেও তারা চেনা রাস্তায় বন্‌বন্ সাইকেল চালায়। তবে শহরের বাইরে রাস্তাটা বড় খারাপ। নিজের টর্চটা সে পাঁচুকে দেয়। পাঁচুর উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়েছে মনে হয়। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে ইতস্তত করে পাকা না গেলে একা যাবে কি না! তারপর হঠাৎ বুঝি আটুলিগাঁয়ে মা-মাসী ভাই-বোনের মাটির দেয়াল টিনে-চাল নিকানো উঠানে ধান-খড় গোয়ালগন্ধী নীড়টির জন্য প্রাণটা আবার আনচান করে ওঠে তার।

আচ্ছা আমি চললাম—বলেই সে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করে দেয়। মনে হয় যেন ছুটছে। কতক্ষণে কাকার বাড়ী পৌঁছে সাইকেলে গাঁয়ের দিকে রওনা দেবে।

তিনু বাড়ীতে রয়ে গেল। থম-থম করছে পাকার মন। ভিতরের অস্থিরতা আরও বেড়েছে। কি শান্ত চারিদিক, শহর কেমন ঘুমন্ত! রাত বুঝি ন'টাও বাজে নি। ঝিঁঝিঁর ডাক আর অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের চীৎকার। কাঁচা পাকা বাড়ীগুলিতে লালচে আলোয় মানুষ জেগে আছে, সাড়াশব্দ নেই, মড়ার মত চুপচাপ। একটা কিছু করার জন্য সে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ছে। হৈ চৈ লাফালাফি হাসাহাসি দুর্দ্দাম দুরন্তপনা নয়, অন্য কিছু, খাপছাড়া কিছু, নতুন কিছু। নয়তো নদীর বালিচড়ায় গিয়ে বসে প্রাণ খুলে গান গাওয়া। যদিও ওসব কিছুই ভাল লাগবে না। সে জানে, ভাল লাগবে না। বাড়ীতে থাকলে কবিতা লিখত। তাও ভাল লাগত না। কাল রাত্রে ভাল লেগেছিল, ইচ্ছা হয়েছিল কবিতা লিখতে। প্রথম কটা লাইন গড়গড় করে এসেছিল, ভাবতে হয় নি, মনে হয়েছিল চমৎকার হয়েছে কবিতাটা। সকালে উঠে ভাল লাগে নি।

তাতে আপসোস নেই। কেউ তো আর পড়ছে না তার কবিতা, সে নিজে ছাড়া!

নরেশ ঘা খাওয়ার পর আরও জোঁকের মত পাকার সঙ্গে লেগে আছে।

কানাইকে চুপি চুপি পাকা বলে, ওকে ভাগা দিকি।

কানাই বলে, ভাগাচ্ছি।

তাদের কানে কানে কথা বলতে দেখে নরেশ সন্দেহের চোখে তাকায়। জানবাজারের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে একটু পরে কানাই তাকে বলে, এবার তুই কেটে পড়্ নরেশ। বাড়ী যা।

কেন?

বাড়ীতে বকবে তো তোকে।

তোরা কোথা যাবি?

আমরা একটু তাস পিটোতে যাব এক জায়গায়। সেখানে তোর যাওয়াটা—

এটা সত্যি সত্যি কানাই-এর কথা হলে নরেশ গায়ে মাখত না। একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে কেটে পড়ত। কিন্তু পাকা কানে কানে মন্ত্রণা দিয়েছে কানাইকে। ক্ষোভে দুঃখে অপমানে সে যেন ফেটে পড়ে, কথা জড়িয়ে যায় তার জিভে।

তোর সঙ্গে কোন দিন যদি আর কথা বলি পাকা…

আমি তোর কি করলাম? থাকতে চাও সঙ্গে থাকো। কিন্তু বারোটা বেজে গেল, একটা বেজে গেল বলে জ্বালাতে পারবে না।

নরেশ যেন কেঁদে ফেলবে। পরক্ষণে সে ছুটে চলে যায় মোড়ের দিকে।

কানাই কিছু বলে না। বুড়োর মত, বড়র মত, তার ধৈর্য্য সময় সময় নার্ভাস করে দেয় পাকাকে। বন্ধু যদি তার কেউ থাকে এ শহরে, সে কানাই। একমাত্র সে-ই তার মুগ্ধ ও অনুগত সাথী নয়, সমান বন্ধু। সব চেয়ে প্রাণ খুলে শুধু ওরই সঙ্গে সে মিশতে পারে। তবু সময় সময় ওর সঙ্গও তার বিরক্তিকর লাগে। মনে হয় তার প্রায় সব রকম পাকামিতে যোগ দিলেও দিচ্ছে আলগা আলতোভাবে, সব বিষয়ে সে যেন খুব সংযত, ভারি শক্ত তার ভেতরটা।

৩

মোড়ে বনমালীর চায়ের দোকানটার দিকে এগোতে এগোতে পাকা নিজেই অনর্গল কথা বলে যায়।

চায়ের দোকান তখন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। ভিড় হয় সকাল ও সন্ধ্যার দিকে। তেরচা করে আটকানো কাঠের পায়ায় বসানো সাদাসিদে তক্তা হল চায়ের টেবিল, পালিশ পর্য্যন্ত করা হয় নি। সরু লম্বা বেঞ্চিটার কোণের দিকে বসে ছিল একুশ-বাইশ বছরের একটি ছেলে। পাকা তার মুখ চেনে, নাম জানে, কিন্তু পরিচয় নেই। তার নাম অমিতাভ, কলকাতায় কলেজে পড়ে। সিল্কের মত মিহি একরাশি চুল, চওড়া কপাল, মাঝখানে খাঁজ কাটা চ্যাপটা মোটা চিবুক। ওকে দেখলেই পাকার মনে হয়, কাঁচা বয়সের সাধারণ একটি

মুখ শুধু ওই চওড়া কপাল আর খাঁজকাটা চিবুকের জন্যই এমন আশ্চর্য্য রকম দৃঢ়তা আর কাঠিন্যের ব্যঞ্জনা পেয়েছে।

কানাই বলে, কখন এলে অমিতদা ?

আজ সকালে। তুমি ভৈরববাবুর ভাগ্নে প্রকাশ, না ?

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিয়ে প্রকাশ ওদিকের বেঞ্চে গিয়ে বসে। কারো কাছ থেকেই গায়ে-পড়া দাদাত্ব তার ভাল লাগে না। সে অমিতাভই হোক, আর কালীনাথই হোক।

বনমালী! দু'কাপ চা।

কানাই এসে পাশে বসলে পাকা কথা বলে যায়, আগের কথারই জের টেনে। এটার কেন, ওটার মানে, সেটার কারণ। এই বয়সেই জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার যেন সীমা পরিসীমা নেই তার। সংসারে সব সে জেনে গেছে! মেয়েদের পর্য্যন্ত! একটানা বলে যায়, কানাইকে শোনাচ্ছে না নিজেকে শুনিয়ে বলছে, নিজের কাছে কথাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ধরে নিজেই ভাল করে বুঝবার চেষ্টা করছে, ঠিক বোঝা যায় না। নিজের কথা বলতে বলতে সে টেনে আনে ভদ্র জীবনের অজস্র ফাঁকি মিথ্যা ও নোংরামির কথা আর হঠাৎ শুরু করে যৌন-বিজ্ঞান।

পাকার এই পাকামি ছেলেদের কাছে তাকে প্রায় মহাপুরুষ করে দিয়েছে। গোপনে গোপনে কথা তারাও বলে—এত বেশি বলে যে শুনলে বড়রা থ' ব'নে যেত। বড় হয়ে মানুষ ছেলেবেলার কথা ভুলে যায়। মেয়ে-পুরুষের রহস্যময় ব্যাপার এবং তার নানারকম বিকার নিয়ে কিছু জানা কিছু শোনা আর বানানো আলাপে ছেলেরা পারিবারিক জীবনের কত দৈন্য আর কৃত্রিমতা যে ফুটিয়ে তোলে! ফ্রয়েডীয় অপব্যাখ্যার বদলে সামাজিক মানে খুঁজলে ভদ্র-সমাজকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হত।

পাকার গোপনতা নেই, যেন কৌতূহলও নেই। প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে চুপি চুপি যে আলাপে অন্যের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়, তার দশগুণ নিগূঢ় কথা পাকা নির্বিচারে বলে যায়। যেন, শুধু জানে বোঝে নয়, জানা বোঝারও অনেক ঊর্দ্ধে উঠে গেছে।

কানাই বলে, নরেশকে নিয়ে এত কথা কেন? ওরকম কত ছেলে আছে।

আছে বলেই তো।

তোর এত মাথা ব্যথা কেন?

ছেলেরা বিগড়ে যাবে, মাথা ব্যথা হবে না?

কি করবি তুই? নিজে খাঁটি থাকলেই হল।

না। যতটুকু পারি করব। একটা ছেলেকেও যদি বাঁচাতে পারি সেটা কি কম হল?

যেমন নরেশকে বাঁচিয়ে মানুষ করছিস? যতক্ষণ ভাল লাগবে ততক্ষণ পা চাটতে দিবি, খুশি হলে তাড়িয়ে দিবি। এমনি করে যদি ছেলেদের মানুষ করা যেত, কালীদাকে একটা ছেলে তৈরি করতে এত কাণ্ড করতে হত না।

পাকা বুড়োর মত হাসে।

কালীদা বেছে বেছে মনের মত ছেলে নিয়ে ক্লাব করেছেন। একটু দুর্ব্বল ছেলে এলেই সে বাতিল। এই ছেলেদের কি হবে? এদের অ্যাব্-নরম্যালিটি এদের গোল্লায় নিয়ে যাচ্ছে যে? এদের যদি কিছু করতে পারতেন কালীদা, বুঝতাম।

অমিতাভ শুনছিল। পাকারও তা অজানা নয়। কানাই গম্ভীর হয়ে বলে, এদের জন্যই করছেন কালীদা।

তাই এত বাছবিচার? এত কড়াকড়ি?

হ্যাঁ, তাই এত বাছবিচার, এত কড়াকড়ি। তুই ভাবছিস একটি দুটি ছেলের কথা, তোর দু-একজন বন্ধুর কথা, কালীদা ভাবছেন সব ছেলের কথা, সারা দেশের সমস্ত মানুষের কথা। দেশটাই অ্যাব্নরম্যাল, তুই কটা ছেলের অ্যাব্নরম্যালিটি ঘুচাবি?

পাকা চুপ করে থাকে। কানাই বুড়োর মত কথা বলছে। কালীদার মত।

কানাই বলে, দেশ স্বাধীন না হলে ভাল শিক্ষার ব্যবস্থাও হয় না, কিছুই হয় না। বাছা বাছা ছেলে নিয়ে গড়তে পারলে তারাই দেশকে স্বাধীন করতে পারে। কালীদা তাই—

অমিতাভ ডাকে, কানাই!

কানাই-এর গলা চড়ে গিয়েছিল। ভাল লাগছিল পাকার তাকে দেখতে ও তার কথা শুনতে। অমিতাভ নাম ধরে ডাকতেই কানাই থেমে যায়; চায়ের দোকানে লোক ছিল না তবু কালীনাথের নাম ধরে এত জোরে এসব কথা বলা উচিত হয় নি, পাকাও এটা বুঝতে পারে। অমিতাভ যেভাবে সতর্ক করে দেয় আর কানাই অপরাধীর মত থেমে যায়, সেটা আশ্চর্য্য করে দেয় পাকাকে। সে বুঝতে পারে, কানাই তার চেয়ে অনেক বেশি জানে কালীনাথদার সম্পর্কে। এতদিন এটা ঘুণাক্ষরে টের পাওয়া যায় নি।

অমিতাভ বলে, কানাই, কাল আমার একটা সাইকেল ভাড়া চাই ভাই—সারাদিনের জন্যে।

সাইকেল ভাড়া চাই? আচ্ছা।

একটু চুপচাপে কাটে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কানাই বলে, চলি।

পাকার সঙ্গ যে তার ভাল লাগছে না, সহ্য হচ্ছে না, সেটা একরকম স্পষ্ট ঘোষণা করেই কানাই পা বাড়ায়। তাকে শুনিয়ে পাকা হাঁকে, বনমালী, আর এক কাপ চা দেবে বাপধন?

অমিতাভ উঠে এসে তার পাশে বসে।—আমাকে এক কাপ খাওয়াবে ভাই?

এবার আর মনে হয় না অমিতাভ দাদাত্ব করছে। সহজ সাধারণভাবে আলাপ করে, পাকার মামাদের কথা জিজ্ঞেস করে, শহরের দু-একটা সাধারণ খবর জানতে চায়। প্রসঙ্গক্রমে জানায় যে কালীনাথের কাছে পাকার কথা সে শুনেছে। নয়নতারা ক্লাবের ব্যাপারটা মন দিয়ে শোনে। তার সঙ্গে অমিতাভের ভাব করার আগ্রহটা পাকা টের পায়। সে খুশি হয়।

বাড়ী যাবে না? চলো একসঙ্গেই যাই কোতোয়ালি পর্যন্ত।

আপনি এগোন। আমার মনটা ভাল নেই।

দুই

১

এখনো বাড়ী যেতে মন চায় না।

হৈ-চৈ কাণ্ড-কারখানা কম হয় নি সারাদিন, ঢং ঢং করে কোতোয়ালির ঘড়িতে রাত দশটা বাজল। অস্থিরতা ছটফটানি ছড়িয়ে দেওয়া সারাদিনেও কুলোতে পারা যায় নি, রাতে এসে ঠেকল। একেবারে যেন দম আটকে আসছে, তাই দিশে হারিয়ে মুক্তি চেয়ে দিনরাত্রি একাকার করে দিচ্ছে। শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই কিশোর দেহ-মনটার। কিশোর বলেই বোধ হয়, একটু বেশি বয়স হলে বুড়োদের চাল-চলন এবং মন ঠাণ্ডা আর শান্ত রাখতে হাওয়ায় ফাঁপানো নীতির দাওয়াই-এ ভক্তি জন্মে যেতে পারত। একা হয়ে যেন আরও বেড়েছে অজানা উদ্বেগ, অবোধ্য চাপ।

বটগাছটার তলে একদল পশ্চিমা মজুর ঢোল করতাল বাজিয়ে একটানা গেয়ে চলেছে সা-রা-রা-রা, সা-রা-রা-রা, তাও যেন একটা প্রচণ্ড উদ্দীপনা হলেও হয়ে উঠতে পারত কিন্তু কেন যেন হতে পারছে না। কোথায় রহস্য আছে, রোমাঞ্চ আছে, আছে জীবনের নিষিদ্ধ অসঙ্গত প্রকাশ—খুঁজে বার কর, ত্যাখো, জানো, বোঝো, ভয় করুক, গায়ে কাঁটা দিক, অদ্ভুত উল্লাসে ভরে যাক হৃদয় মন।

একা হলেই সবার কাছে পাকা অপরাধী হয়ে যায় এই তাগিদের জন্য। এ অন্যায়। কোনো ছেলের মতিগতি এমন নয়, বড় তার বাড় বেড়েছে। বাড় বেড়েছে বাড় বাড়বে বলে, বড়লোক না হয়ে ছোটলোক হতে চেয়ে বাড়বে বলে। গুনগুনিয়ে গান গেয়ে তাই এগিয়ে যায় বাজারের পাশের রাস্তা ধরে।

কি হবে বাড়ী গিয়ে ?

নতুনমামী যদি এসেও থাকে বেড়াতে বিকালের দিকে, অনেক আগেই নিশ্চয় ফিরে চলে গেছে। বাড়ী গিয়ে শুধু বিশ্রী মন-কেমন করা, গুমরানো

কান্না যেন গলায় এসে ঠেকে রয়েছে, নামবে না। ও বিষাদকে বড় ভয় করে পাকা, ঠিক যেন মা মরে যাবার ভয়ানক দিনগুলিকে আবার অনুভব করে।

মরিয়া হয়ে সে খারাপ পাড়ায় যায়।

এ মন্দ কি, হোক অন্যায়। পাড়ায় ঢুকবার আগে থেকেই উত্তেজনায় তার বুক কাঁপছে। আজকের সঙ্গে সেদিনের মজা দেখতে আসার তুলনা হয় না। সেদিন এসেছিল সন্ধ্যার আগে, তখনো দিনের আলো ছিল। আজ রাত দশটা বেজে গেছে। এসব পাড়ার আসল যা পরিচয়, নাচগান বাজনা, মাতলামি গুণ্ডামি, মারামারি খুনজখম, সে তো শুরু হয় বেশি রাত্রে। অনেক দিন থেকেই মনে মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল সাধটা, বেশি রাত্রে একবার এসে দেখে যাবে এই ভয়ঙ্কর রহস্যপুরীর কাণ্ড কারখানা, যেখানে রাত কাটানোর অপরাধে তার সেজমামাকে ভৈরব দূর দূর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে যাতায়াত করে বলে পরমেশবাবুকে পাড়ার লোকে এত ভয় আর ঘৃণা করে। সরু সরু আঁকাবাঁকা গলি, আবছা অন্ধকার, গা ছমছম করে। দূরে দূরে থামের মাথায় টিমটিমে তেলের বাতি, আলো দেয় না, প্রমাণ দেয় না যে শহরে মিউনিসিপালিটি আছে। সেটা দখল করবার জন্য দুদিন বাদে ভৈরব আর ভুবনের মধ্যে লড়াই লাগবে। পান সিগারেটের দোকানের আলোগুলি তেজী, দু-একটাতে আবার ডে-লাইট টাঙ্গিয়েছে। কোনো কোনো বড় বাড়ীর সামনে রোয়াকে বা ভেতরে ঢুকবার প্যাসেজে সেজেগুজে মেয়েরাও এসে দাঁড়িয়ে আছে ডে-লাইটের আলোয়, তবে বেশির ভাগই টিমটিমে লণ্ঠন। তেমন যেন সরগরম নয় আজ পাড়াটা, সেদিন সন্ধ্যায় যত দেখেছিল মেয়েগুলিও যেন তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক কম। এবাড়ী ওবাড়ীতে তবলা হারমোনিয়মের সঙ্গে গান চলছে, নাচের আওয়াজও পাওয়া যায়। হৈ-চৈ হুল্লোড়ের শব্দ শুধু এল একটা বাড়ীর ভেতর থেকে, তাও অল্প লোকের সামান্য গলাবাজি। রাস্তায় লোকও চলাচল করছে কম। একটু দমে যায় পাকা, তার আগ্রহ আর উত্তেজনা ঝিমিয়ে আসে।

হঠাৎ বুকটা তার ধড়াস্ করে ওঠে তারই বয়সী একটি ছেলের মুখোমুখি হয়ে। ছেলেটি বেরিয়ে এসেছে পাশের বাড়ীর দরজা দিয়ে। সেখানে

পানের দোকানের আলো ছিল, চেনাচেনি হয় তৎক্ষণাৎ। পাবজন্ম তুষার-বাবুর ছেলে অবনী। বয়সে তার চেয়ে অনেক বড় একজন যুবক সঙ্গে আছে। সিল্কের জামা গায়ে লুচ্চা আর ফুলেল ধরণের মেশানো বাবুবেশ। তুষারবাবু নামকরা কৃপণ। তাদের স্কুলেই ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে অবনী। সঙ্গী যুবকটি পাকার অচেনা। কয়েক মুহূর্ত ভয়ার্ত্ত চোখে বিহ্বলের মত পাকার দিকে চেয়ে থাকে অবনী, তারপর হন হন করে চলতে আরম্ভ করে তার পাশ কাটিয়ে। বুকের ধড়ফড়ানি কমে পাকার। না, সে ভয় নেই, অবনী কিছু প্রকাশ করবে না। নিজেকে বাঁচাবার জন্যই ওকে চুপ করে থাকতে হবে। কিন্তু এই বয়সে ছেলেটা এমন বিগড়ে গেছে, এই মাতাল বদ সঙ্গীর সঙ্গে এতদূর গড়িয়েছে তার অধঃপতন? একটা ঝাঁকি লাগে পাকার মনে, একটা সে বিশ্রী অস্বস্তি বোধ করে। এ তার নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন আবিষ্কার, নতুন জ্ঞান। ছেলেরা বদ অভ্যাস শেখে তা সে জানত এবং বিশ্বাস করত ওইখানেই সেটার সীমা। এই বয়সে বাজারের মেয়েমানুষ যে দরকার হতে পারে কোনো ছেলের, এ ধারণাও তার ছিল না এতকাল।

বাঁয়ের একটা গলিতে বেঁকে দু'পা এগিয়ে যেতে ডাক শোনে, কি গো! ফিরেও তাকাবে না?

বাড়ীটা চিনতে পারত না পাকা, মেয়েটিকে মনে ছিল। বেশ মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, কপালের আধখানা ঢেকে পাতা কেটেছে, আজও সেদিনকার সেই নীলাম্বরী শাড়ীখানাই পরনে। মানুষের মন ভুলাতে দেহটা সাজাবার জন্য ওই শাড়ীখানাই বোধ হয় ওর সম্বল। শাড়ীখানা দিয়ে দেহ সাজিয়ে এতদিন মানুষের মন ভুলিয়েও দ্বিতীয় আর একখানি মানুষের মন ভুলানোর শাড়ী যোগাড় করতে পারে নি। সেদিন ঘরের যে অবস্থা দেখেছিল তাতেও সে কথাই মনে হয়।

ভুলে গেছ? চিনতে পারলে না?

আজ টাকা আনি নি।

একটা টাকা, তাও সাথে নেই? মেয়েটি হাসে, আচ্ছা, আট গণ্ডাই আজ দিও তুমি।

দাঁড়াও, দেখি।

প্যাকেটের পয়সা গুনে দেখে পাকা মেয়েটির সঙ্গে ভেতরে যায়। সেদিন ওর ঘর দেখে কি রকম হতাশ আর আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে। সব কল্পনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। জীবটা সৃষ্টি-ছাড়া, জীবন সৃষ্টি-ছাড়া, তার আস্তানাও হবে খাপছাড়া উদ্ভট ধরনের কিছু, কখনো যেমনটি সে চোখেও দেখে নি, ভাবতেও পারে নি। তার বদলে ঝি-শ্রেণীর একজন গরীব মেয়েলোকের সাধারণ নোংরা গেরস্থালী ঘর দেখে থ' ব'নে গিয়েছিল পাকা। তাছাড়া, সেদিন লজ্জা সঙ্কোচ অস্বস্তিতে সে একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল, বার বার শুধু এই কথাটাই মনে হচ্ছিল যে মেয়েটা মনে মনে নিশ্চয় ভাবছে : আমি ওর দিদির বয়েসী, আমার কাছে ছোঁড়া এয়েছে পিরীত করতে! শুধু পালাই পালাই করছিল সেদিন মনটা, আস্ত একটা টাকা খরচ করেও ভাল করে দুটো কথা কয়ে রহস্য জগতের এই খাপছাড়া প্রাণীটিকে একটু জানবার চিনবার সুযোগটা কাজে লাগাতে পারে নি। ঘরটা যেমন হোক, মানুষটা কি উদ্ভট হতে পারে না?

পয়সা হাতে দিতে হয় ঘরে ঢুকেই। মানুষ এদের ঠকায়, নিশ্চয় ঠকায়, নইলে ভদ্র ঘরের ছেলেকে এত অবিশ্বাস কেন? কি ভয়ানক! এদেরও মানুষ ফাঁকি দিতে পারে!

তোমার নাম কি?

ও বাবা! সেদিনের শোধ তুলবে বুঝি আজ?

সে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসে, মোর নাম বিমলি। তোমার নামটা শুনি?

স্যাঁতসেঁতে ঘর, ধোঁয়াটে গন্ধ। নোংরা ময়লা ঘর, অথচ বাসন ক'টি কি ঝকঝকে করে মাজা, প্রদীপের শিখাটা চকচকে, যেন পিলসুজ বেয়ে লম্বিয়ে উঠেছে, মেঝেতে গর্ত্ত থাক্, এককণা ধুলো নেই, নিকানোর চিহ্নটা স্পষ্ট। উই-ধরা পায়া তক্তাপোষের, তুলো-নড়া ছেঁড়া তোশক বলেই চাদর টান করে পেতেও এবড়ো-খেবড়ো ভাবটা ঘোচানো যায় নি, কোণার দিকে একটু বেরিয়েও আছে তেলচিটে ছেঁড়া তোশক, কিন্তু সাবান-কাচা পরিষ্কার চাদরটি।

বাবা কি করেন?

বিমলি আজ খালি প্রশ্ন করছে। বিমলিকে তার জানবার চিনবার

কৌতূহলের চেয়ে যেন তার ঘর-সংসার আপনজনদের কথা জানবার আগ্রহ বিমলিরই বেশি। তার বাড়ীর অবস্থাটা বিমলি আঁচ করতে চায়, পাকা বোঝে। সে ছেলেমানুষ, রোজগার করে না, বড়লোকের ছেলে হলে হয়-তো কিছু বাগাবার ভরসা থাকবে। ছেলেমানুষকে ভোলানোও হবে সহজ। তাকে সরল, লাজুক, ভাল ছেলে বলে জেনেছে বিমলি। একটু ভীরুও হয়-তো ভেবেছে। মেয়েদের সঙ্গে কারবার করতে জানে না, একেবারে অভিজ্ঞতা নেই, ঠাহর করে নিয়েছে। তাই তার মন ভোলাতে কথা কইছে আদুরে সুরে, হাসি তামাশায় তাকে ভরসা দিচ্ছে, ঢং করছে, নিজেকে দেখাচ্ছে।

ইস্, আশায় পেয়েছে ওকে, আশা! আট গণ্ডা পয়সা পেয়েছে মোটে তার কাছে, কিন্তু আশা করছে ভবিষ্যতের! বয়স কম হয় নি, কতকাল ধরে কত মানুষের কাছে কত আশা করে করে এসেও এ পর্য্যন্ত ঝি-চাকরানীর চেয়ে অবস্থা ভাল হয় নি, আজ অল্পবয়সী নতুন রকমের একটা মানুষ পেয়েই ফের ভীষণভাবে আশা করতে শুরু করেছে! ও কি সত্যই এমন বোকা যে ভাবতে পারছে তামাটে রঙের ওই গোলগাল শরীর, ওই তেলচিটে মুখ নিয়ে তাকে ভোলাতে পারবে?

ধাঁধার মত লাগে ব্যাপারটা পাকার কাছে। মানে বুঝে উঠতে পারে না বিমলির ব্যবহারের।

এদিকে রাত বাড়ছে। তাগিদ বাড়ছে আট গণ্ডা পয়সায় ভাড়া খাটা শেষ করার।

ভূমিকা শেষ করে হঠাৎ বিমলি যে ব্যবহার করে তার বীভৎসতার ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে বেরিয়ে যেতে হয়, হতবুদ্ধি ভাবটা একটু সামলে নেবার পর সাম্প্রতিক ধাঁধাটার একটা জবাব মনে আসে পাকার। মনের জিজ্ঞাসার জবাব টেনে আনাটা তার স্বভাব। ছেলেবেলা থেকে মনটা তার 'কেন'র পোকায় ভরতি, ছোট-বড় সাধারণ-অসাধারণ সব ব্যাপারেই সে জিজ্ঞাসু, যখন যে 'কেন'টা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার একটা লাগসই ব্যাখ্যা খুঁজে বার না করলে তার চলে না, মানসিক অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় শরীর খারাপ হয়ে যায়।

কয়েক আনা পয়সা অবশিষ্ট ছিল, দু'পয়সা দিয়ে দুটো সিগারেট কিনে একটা ধরিয়ে সে ভাবে, বিমলির আশা হয়তো একেবারে অর্থহীন পাগলামি নয়। এরকম হয়তো ঘটে সংসারে। তারই মত ভদ্র ভালমানুষ হয়তো বিমলির মত কুৎসিত কদর্য্যতা চায়। হয়তো কেন, চায়। মনোবিজ্ঞানের বইয়ে সেও তো পড়েছে এ কথা। সে তো জানে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোকের কাণ্ড। স্বাধীনতার সংগ্রাম ভাঙ্গিয়ে খাবার ব্যবসায়ে রত বিখ্যাত পত্রিকায় দেশের মুক্তি-সাধনার সংগ্রামের সংবাদ, দেশপূজ্য নেতাদের নড়াচড়া চলাফেরা কথা বলার সংবাদ থাকে, আবার ওই কাগজেই আদালতের মোকদ্দমার বিবরণে পদস্থ ভদ্রলোকের যে কদর্য্য কেচ্ছার কাহিনী বার হয় সেগুলি বানানো গল্প হতে পারে না।

তাছাড়া থাকে আদালতে বিচার্য্য পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী। সব ক'টাই অবলা মেয়ে। প্রাইভেট মাস্টারের অট্টালিকায় পড়ার ঘরের নির্জ্জনতায় উঁচু শ্রেণীর কচি মেয়ের মন ভুলিয়ে এবং পাটের ক্ষেতের পাশে ডোবার ধারে জঙ্গলে নীচু স্তরের কচি বৌটাকে টেনে নিয়ে মুখ বন্ধ করে দু-চার-দশজনের পাশবিক ভোগের কাহিনী। স্বয়ং মহাদেবেরই যেন জগৎ-ধর্ষণ!

সে যে আজ এ পাড়ায় এসেছে এত রাতে, বিমলির ঘরে গিয়েছে, তার মানেও কি তাই?

নতুনমামীকে সে ভালবাসে।

এ খাঁটি ভালবাসা, অতি স্বর্গীয়, খুব পবিত্র। চিরজীবন দূর থেকে মন দিয়ে বিরহের ব্যথায় পূজা করে যাওয়ার ভালবাসা। তারই প্রতিক্রিয়ায় সে কি আজ এই নোংরামির দেশে এসেছে, পয়সা দিয়ে যেখানে কেনা যায় মেয়েমানুষের সশরীর ভালবাসা, বিমলির মত স্ত্রীলোকেরা যেখানে উন্মত হয়ে থাকে যেচে বীভৎসতম বিকারের তৃপ্তি দিতে?

মাথায় ঝাঁকি দেয় পাকা, কাতরভাবে শুধায় পানওলাকে, লেমোনেড ক'পয়সা?

উঃ, তৃষ্ণাই পেয়েছিল বটে মরুভূমির পথহারা পথিকের মত। নইলে এত ভাবে? অন্তত সাতাশ-আটাশ কি ত্রিশ বছর বয়স হবার আগে ওসব জটিল

ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো মানে হয় না, সেটা উচিতও নয়। একা হলেই কেন যে নিজেকে এত কষ্ট দেয় বোবার মত বড় বড় কথা ভেবে; জগতে কারো সে ক্ষতি করে নি, করছেও না। ওটুকুই যথেষ্ট।

পাড়া থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে আর একজন চেনা ভদ্রলোক চোখে পড়ে। পাকা মুখ বাঁকায়। আর ভাল লাগছিল না। কত রোমাঞ্চ আশা করেছিল, পাড়াটা তাকে বঞ্চনা করেছে। কিছু নেই এখানে, খানিকটা ভোঁতা মিথ্যে নোংরামি ছাড়া।

এই অজানা জাতকে জানবার জন্য সে উতলা হয়েছিল?

স্টেশনে যাবার রাস্তা।

শহরের দুদিক থেকে দুটি বড় রাস্তা বেরিয়ে শহরকে বেড় দিয়ে বৃত্তাকারে এগোতে এগোতে হঠাৎ এক জায়গায় মুখোমুখি মিশে দিক পরিবর্তন করে সিধে চলে গেছে স্টেশনের দিকে। পশ্চিমে নদী, লিটন ময়দান। লিটন ময়দান মাঠ নয়, প্রান্তরের সামিল—রেলপথ ও নদী দুয়েরই দুপাশে অনেক দূর অবধি ছড়ানো। রেললাইন বুক ভেদ করে গিয়ে উঠেছে নদীর পুলে, ঘেসো মাঠ, পাথুরে ধূসরতা, ঝোপঝাড় শালবন সবই আছে প্রান্তরে, একটি ঝরনা পর্য্যন্ত। লিটন ময়দানের শহর-ঘেঁষা অংশের বিস্তৃতিতে শহরের ছাঁকা উপরওয়ালাদের কতকগুলি বাড়ী আর বাংলো ছড়ানো, ফলে ফুলে ভরা বাগান দিয়ে ঘেরা। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট রাজা-জমিদার লাখপতি ব্যবসায়ীরা এসব বাংলোয় বাস করেন, ক্লাব করেন, বাগানবাড়ী করেন, নোংরা ঘিঞ্জি শহরের দূরত্ব উপভোগ করেন দিগন্ত পর্য্যন্ত ফাঁকা দক্ষিণের হাওয়াকে টানা পাখায় নাড়া দিয়ে। এদের এলাকার একপাশে কিছু তফাতে অনেক বেশি ঘেঁষাঘেঁষি করে নতুন ফ্যাসানের কতকগুলি ছোট-বড় বাড়ী উঠেছে সাধারণ বড়লোক আর মধ্যবিত্ত মানুষের। অনন্তের বাড়ীটিই বোধ হয় এই নতুন গড়ে ওঠা অবিমিশ্র দেশী পাড়ায় সব-

চেয়ে নতুন, সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে সুন্দর হবে। অন্ত এলাকাটিতেও বাড়ীটা বেমানান হত না মোটেই। সামনে বাগান, চুনকাম করা ধবধবে সাদা মানুষ-সমান উঁচু প্রাচীর। দোতলার চারটি ঘরে আলো জ্বলছে।

কোন্ ঘরে নতুন মামী আছেন কে জানে?

আলোকিত জানালাগুলির দিকে তাকাতে তাকাতে পাকা সামনের পথ দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ীটা অতিক্রম করে চলে যাচ্ছিল, বাগানের শেষ কোণটার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল। ফুলের তীব্র সুগন্ধ তার নাকে লেগেছে একটা মনোরম মাদক আঘাতের মত। একটা দুটো নয়, অনেকগুলি ভুঁইচাঁপা নিশ্চয় ফুটেছে দেয়ালের ওধারের গাছে, নইলে রাস্তায় এমন গাঢ় হত না গন্ধ যে দম নিতে তার কষ্ট হয়। এত প্রিয় এই গন্ধ তার, অভিজ্ঞতা অনুভূতি স্মৃতির মত, আনন্দ-বেদনার স্বাদের মত!

গেট খুলিয়ে গট গট করে বাড়ীর ভেতর গিয়ে নতুন মামীর সঙ্গে দেখা করা যায়, ফিরবার সময় আলো দিয়ে খুঁজে কয়েকটা ফুল পেড়ে সে নিয়ে যেতে পারে অনায়াসে।

কিন্তু ফুলের জন্য হার মানবে নতুন মামীর কাছে? একেবারে প্রমাণ করে দেবে যে, না দেখে আর থাকতে পারল না বলে পাগলের মত দেখতে ছুটে এসেছে রাত এগারোটার সময়?

প্রাচীর ডিঙিয়ে মিনিট দশেক খোঁজাখুঁজির পর দুটি ভুঁইচাপা ফুল উপড়ে নিয়ে পকেটে ভরে পাকা আবার রাস্তায় নেবে যায়। নাকের কাছে ফুল দুটিকে একটিবারের জন্যও সে ধরে না। নতুন তাজা ভুঁইচাঁপার গন্ধ শোঁকার সে রোমাঞ্চকর রতিও সে বাতিল করে দেয়। বড় একা লাগছে। বড় বেশি রকম একা লাগছে। কেমন জটিল আর আড়ষ্ট হয়ে আসছে তার নিজের কাছেই নিজের মতিগতির স্বাচ্ছন্দ্য। একাকীত্ব দিয়ে যেন ক্রমাগতই সে জড়িয়ে জড়িয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলছে নিজেকে।

জীবনকে মেনেও এ কি অভিশাপ!

নদীর দিকের পথটা অপরিসর, অপরিচ্ছন্ন এবড়োখেবড়ো। কিছু দূর

এগোলে অস্পষ্ট আর একটা গন্ধেরই অনুভূতি জাগে। এগোতে এগোতে বাড়তে থাকে পচা গন্ধের জোর। নদীর ধারে কেদার ভট্টাচার্য্যের বেনামি চামড়ার কারখানার গন্ধ এটা। চাংসি নদীতে বর্ষাকালে মাস দুই নৌকা চলাচল করে, তারপর আরও মাসখানেক বজায় থাকে হাঁটু জলের একটা মৃদু স্রোত। বাকি মাসগুলিতে ভেসে থাকে বালির চর, তার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে পচা বদ্ধ জলের পুকুর, দীঘি, হ্রদ। এমনি একটা জলার কাছে করা হয়েছে চামড়ার কারখানা, জলাটা কাজে লাগে। জঙ্গুলে আমবাগানটার গা ঘেঁষে কতগুলি অস্থায়ী কুঁড়েঘর, কারখানার কয়েকজন চামারের একটা বস্তি। কারখানা কিছু তফাতে থাকলেও এখানে গাঢ় পচা গন্ধ ম' ম' করে যেদিক থেকেই বাতাস আসুক। কালচে-মারা কাঠের গুঁড়ো এদিক ওদিক ছড়ানো আছে দেখা যায়, চামড়া পাকানোর কাজে লাগে ওই গুঁড়ো। এই গুঁড়ো বিছিয়ে চলার পথ ওরা নরম করেছে, শত বর্ষাতেও কাদা হয় না।

স্ত্রী-পুরুষ কয়েকজন একত্র হয়ে তখনো চেঁচামেচি করছিল ফাঁকা আম-গাছটার নীচে নিকানো জায়গায় বসে। পচাই গিলে দু-তিনজন কাত হয়ে পড়েছে পচাই-এর মাত্রা বাড়ায়।

খানিক তফাত থেকেই পাকা টের পায় এদের আজ কোনো পরব ছিল। ধরা-বাঁধা বছর-ঘুরতি কোনো পরব নাও হতে পারে, বিয়ে বা বিয়ে খারিজ বা অপরাধের প্রাচিত্তির বা অসঙ্গত জন্মকে সঙ্গত করা বা মরণকে মেনে নেওয়ার মত কোনো ব্যাপার হতে পারে—সবই এদের পরবের মত পালিত হয়, একভাবে সবাই মিলে পচাই খেয়ে চেঁচামেচি করে। ঢোলক করতাল বাজিয়ে আওয়াজ তুলে সবাই মিলে এক সুরে এক তালে একটানা সা-রা-রা-রা সা-রা-রা আওয়াজ করে জমজমাট করবে মেলামেশার পরব, তাও এরা জানে না। শুধু চেঁচামেচি করে এলোমেলো।

পাকাকে দেখে বুড়ো নাঙি জিভ কাঁপিয়ে একটা উদ্ভট লুয়াউ লুয়াউ আওয়াজ তোলে, আওয়াজ থামিয়ে বলে, পাগ্‌লা বাবু এতাম রে!

চুপ থাক্ ঢ্যামনা বুড়ো।—পাকা হেসে বলে।

নিকানো মাটিতে সে বসে পড়ে ধপ করে।

ব্যাস্, সভ্যতার সব দড়ি যেন ছিঁড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে, গিঁট খুলে যায়, আলগা হয়ে খসে যায় সব বাঁধন। যা খুশি বলুক সে, যা খুশি করুক, কেউ এখানে ভাববে না: ছি ছি, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে—? ন্যাংটো হয়ে সে যদি ধেই ধেই নাচতেও আরম্ভ করে হঠাৎ, মজা পাবে সকল স্ত্রী-পুরুষ এখানে, হা হা করে হাসবে সকলে, বাবুদের ছেলে বলে তার সম্বন্ধে এদের মনে যেটুকু সন্দেহ ভয় আর অবিশ্বাস এখন আছে, আরও তা কমে যাবে। পাকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার মত অভাগা ছেলে সত্যি জগতে নেই। এমন দুঃসহ তার জীবন যে জীবনের এই আদিম নিঃস্বতার মধ্যে এসে তাকে হাঁফ ছাড়তে হয়!

কারকি ভাঁড়ে পচাই এনে দেয় পাকাকে, ভাঁড়টা সামনে রেখে পাকার ডান হাতটা তুলে নিজের মুখে গালে বুকে পিঠে বুলিয়ে শুধোয়, পছন্দ হয়? মোকে লিবি আজ? একটা স্তন কারকির মরা, শুকনো। খড়ি-ওঠা কর্কশ গায়ের চামড়া। কিন্তু এমন তার দেহের গঠন, নতুন মামীর ভাসুরঝি উষা এত উপোস আর বিশেষ ব্যায়ামের সাধনা দিয়েও যার ধারে কাছে পৌঁছতে পারে নি। কারকির ছেলেটাকে আছড়ে মেরেছিল পুলিশ-সায়েব কার্লটন বুটের ধাক্কায় তেরো হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে। লিটন ময়দানের ঝরনার ধারে তিন বছরের ছেলেটা না বুঝে ধরতে গিয়েছিল সায়েবের কচি মেয়েটাকে। তার পুরুষ গিধার সাহেবের মাথায় লাঠি মারতে গিয়ে মারতে রাজি হয় নি বলে কারকি দা দিয়ে নিজের স্তন কাটতে আরম্ভ করেছিল।

যা যা বুড়ার কাছে যা।

পচাই-এর ভাঁড় ঠোঁটে ঠেকায় পাকা নিশ্বাস আটকে রেখে। গন্ধেই তার বমি আসে। একটা দুয়ানি নাণ্ডির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলে, আমার চাঁদা।

দুঁনি? আঠ আনা দে, আঠ আনা দে।

পাকা মাথা নাড়ে।—ভাগ্ ভাগ্, আট আনা খায় না।

ওসব জানা আছে পাকার। বেশি পয়সা খয়রাত করলে এদের খাতির মেলে, পাত্তা মেলে না। দয়া এরা চেনে টাকাওয়ালা মানুষের, কেউ টাকা ছড়ালেই এদের মনে সন্দেহ জাগে তার মতলবটা কি। সে অবিশ্বাস আর ঘোচে না, দাতা হিসাবে তাকে সসম্মানে তফাতে রেখে দেয়, নজর রাখে

উপকারী সাপকে চোখে চোখে রাখার মত। যতক্ষণ সে দাজ্ঞা হাজির থাকে কাছে এরা আর নিজেরা থাকে না ততক্ষণ, সে যেমন চায় সেই রকম হবার চেষ্টা করে, আড়ষ্ট, সতর্ক, ভোঁতা আর বোকা ভালমানুষ। জেলে-বাগদী চাষী-মাঝিদের সঙ্গে পাকা মিশছে ছেলেবেলা থেকে, ও অভিজ্ঞতা তার আছে। বিকৃত শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা-ভব্যতার ভারি বোঝা নামিয়ে মনটাকে একটু হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রামের সুযোগ দিতে হলে ভদ্রত্ব বাবুত্ব ছাঁটলেই শুধু চলে না, পয়সাওলাত্বটাও ছাঁটতে হয়। নইলে এই গরীব ছোটলোকেরা ভদ্রটুকু আমল কিছুতেই দেয় না যতটুকু আমল না পেলে এদের সঙ্গে বসে এদের মত অভদ্র হওয়া যায়।

অবশ্য একেবারে ঘোচে না সন্দেহ অবিশ্বাস—কিছুতেই না। সব খোলস খুলে ওদের ভাব ভাষা ভঙ্গি আয়ত্ত করে প্রাণখুলে সমানভাবে মিশলেও না। ভয়, সঙ্কোচ, ব্যবধান কম-বেশি থেকে যাবেই। বন্ধু বলে, আপন বলে, নিজেদের একজন বলে এরা তাকে মেনে নেয় নি। এটা তার পাগলামি বলে জেনে, মাথায় ছিট থাকার জন্যই সে এভাবে তাদের সঙ্গে মিশতে আসে ধরে নিয়ে, তবে এরা মোটামুটি আশ্বস্ত হয়েছে যে হয়তো তার বিশেষ কোনো খারাপ মতলব নেই। বয়সটা তার কম, এ পর্যন্ত কোনো মেয়েকে নিয়ে টানাটানিও করে নি। সে পাগ্‌লাবাবু, তাই বাবুত্বের প্রতি হাড়েমজ্জায় মেশানো ভয়-সঙ্কোচ অনেকটা এরা বাতিল করেছে তার বেলায়।

তা হোক, উপায় কি! এরা পাগল ভাবে না ছাগল ভাবে তাকে তাতে তার বয়ে যায় বলেই না এখানে সে পায় এতখানি মুক্তি, মনটা এত সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারে। কে কি ভাববে ভাবতে হয় না, নিজেকে জাহির করতে হয় না, বিদ্যাবুদ্ধির বাহাদুরি বজায় রাখতে হয় না, মান অভিমানের পালা গাইতে হয় না, দরদ দেখাতে হয় না, যাকে দেখলে গা জ্বলে তার সঙ্গে হাসিমুখে আর যাকে দেখলে গায়ে থুতু দিতে ইচ্ছা হয় তাকে সম্মান করে কথা কইতে হয় না…কিছুই করতে হয় না।

ওদের সুখী স্বাধীন মনে করে পাকা, কি সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন! ওদের মধ্যে নিজে সে যে অপূর্ব্ব মুক্তির স্বাদ পায় তারই মাপকাঠিতে সে বিচার করে ওদের

জীবনকে। দরদ খানিকটা আছে বৈ কি, তবে সেটা সব সময়ে তেমন ভাবে অনুভব করে না। একটা দয়া আর সহানুভূতির ভাব মাঝে মাঝে গভীর ভাবে নাড়া দেয় তার হৃদয়-মনকে। বড় সে বিচলিত হয়ে পড়ে তখন। ভাবে, মোটা মোটা টাকা দান করে এদের দুঃখ যদি সে দূর করতে পারত!

নতুন একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছিল। আগে বোধ হয় দু-একবার ওকে দেখেছিল পাকা, মাঝখানে এখানে ছিল না, ভাল মনে নেই। কমদামী হলেও রঙিন একখানা শাড়ী তার পরনে—তার চেয়েও দর্শনীয় গলার তার ছেঁড়া জুতার মালাটি। কপালে সিঁদুরে মাটির থাবড়ানো গোলাটা শুকিয়ে উঠেছে, চাঁদের আলোয় মনে হয় কপালের চামড়াটাই বুঝি চলটার মত উঠে আসবার উপক্রম করছে।

হেই পাগ্‌লাবাবু, খর্পদার! জবরদস্ত মোচে তা দিয়ে জোয়ান ঝানকু বলে, উয়ার পানে নজর লয়।

সে জবর নেশা করেছে, এতক্ষণ চেঁচামেচি করছিল সবার চেয়ে বেশি। এমনিতেই তার মেজাজটা গরম, পচাই খেলে একেবারে বিগড়ে যায়। মোটা মোটা হাড়ে গড়া মস্ত জোয়ালো চেহারা, বাঁ গালে কান থেকে চিবুক পর্য্যন্ত একটা কাটা দাগ, ঢেউ তোলা গোঁফ সেটা অতিক্রম করে গেছে।

পাকা এক গাল হেসে বলে, চুপ থাক্ শালা।

টলতে টলতে উঠে তাকে মারতে আসে ঝানকু গাল দিতে দিতে। ছেঁড়া জুতোর মালা-পরা মেয়েটি তার কাপড় ধরে টেনে রাখতে চায়। ধর্‌রাও জোয়ান, সে উঠে এসে ঝানকুর হাত চেপে ধরে।

বুড়ো নাডি হাঁকে, হেই ঝানকু!

পাকা গলা ফাটিয়ে ধমকায়, মুখ সামাল এই বজ্জাত! খুন করে ফেলব।

ঝানকু গর্জ্জে ওঠে। একা সে মেরে থেঁতলে দিতে পারে পাকাকে পাঁচ মিনিটে, কিন্তু কোমর থেকে পাকা ধারালো ঝক্‌ঝকে ছোরা বার করে বাগিয়ে ধরেছে। আরও তিন-চার জন পুরুষ উঠে এসে ঝানকুকে জাপটে ধরে। নাডি তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলে, চুপ মেরে বস্ গা ভালা চাস্ ত। তুর বিয়া বাতিল করে দিব বলে দিলম, খানকির বাচ্চা!

অঁ? ঝান্‌কু যেন সত্যাই ভয় পেয়ে সজাগ হয়ে নিজে থেকে পিছু হটে শান্ত হয়ে বলে, জোর করে ঠেলে নিতে হয় না।

উয়ার বিয়া?—পাকা শুধোয়।

অঁ।—সায় দেয় নাড়ি।

ওই মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে হবে ঝান্‌কুর। ফুলী একজন খৃস্টানের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল ক'মাস আগে, লোকটা তাকে ফেলে পালিয়ে গেছে খবর পেয়ে ঝান্‌কু তাকে নিয়ে এসেছে। দোষ কাটাবার ব্যবস্থা আজ সম্পূর্ণ হল, আজ মাঝরাত্রে। এখন গলার জুতার মালা খুলে ফেলা হবে ফুলীর, কাল বিয়ে। জুতার মালা খোলার পর স্নান করে একটা জিনিস খেয়ে নির্দোষ হবে ফুলী, বাকি রাতটা কোনো ছেলের মার কাছে শুয়ে থাকবে। খেয়ে পবিত্র হবার জিনিসটার নাম শুনে গা শির শির করে উঠল পাকার—এত নীচু কি এরা যে প্রায়শ্চিত্তে গোবর খাওয়াও সানায় না, এমন নোংরা অশ্লীল জিনিস দরকার হয়?

চাঁদ হেলে পড়েছে। গাছের ছায়া প্রায় ঢেকে দিয়েছে নিকানো স্থানটি। এবার বাড়ীর দিকে পা বাড়ানো উচিত, অনেকটা হাঁটতে হবে।

৩

মাঝরাত্রি পার করে পাকা বাড়ী ফিরল।

এই প্রথম নয়, অভ্যাস আছে। দরজা খুলতে কাউকে সে ডাকে না, দেয়াল বেয়ে গোয়ালের চালা রান্না-ঘরের ছাত হয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে যায়। সেখান থেকে তেতলায় উঠবার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থাই আছে।

তেতলায় ছোট একখানা নিরিবিলি ঘরে থাকত বড় মামীর আশ্রিত ভাইপো রমেন, আবদারের গায়ের জোরে তাকে উৎখাত করে নিজে ঘরটি পাকা দখল করেছে। রমেন অবশ্য দোতলায় অনেক ভাল আর বড় ঘরে

স্থান পেয়েছিল মেজ মামা গিরিশের ছেলে সলিলের সঙ্গে, নইলে বড় মামী কখনো সইত না এ অপমান। এবং সমবয়সী রমেনের সঙ্গে সলিলের অবশ্য খুব ভাব হয়েছিল, নইলে নিজের ঘরে সে তাকে কোনমতে ঠাঁইও দিত না।

ভৈরব জানত পাকার আবদার কি চিজ। তেতলায় ঘরটি না পেলে পাকার আবদার দাঁড়াত জিদে, একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেত। পাকা হয়তো রাগ করে ফিরে যেত তার বাবার কাছে। পাকার বাবা ভৈরবকে লিখত: শুনিলাম তুমি শ্রীমানকে লেখাপড়ার সুবিধার জন্য একখানা ঘর ছাড়িয়া দিতেও আপত্তি করিয়াছ। তোমার ভাগে ভাগ্নীরা তোমার কাছে কখনও কোন প্রত্যাশা করে নাই, কখনও করিবেও না। অত্যন্ত দুরন্ত বলিয়া এবং তুমি নিজে হইতে লিখিয়াছিলে বলিয়া যে তোমার ওখানে থাকিয়া পড়িলে হয়তো শ্রীমান শুধরাইতে পারে সেই জন্য তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম। তুমি যে একটা বছরও—ইত্যাদি। দেশ-বিদেশে যেখানে যত আত্মীয় কুটুম্ব আর বন্ধুবান্ধব থাকে সকলে ভৈরবের হীনতার খবর পেত—পাকার বাবা গরীব নয়, পাকা আশ্রয়-ভিখারী নয় মামা-বাড়িতে, তবু তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার! পাকা নিরুপায় নিরাশ্রয় গরীবের ছেলে হলে বরং কথা ছিল। ঘরে ভাত ঢাকা থাকে, কোন দিন লুচি বা পরোটা, বাটিভরা দুধ, প্রায়ই সন্দেশ। আঁতুড়েই কেন যে ছেলেটাকে কেউ গলা টিপে শেষ করে নি ভেবে ভৈরব মাঝে মাঝে নিজের মনে আপসোস করে, কিন্তু কি করা যায়, নিজের মান বাঁচাতে বাধ্য হয়ে পাকার আদরযত্নের বিশেষ ব্যবস্থার হুকুম দিতে হয়েছে। নয়তো টাকা থাকলেও বাড়ীর মানুষকে লুচিপরোটা দুধসন্দেশ খাওয়াবার মত হাত-খোলা মানুষ ভৈরব নয়।

বড়লোকের বড় সংসার, রাতে হাঙ্গামা চুকে আলো নিভে বাড়ী অন্ধকার হতে এগারটা সাড়ে এগারটা বেজে যায়। বড় জোর, মাঝরাত্রি হয় ঠাকুর-চাকরদের শুতে। পাকা আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করে, আজ এখনো কয়েকটা ঘরে আর বারান্দায় আলো জলছে,—রাত প্রায় দুটো বাজে। রাঙা মামীর ঘরের দরজা খোলা, রাঙা মামী ঘরে নেই, ছেলেমেয়েগুলি ঘুমোচ্ছে। মেজ মামীর ঘরের দরজা ভেজানো, ভেতরে আলো জলছে। ভৈরবের মেজ মেয়ে লক্ষ্মীর ঘরে তার বর টেবিলে খোলা বইয়ে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে, বোধ হয়

সরযূর প্রতীক্ষায় বই অবলম্বনে জেগে থাকবার চেষ্টার ফল এটা,—সরযূর বিয়ে হয়েছে মোটে বছরখানেক।

কিছু ঘটেছে। নিশ্চয় ঘটেছে।

তেতলা থেকে সরযূর চাপা হাসির আওয়াজ ভেসে আসে।

নতুন মামী এসেছে নাকি? এত রাত পর্য্যন্ত বাড়ীর মেয়েদের হাসিগল্পের আর কি উপলক্ষ ঘটতে পারে আজ!

তেতলায় মেজ মামীর ঘরে নতুন মামীকে ঘিরেই গল্পের আড্ডা বসেছে দেখা যায়। দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভাল করে একনজর নতুন মামীকে দেখারও সুযোগ পায় না পাকা, মেজ মামী কথা থামিয়ে বলে, ওই যে এসেছেন!

নতুন মামীর চোখ ঘুরে আসে পাকার দিকে। মুখের হাসি, চোখের কৌতুক মিলিয়ে যায়। আগ্রহ উৎকণ্ঠা বিস্ময় মিশিয়ে নতুন মামী বলে, পাকা! কোথা গেছিলে তুমি? কোথা ছিলে এত রাত পর্য্যন্ত? ভেবে মরি আমরা এদিকে, চাদ্দিকে লোক পাঠিয়েছিলাম খুঁজতে—ইস্, কি চেহারা হয়েছে?

নতুন মামীর হাসি দেখেই পাকার মন বিগড়ে গিয়েছিল। ভেবে মরি? এত হাসি, এত গল্প বুঝি ভেবে মরার লক্ষণ যে পাকা কোথা গেছে?

সরযূ বলে ঠোঁট উলটে, নতুন কাকীর যেমন, ও তো রাতকাবার করে ফেরেই। আমি টের পাই না? দরজা দিয়ে আসেন না, গোয়াল-ঘরের চালায় উঠে ছাত বেয়ে বাড়ী ঢোকেন। কত বললাম, আসবে আসবে, সময় হলেই বাবু বাড়ী আসবে। নতুন কাকী হুলস্থূল বাধিয়ে দিল, যাও যাও, ছোটো সবাই, খোঁজ নাও কি হল! আমি যত বলি, নতুন কাকী—

তুই থাম্ তো সরযূ।

সরযূ থেমে গেল অত্যন্ত আহত হয়ে। নতুন কাকী সুধাময়ী শুধু তাকে থামতে বলে নি ধমক দিয়ে, গম্ভীর থমথমে মুখে এমন তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছে!

সুধা সহজভাবে পাকাকে বলে, ভেতরে এসো পাকা। জিরিয়ে নাও একটু, তারপর খাও যদি তো খাবে, নয় ঘুমোতে যাবে। দশটা বাজে,

এগারোটা বাজে তুমি ফিরলে না। আমার সত্যি বড় ভাবনা হয়েছিল। ওরা বলেছিল বটে এক একদিন তুমি খুব রাত কর বাড়ী ফিরতে, কিন্তু আমি ভাবলাম, লাইব্রেরিতে ওইসব কাণ্ড হল, তুমি যদি কিছু করে বসে থাক! খেয়েদেয়ে বাড়ী চলে যাব ভেবেছিলাম, তার মধ্যে তুমি নিশ্চয় ফিরবে, ওমা, তোমার দেখাই নেই। এখানেই রয়ে গেলাম আজ রাতটা—

আমরা যেন থাকতে বলি নি? ফোঁস করে ওঠে দারুণ অভিমানে গিরিশের মেয়ে গীতা।

সুধা কান না দিয়ে পাকাকে বলে, তোমার চেহারা তো বড় খারাপ হয়ে গেছে পাকা।

আমরা খেতে দিই না—

পাকাও কান না দিয়ে বললে, নদীর ধারে গিয়েছিলাম।

আমিও তাই ভাবছিলাম, নদীর ধারে, নয় লিটন ময়দানের ঝরনার কাছে নিশ্চয় বসে আছে। জানি তো তোমায়!

নদীর ধারে ভয় করল না একা একা?—ভয়ে ভয়ে ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করল সেজ মামী মিনতি। পটের পরীর মত সুন্দরী মিনতি, অত্যন্ত ছেলেমানুষ, বয়স বোধ হয় সতেরও হয় নি। খারাপপাড়ায় গিয়ে চরিত্র খারাপ করার জন্য ভাইকে বাড়ী থেকে দূর করে দেবার মাস তিনেক আগে মণীশকে ঘরে চরিত্রবান ছেলে করে আটকে রাখার শেষ চেষ্টা হিসাবে ভৈরব মিনতিকে ঘরে এনেছিল। মিনতিকে দেখলে ভৈরবের শেষ চেষ্টার সত্যি তারিফ করতে হয়। সে হেন মানুষ টাকা চায় নি, গয়না চায় নি, শুধু চেয়েছিল রূপ,—মণীশের চোখে যাতে এমন ধাঁধা লেগে যায় যে বাজারের রূপসীদের তার মনে হবে বিন্দে ঝির মত কুৎসিত। মিনতিকে দেখে মানুষ সত্যি অবাক হয়ে ভাবে যে কেন তা হয় নি, চোখে কেন পলক পড়া বন্ধ হয় নি মণীশের।

মণীশ চলে গেছে, তাড়িয়ে দেবামাত্র গভীর রাত্রে মাতাল অবস্থায় এক কাপড়ে চলে গেছে। মিনতিকে ভৈরব একদিনের জন্য গরীব বাপের একতলা বাড়ীতে যেতে দেয় না। ভাইকে শোধরাবার এমন চাল তার ব্যর্থ হয়েছে ভৈরব তা মানবে না। মিনতির জন্যই নাকি মণীশ ফিরে আসবে!

পাকা বলে, কিসের ভয় ?

এই নদীর ধারে একেবারে একলাটি—মিনতি হাসবার চেষ্টা করে। কান্নার মত চেষ্টা।

যাগ গে, যাগ গে, সুধা বলে জোর দিয়ে, রাত বুঝি ভোর হল। কিছু খাও নি তো? খাবে নাকি এত রাতে?

খাব, চান করে খাব।

চান করবে? নতুন মামী যেন মিনতির সুরে বলে।

একটু যেন রোগা হয়ে গেছে নতুন মামী, না-ফরসা না-কালো রঙের সে অদ্ভুত মখমলে জলুস খানিকটা ভোঁতা হয়েছে। গালের তিলটা যেন আলগা-ভাবে ভাসছে না, এঁটে বসেছে। কোমরের বাঁকটা যেন আরও বেঁকেছে, রোগা হওয়ার জন্য নিশ্চয়। কোমর থেকে হাঁটু পর্য্যন্ত আগেরই মত অবিকল। পায়ের গোড়ালিতে কয়েকটা ফাটার দাগ নতুন, দুর্ব্বোধ্য। আলতা পরুক আর না পরুক, ঝামা ঘষুক আর না ঘষুক, নতুন মামীর পায়ে ফাটল ধরেছে বড় মামী, মেজ মামী, বিন্দে ঝির মত, যারা খালি পায়ে ভিজে মেঝেতে হেঁটে বেড়ায় সংসারের কাজে! কি অদ্ভুত ব্যাপার এটা? চোখ একেবারে নতুন হয়ে গেছে নতুন মামীর। এ আবছা কালো কাজলের ছোপ কোথা থেকে এলো চোখের নীচে, চোখের পাতায়, যা কাজল নয়, চামড়ার রঙ? চোখে যেন কোনো একটা কষ্ট স্পষ্ট হয়েছে, দেহের অথবা মনের। বরাবর সে দেখে এসেছে শুধু আনন্দের, উল্লাসের, প্রাণ-চাঞ্চল্যের চমক-মারা জ্যোতিভরা চোখ নতুন মামীর, ক্লান্তিতে স্তিমিত। অথবা অন্য কিছু হয়েছে নতুন মামীর চোখে? চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা নেবার দরকার? এ বড় বিশ্রী ব্যাপার। নতুন মামীর চোখ বদলে গেছে, খাপছাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু কেন হয়েছে, কি বৃত্তান্ত কিছুই সে জানে না, জানবার উপায় নেই। অথচ শুধু এটুকু জানবার জন্য সে মরতে রাজী আছে।

চান করবে? সত্যি চান করবে? চলো তবে, আর দেরি নয়, চলো।

নতুন মামী যেন ধৈর্য্য হারায়।

পাকা সাবান মেখে স্নান করে আসে। খেতে বসে। ডাল তরকারি মাছ

দুধ সন্দেশ সব চেটেপুটে খায়। আঁচিয়ে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। নতুন মামী মশারি ফেলে মশারি গুঁজে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চৌকির পাশে এটা সে অনুভব করে দু-এক মিনিটের জন্য, স্বপ্ন দেখার মত। তারপর গাঢ় ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে জাগ্রত দিনটা শেষ হয়।

তিন

১

একুশের আন্দোলন আপোষের হতাশায় ফুরিয়ে গেছে। স্বাধীনতা আসে নি।

আন্দোলন নেই কিন্তু নেতারা আছেন। সাধারণ খাটিয়ে গরীব মানুষ বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু নেতারা মুনাফা লুটেছেন জনপ্রিয়তার।

এই শহরের ছোটখাট নেতারা পর্য্যন্ত।

স্বাধীনতা নাই বা পাওয়া গিয়ে থাক্ একুশ সালে, ক'বছর পরে শহরটা স্বাধীনতার ভরসা-দাতা মহাপুরুষ অনন্তলালকে পেয়েছে।

রবিবার বিকালে রাজা ভীমশ্রীতিলক মেমোরিয়াল হলে অনন্তলালকে মহা-সমারোহে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হল।

শুধু বিকালে নয়, সমস্ত রাত ধরেও বটে। সভাটা হল বিকালে, ঘণ্টা দুই। তারপর রাত দশটা থেকে কাকডাকা ভোর পর্য্যন্ত হলের স্থায়ী স্টেজে অভিনয় করা হল বাংলায় বর্গীর হানা অবলম্বনে লিখিত একটি নাটক ও 'শিক্ষিতা বৌ' প্রহসন। এটাও যে অনন্তলালের সম্বর্দ্ধনারই অঙ্গ বিকালে সভায় তা বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল।

এই জেলা শহরে একটি মস্ত এ্যামেচার ড্রামেটিক ক্লাব আছে, প্রতিষ্ঠা "১৯১৮ সাল ইং"। সাত-আট বছর ধরে ক্লাবটি প্রতিবছর গড়ে তিনটি নাটক এবং প্রত্যেকটি নাটকের সঙ্গে ছোট একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করে শহরবাসীকে আনন্দ দিয়ে আসছে, অসহযোগ আন্দোলন চলবার সময়টা ছাড়া। আন্দোলন একটু

থিতিয়ে এলে, যাঁরা জেলে গিয়েছিলেন অধিকাংশই যখন বেরিয়ে আসেন নি, ক্লাব মরিয়া হয়ে ক্লাবের সভ্য তরুণ উকিল মরেন দস্তিদারের স্বলিখিত একটি স্বদেশী নাটকের অভিনয় করে শহরবাসীর হৃদয় জয় করে।

নাটকটি ছিল খুবই কাঁচা আর অত্যন্ত ফেনিল ও করুণ। দেশের জন্য ত্যাগ করা, এমন কি নায়িকাকে পর্যন্ত কিছু দিনের জন্য দেশের বৃহৎ প্রয়োজনের কাছে ছোট করা, এসব ছাড়াও অন্য বড় বড় কথা ছিল অনেক, তবু নাটকটা ছিল শুধু ব্যর্থতা ও হতাশার বেদনায় ভরা, পরিণতিটা মিলনাত্মক হলেও। মাত্র কয়েকবছর পরে আজ ক্লাবের সভ্যরাই টের পেয়ে গেছে, ওরকম বাজে নাটক কেন তখনকার মানসিক অবস্থায় মর্ম স্পর্শ করেছিল সকলের। সংঘর্ষের অভাব, জীবন্ত তেজ ও বিক্ষোভের অভাবে কাতর হয়ে মনটা আঁকুপাঁকু করেছিল সকলের যে, মানুষ যা চায় তা হয় না কেন!

ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল রাজকুমার জয়শ্রীতিলক, এখন সে সীতাপুরের রাজা। গোড়ায় সে অভিনয় নিয়ে মেতে উঠেছিল, ক্লাবের পিছনে অনেক টাকা খরচ করেছে। রাজা হবার পর অন্য কড়া কড়া নেশায় মেতে পুরুষকে মেয়ে সাজিয়ে এ্যামেচার থিয়েটার করবার বা করাবার নেশাটা জলো হয়ে গেছে খানিকটা। আজও প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নাম থাকলেও ক্লাব তাকে তেমনভাবে আর পায় না, তার টাকাও পায় কদাচিৎ, যৎকিঞ্চিৎ।

অনন্তলাল বরাবর মাসে দশ টাকা করে চাঁদা দিয়ে এসেছে, এবার এখানে এসে সকলে ধরে পড়ায় ক্লাবের ফাণ্ডে এককালীন দান করেছে আড়াইশো টাকা।

আরও সপ্তাহ দুই রিহার্সাল দেবার দরকার ছিল নাটকটা ভালমত খাড়া করতে, কিন্তু অনন্তলাল কাল চলে যাবে তাই আজ তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে অভিনয় করা হচ্ছে। অভিনয়ে খুঁত থাকবে সন্দেহ নেই কিন্তু কে ধরবে খুঁত মফস্বলের শহরে এই বিখ্যাত দলের অভিনয় বিনা পয়সায় দেখতে এসে!

এদের থিয়েটার সত্যই এখানে একটা উৎসব পরবের মত। ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে যায়, পান, বিড়ি, লেমোনেড, চা যারা বিক্রি করে তাদের মধ্যেও। বাড়ী বাড়ী মেয়েরা তাড়াহুড়া হৈ চৈ করে বেলাবেলি রাঁধাবাড়া সারে, আগ্রহে উত্তেজনায় তাদের ওলট-পালট হয়ে যায় কথাবার্ত্তা চলাফেরা কাজকর্ম্ম। উতলা হবার জন্য পুরুষেরা ঠাট্টা করে মেয়েদের, তেমন সম্পর্ক হলে ধমকও দেয়, কিন্তু মনে মনে তারাও কম উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে না সময়মত যাবার জন্যে, আগে থেকে পাট-করা জামাটি, ফরসা কাপড়টি ঠিক করে, জুতোতে কালি লাগিয়ে রাখে।

ওসব বালাই যাদের নেই, রান্নাবান্নার হাঙ্গামারও নয়, ফরসা জামা-কাপড়েরও নয়, অর্থাৎ গরীবদের, তারাও অনেকে শুনতে যায় থিয়েটার। কয়েকটা বেশি পয়সার ব্যবস্থা রাখে, কিছু বেশি পান ও বিড়ির জন্য। আগে গেলেও তারা সামনে বসতে বা দাঁড়াতে পায় না। পিছনের বেঞ্চে কয়েকজনের স্থান হয়, বাকি সব দু'পাশে ও পিছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে সারারাত থিয়েটার যতটা পারে দেখে ও শোনে।

অনেকে ভাবে যে বাবুদের এমন বোকামি কেন, লম্বাটে ঘরের এক মাথায় পালা না করে ফাঁকা জায়গায় আসর করলেই হয় চাদ্দিকে স্থান রেখে, ঘিরে বসে মানুষ শুনতে পারে।

রাজা ভীমশ্রীতিলক মেমোরিয়েল হলটি অভিনয় করার উদ্দেশ্যে থিয়েটার হলের মত করেই তৈরি। পাকা মেঝে ও উঁচু দেয়াল, উপরে কাঠের আচ্ছাদন, তার উপর টিনের চালা। গাদাগাদি করে হাজার খানেক লোক ধরে। ক্লাবের প্রত্যেক অভিনয়েই গাদাগাদি মানুষ হয়।

একটু ফাঁকায় হলটা তৈরি করা হয়েছে জায়গার স্থবিধার জন্য, কাছাকাছি বাড়ীঘর বেশি নেই। শহরের সভাসমিতি সব কিছুই প্রায় হয়ে থাকে আদালত এলাকা ও শহরের বসবাসের এলাকার মাঝামাঝি চৌকো টাউন হলটাতে। কদাচিৎ বিরাট জনসভা হলে, ফাঁকা মাঠে। এই হলটি শুধু যেন আছে অভিনয় করবার জন্য, এখানে সভা করার, এমন কি বিরাট জনসভা করার পর্য্যন্ত এত স্থবিধা, কিন্তু নাটক অভিনয় ছাড়া সারা বছর ওখানে কিছুই হয়

না। বোধ হয় এই কারণে যে সেটাই দাঁড়িয়ে গেছে প্রথা। টাউন হলটি পুরানো, দেয়ালে কয়েকটি বড় বড় তৈলচিত্র, কয়েকস্থানে বসানো কয়েকটি মর্ম্মর মূর্ত্তি এবং টেবিল চেয়ার বেঞ্চগুলি অযথা ভারিক্কি গঠনে গুরুগম্ভীর। ভারিক্কি লোকেরা ওখানে সভা করতেই হয়তো তাই ভালবাসে।

সারা বছর ফাঁকা পড়ে থাকে থিয়েটারের হলটির আশেপাশের জায়গা, সন্ধ্যার পর সেখানে হয়তো শেয়ালও ঘোরাফেরা করে নিঃশঙ্ক চিত্তে, অসংখ্য বাদুড়-চামচিকে যে হলটার ভেতরে বাসা বেঁধেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় অভিনয়ের রাত্রেও—অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তৃতার সময়ও হয়তো চামচিকে নায়কের গালে ঝাপটা দিয়ে নায়িকার ওড়নায় জড়িয়ে গিয়ে দর্শকদের হাসায়। তবে তাতে অভিনয় মাটি হয় না। এক মিনিট পরে কেউ মনেও রাখে না চামচিকের কথা।

নিখিল ঘোষাল এই ক্লাবের সেরা অভিনেত্রী।

ক্লাব স্থাপনের পর প্রথম নাটকে সতর-আঠার বছর বয়সে সে নায়িকার পার্ট করেছিল, সাত-আট বছর পর আজও কেউ তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে অতিক্রম করে যেতে পারল না। পড়াশোনা ছেড়ে সে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে চাকরি নিয়েছে, পাড়ার একটি কালো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে তাকে বিয়ে করেছে বছর দুই আগে বাড়ীর লোকের সঙ্গে লড়াই করে, ক'মাস আগে একটি মেয়ে হয়েছে তার। রোগা ছিপছিপে গড়নটি তার অবিকল বজায় আছে, গোঁফদাড়ি কামিয়ে মুখে রঙ মেখে বুকে কাঠের বর্তুল দুটি এঁটে নিজের স্ত্রীর একখানা জমকালো সিল্কের শাড়ী পরে (ক্লাবের সভ্যরা অভিনয়ের জন্য দরকারি সাধারণ পোশাক নিজেদের বাড়ী থেকেই আনে, বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা ক্লাবের আছে) সে যখন এবারও স্টেজে এসে দাঁড়াল, পুরুষেরা তাকাল সচকিত হয়ে, মেয়েদের চোখের কোণে ঝিলিক মেরে গেল ঈর্ষা।

কবে বর্গী এসেছিল বাংলায়, তখনকার মেয়েদের বিশেষ ধরণের বেশ ধারণ করার সুযোগে একেবারে মোহিনী হয়ে নিখিল নেমেছে স্টেজে, বাস্তব জীবনে কোনো মেয়ের আজ যে সুযোগ স্বাধীনতা নেই।

ভুবনের বিধবা বোন চপলা তার মেয়েকে বলে, ওরকম সাজতে ইচ্ছে হচ্ছে তোর ! টের পেয়েছি।

পনের বছরের প্রতিমা বলে, কি রকম মানিয়েছে দেখো মা !

মানিয়েছে, স্টেজে মানিয়েছে,—চপলা বলে, মেয়েকে অত্যন্ত বিরক্ত করেছে জেনেও ধীর-স্থির ভাবে বলে—তুমি যদি বাড়ীতে ওরকম বেশ কর, স্কুলে যাও, সবাই হাসবে। পাকাও হাসবে। তা ছাড়া কি জানো, তখনকার দিনেও কোন মেয়ে ওরকম বেশ করত না। কোন মেয়ে তখন এরকম বেশ করলে তখনকার লোকেরাও ভাবত সং সেজেছে।

মা, আমি রানীর কাছে গিয়ে বসি ?

বসো।

চপলা নিশ্বাস ফেলে। উপায় কি ?

সুধার সঙ্গে কথা বলে চপলা। ভুবন ও ভৈরবের বাড়ীর মেয়েরা কেউ কারো বাড়ী বেড়াতে যায় না বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কথা বন্ধ নেই। কথা না বলে দূরত্ব বজায় রাখাটা ধাতে আসে না মেয়েদের। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস গুজগাজ নিন্দা ও সমালোচনা চলে অফুরন্ত অন্য বাড়ীর মেয়েদের সম্পর্কে, দূর থেকে এড়িয়ে চলা চলে, সামনে পড়লে পরিহার করাটা ধাতে সয় না। নলিনী দারোগার বৌটাকে পর্য্যন্ত ছেঁটে ফেলতে পারে নি মেয়েরা এখানে, পারলে দোকান সাজানোর মত গয়না আর অদ্ভুত ঝলমলে শাড়ী পরে বেচারি ঘেঁষাঘেঁষি মেয়েদের মধ্যে একেবারে একা হয়ে যেত, সাথী থাকত শুধু তার ন'মাসের ছেলে রাখবার ঝিটি।

দারোগার বৌ ! কিছুকাল আগেও যে দেশে মা ছেলেকে আশীর্বাদ করত এই বলে যে, দারোগা হও,—সেই দারোগার বৌ !

অহঙ্কারে এমনিই তার গলা উঁচু, বুক চেতানো, আর একটু অহঙ্কার বেড়ে নিজে থেকেই সে যদি একা হয়ে যেত কারো সঙ্গে কথা না বলে, সকলে খুশি হত, স্বস্তি পেত। পান চিবিয়ে চিবিয়ে তার কাটা কাটা কথা, নাক সিটকানো, বয়স্কাদেরও তুমি তুমি করা, ভুল করে অন্যটার বদলে আজ এই জড়োয়া নেকলেসটি পরে আসবার কথাটা হাজারবার উল্লেখ করা—শুনতে

শুনতে সকলের গা জ্বালা করে। বড়ঘরের মেয়ে-বৌয়েরা নানা কৌশলে স্থান অদল বদল করে একটু সরে যায়, পিক ফেলতে উঠে গিয়ে ফিরে এসে অন্য একজনকে নিজের খালি জায়গায় বসিয়ে নিজে বসে তার জায়গায়। একসময় দেখা যায়, নলিনী দারোগার বৌ যাদের মধ্যে এসে বসেছিল তারা আর নেই তাকে ঘিরে, গরীব মধ্যবিত্তের বৌ, বয়স্কা গৃহিণী আর বিধবাদের মধ্যে সে শোভা পাচ্ছে। তার বসার উদ্ধত ভঙ্গি বদলে গেছে, কথাও কমে গেছে আশ্চর্য্য রকম!

ভুবনকেও আসতে হয়েছে অনন্তলালের সম্বর্দ্ধনার সভাটি বাদ দিয়ে এই অভিনয় উপলক্ষে। এখানে না এসে উপায় নেই, লোকে ভাববে তাকে বুঝি নিমন্ত্রণ করা হয় নি, সে বুঝি বাদ পড়েছে। সামনে সম্মানের আসনে ভৈরবের পাশেই তাকে বসতে দেওয়া হয় অন্যান্য গণ্যমান্যদের সঙ্গে, ভৈরব ও অনন্তলালের সঙ্গে ভদ্রতার অমায়িক আলাপও তার চলে। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বা উঁচুদরের হাকিমরা কেউ এখানে আসে না, কারণ তাদের বসবার স্পেশাল স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত নেই। ভৈরব, ভুবন, অনন্তলাল প্রভৃতি বিশেষ মান্যগণ্যেরাও সাধারণত নাটক আরম্ভের একঘণ্টা দেড়ঘণ্টার মধ্যে উঠে যায়। তারা যে গণ্যমান্য নেতা!

২

রাতের পর রাত যে শূন্য নির্জ্জন হলটিকে ঘিরে অন্ধকারে মেঠো বাতাস কেঁদে ফেরে, আজ তার ভিতর ও বাইরে এত হৈ চৈ কলরব, আলোর ছড়াছড়ি ভোজ বাজির মত অদ্ভুত লাগে, রাত্রি জাগরণের এমন উপভোগ্য উন্মাদনার মধ্যেও ভোলা যায় না কাল আলোহীন শব্দহীন এই পরিত্যক্ত স্থানটি দূর থেকে দেখেও মনটা বড় খারাপ হয়ে যাবে। স্বপ্নের মত মিথ্যা মনে হবে আজ রাত্রের উৎসব, আনন্দ, কোলাহল।

পাকা অন্য মনে কানাইকে বলে, কাল সন্ধ্যাবেলা একবার আসতে হবে কানাই। দেখে যাব, কি রকম লাগে!

কানাই চুপ করে গম্ভীর হয়ে থাকে। অন্য একটি ছেলের সঙ্গে পাকার অনেক পরে কানাই থিয়েটার দেখতে এসেছে। এসেই একেবারে বসে পড়েছে জায়গা দখল করে। তাদের যেন বসে দাঁড়িয়ে সামনে থেকে বা স্টেজের ভিতরে গিয়ে থিয়েটার দেখার কখনো অসুবিধা হয়, সাজঘরে ঢুকে আড়ালের ব্যাপারগুলি দেখবার ইচ্ছা হলেও কেউ ঠেকাতে পারে। কানাইয়ের সঙ্গের ছেলেটিকে চেনে না পাকা।

সিগ্রেট টেনে আসি চ'।

নাঃ, কানাই বলে একান্ত অবহেলার সঙ্গে, ছেড়ে দিইছি। ধোঁয়া গিলে স্বাস্থ্য নষ্ট করে লাভ? মিছিমিছি পয়সা নষ্ট।

কানাইয়ের মুখে এমন গুরুজনী কথা! পাকা একটু হেসে সরে যায়। সঙ্গের ছেলেটির সামনে কানাই সিগারেট খাবে না, এটুকু কি আর সে বোঝে না! নরেশ কিন্তু গুরুতর খবর দেয়। কানাই নাকি সত্যই বিড়ি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ভাল হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে মেশে না। শুধু বিড়ি সিগারেট নয়, তাদেরও ত্যাগ করেছে। শুনে তখন খেয়াল হয় পাকার যে কানাই তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলে নি, তাকে এতটুকু আমল দেয় নি। কানাই তার সঙ্গে মিশবে না? নতুন বন্ধু পেয়েছে? বহুৎ আচ্ছা, কেঁদে কেঁদে সে মরে যাবে!

দু'মিনিটের মধ্যে সে ভুলে যায় কানাইকে, একবার সাজঘর ঘুরে আসে, মালাইকর সিদ্ধেশ্বরের কাছে মালাই কিনে খায়, সিগারেট টানে, পান চিবোয়, মানুষের রকম দেখে, মানুষের সঙ্গে কথা বলে, ভেতরে বাইরে এখানে সেখানে পাক খেয়ে বেড়ায়, ড্রপ উঠলে একটা সিন স্টেজে উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে আর একটা সিন সামনে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছাখে। তার প্রাণ আনন্দে উচ্ছল, সেখানে তুচ্ছ সুখদুঃখের স্থান নেই। কেবল সে নয়, ছেলেবুড়ো সকলেই যেন এখানে আজ কি একটা গভীর লজ্জা ও দুঃখের, আত্মকৃত অপরাধের চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়েছে, আজকের সন্ধ্যার চরম কর্তব্য হিসাবে আঁকড়ে ধরেছে এই উৎসবকে, সাময়িক ফাঁপানো আনন্দে মশগুল হয়ে যেতে। ছেলেরা চঞ্চল, একটু উচ্ছৃঙ্খল, বড়রা একটু

ধীরস্থির কিন্তু ভাব প্রায় সকলের একরকম। আনন্দের উপলক্ষ হিসাবে সারারাতের থিয়েটার তো আগেও ছিল এখনও আছে, কিন্তু তাতেই সবাই খুশি নয়, এই উপলক্ষকে নিঙড়ে নিঙড়ে শেষবিন্দু আনন্দ আহরণ করলেই শুধু চলবে না, নিজের ভেতরের উত্তেজনা উন্মাদনা দিয়ে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে উথলে তুলতে হবে সে উপভোগকে! নাটক, অভিনয়, দৃশ্যপট ভাল কি মন্দ কেউ যেন তা বিচার করে না, যে রসটুকু পরিবেশন করা হয় রঙ্গমঞ্চ থেকে তাতে নিজের তাগিদেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে দর্শকেরা। ভাল করে যে নাটক দেখছে না, এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে চঞ্চলভাবে, বাইরে যে রয়েছে নাটক না দেখেই, তার মুখখানাও উত্তেজনায় স্ফুরিত।

গ্রামের মেয়ে-পুরুষ বিশেষ উপলক্ষে যেভাবে সমারোহ করে যাত্রা দেখে, অবিকল সেই রকম।

তা ছাড়া, তুচ্ছ কারণে, হয়তো একেবারেই অকারণে, আজ ক্রমাগত গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা চলতে থাকে দর্শকদের মধ্যে, বিশেষ করে বয়স যাদের কম। একটা বাধা কাটিয়ে দেখতে দেখতে নাটক জমজমাট হয়ে ওঠে, অভিনেতাদের যেন কিছুমাত্র সাধ্য সাধনারও দরকার হয় না, হঠাৎ হয়তো এককোণে হাতাহাতি বাধবার উপক্রম ঘটে যায় একজনের কনুইয়ে আর একজনের একটু গুঁতো লাগায়, অথবা একজন আর একজনকে মাথাটা পকেটে ভরতে অনুরোধ করেছে বলে। এই হলে আজকের মত অভিনয়ও কখনো আর এমন জমে নি, আন্দোলন থামবার পর সেই স্বদেশী নাটকটির অভিনয়ও নয়, এমন গণ্ডগোলও কোনবার দেখা যায় নি দর্শকদের মধ্যে।

লোকে বিরক্ত হয় অল্পক্ষণের জন্য, গোলমাল থামলে তখন সেই ফ্যাকড়াটাও যেন উপভোগ করে। একঘেয়ে জীবনে অভিনয় একটা নতুনত্ব, চিরকেলে একটানা অভিনয়ে গোলমাল যেন আর একটা নতুনত্ব, মজার ব্যাপার!

কয়েকজনের ভাল লাগে না। যেমন সপরিবারে মুন্সেফ সুরেন ঘোষালের। টসটসে মিষ্টিরকম মোটা স্ত্রী, কাঁদ-কাঁদ-মুখ কিশোরী মেয়ে ও ছ-সাত বছরের দুটি গম্ভীর চুপ-চাপ যমজ ছেলে।

পাকাকে দেখে যেন অকূল পাথারে কূল পেল সুরেন।

পাকা, বড় বিপদে পড়েছি বাবা। বেয়ারাটাকে এখানে থাকতে বলেছিলাম, ব্যাটা যেন কোথা ভেগেছে!

কোথা দাঁড়িয়ে থিয়েটার শুনছে।

আমার যে এদিকে মুশকিল ভাই। উনি বলে পাঠাচ্ছেন, ভিড়ে ওঁর ফিটের উপক্রম হচ্ছে, এখুনি বাড়ী যাবেন।

বাড়ী নিয়ে যান।

কোথা গাড়ী পাই, কি করি—সুরেন যেন কেঁদে ফেলবে।

ভৈরব ও অনন্তলাল তখনো যায় নি। পাকা গিয়ে দাবি জানায়, একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে হবে, মামার গাড়ীটা একটু চাই আধ ঘণ্টার জন্য।

অনন্তলাল বলে, আমি যে যাব ভাবছিলাম? তোর নতুন মামী—

নতুন মামী থাকবে বলেছে, পাকা স্পষ্ট মিথ্যা জানায়।

গাড়ীটা পাওয়া যায় ভৈরবের, সুরেন সপরিবারে উঠে বসে গাড়ীতে, কিন্তু পাকা নিজেই গোল বাধায় সব বিষয়ে তার কর্তালি করা স্বভাবের দোষে। গঙ্গা কামার, সৈদবাজারের দক্ষিণে গলির মোড়ের কাছে তার কামারশালা আছে, পানের দোকানের সামনে মাটিতে বৌটিকে শুইয়ে তার কপালে বরফ ঘষে দিচ্ছিল, বৌটি সত্য সত্যই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। চারিদিক ঘিরে কাঁদছিল এগারো থেকে দেড় বছরের পাঁচটি ছেলেমেয়ে। পাকা মাঝে মাঝে ওর দোকানে উবু হয়ে বসে মুগ্ধ হয়ে দেখেছে, নেহাই-এর উপর তাতানো লোহা থেকে হাতুড়ির আঘাতে আগুনের ফুলকি ছোটা, দেখেছে দু'হাতে হাতুড়ি তুলে প্রাণ-পণে যে ঘা মারছে সেই ধুমসো কালো সহকারীটির ডাকাতের মত চেহারা।

গঙ্গাকে ব্যাপার জিজ্ঞেস করেই সে এক অন্যায় প্রস্তাব করে বসল। ওদেরও তুলে নিতে হবে গাড়ীতে, আগে ওদের পৌঁছে দিয়ে গাড়ী সুরেনদের বাড়ী যাবে।

হাসপাতালে নিতে হবে না তো?

না বাবু। ঘর গিয়ে একটু শুয়ে রইলে ঠিক হয়ে যাবে। ফিটের ব্যারাম, মাঝে মাঝে এমন হয়।

সুরেন চটে বলে, পাকা, এ গাড়ীতে কখনো জায়গা হয়?

তার স্ত্রী অনুরাধা বলে অধীর হয়ে, আমাদের পৌছে দিয়ে আসুক না, তারপর ওদের নিয়ে যাবে ?

তুমি গাড়ী চালাও তো ড্রাইভার, ও পাগলের কথা শুনো না—বলে তাদের রূপসী কিশোরী মেয়ে মায়া।

তবে আপনারা নেমে একটু ওয়েট করুন, পাকা বলে, আগে ওকে পৌছে দিয়ে আসুক। দেখছেন না অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ?

সুরেন বলে, পাকা, শুনে যাও, কাছে এসো।

অনুরাধা বলে, পাকা, তুমি ভারি ইয়ে কিন্তু !

মায়া বলে, পাকাদা !

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। গঙ্গা কামারকেও সপরিবারে স্থান দিতে হয় গাড়ীতে—বৌকে বুকে কোলে নিয়ে এক কোণে বসে যথাসম্ভব কম জায়গা দখল করার চেষ্টা করে গঙ্গা, কিন্তু হলে কি হবে, তার পরিবারটি প্রকাণ্ড। ড্রাইভার মাখন একটু বিরক্তি ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলতে গিয়েছিল গঙ্গারা গাড়ীতে উঠবার আগেই : কি করছেন দাদাবাবু, বাবু জানতে পারলে—

চোপরাও !

সে গর্জ্জনে শুধু ড্রাইভার নয়, সুরেনও সপরিবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুধাও এদিকে অনন্তলালকে জিজ্ঞেস করে পাঠায়, বাড়ী ফিরতে দেরি কেন ? এসব যাত্রার মত অভিনয় ও লোকের তা উগ্র আগ্রহে শোনা বেশিক্ষণ ভাল লাগে না সুধার। অনন্তলাল বলা মাত্র তিনটি ছেলে খুঁজে পেতে এনে হাজির করে দেয় পাকাকে, সঙ্গে আসে নরেশ। নরেশকে হঠাৎ কিছু সদুপদেশ দেবার সাধ জেগেছিল পাকার। বাইরে থেকে যা মনে হয় অপরূপ অদ্ভুত, ভেতরে সেটা যে শুধু ফাঁকির ব্যাপার, এটা বোঝানোর জন্য নরেশকে সে সাজঘরে নিয়ে গিয়েছিল। মেয়ে-সাজা নিখিলকে দেখিয়ে বলছিল, বাইরে থেকে কেমন ছাখায়, আর কাছে থেকে কেমন ছাখায় ছাখ। গা ঘিন ঘিন করে না দেখলে ?

করে না তো ! আমার বরং ভাল লাগছে দেখতে।

পাকা একটু ভড়কে গিয়ে মনে মনে জবাব খুঁজছে, অনন্তের অনুগত

একটি ছেলে তাকে সেখানে আবিষ্কার করে বলে, শীগ্গির, অনন্তবাবু ডাকছেন।

পাকা ধীরভাবে বলে, কি হয়েছে ?

ছেলেটি উত্তেজনায় প্রায় তোতলায়, অনন্তলালের একটা হুকুম তামিল করতে পেরেছে এ তার কল্পনাতীত সৌভাগ্য ! বলে, ডাকছেন, তাড়াতাড়ি এসো।

অনন্তলাল বলে, তুমি বললে থাকতে চায়, এদিকে দেখি যাবার জন্য তোমার মামী ব্যস্ত।

নতুন মামী আজ রাত্রে যাবে ? হুঁঃ! দাঁড়ান আমি দেখে আসছি।

সুধা বলে, ভাল লাগছে না আমার। খালি বীরত্ব আর চীৎকার—

পাকা বলে, এ ঘুপটির মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকলে ভাল লাগে ? চাদ্দিকে একটু ঘোরো ফেরো, ছাখো শোন—

ওমা, থিয়েটার চাদ্দিকে ছড়ানো থাকে নাকি ? বাইরে পর্য্যন্ত ?

থাকে না ? চাদ্দিকেই তো আসল থিয়েটার।

তা নয় হ'ল। শরীরটা যে ভাল লাগছে না !

শরীর ভাল লাগছে না ? চলো এখুনি তবে তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই। গাড়ী যোগাড় হয়ে যাবে।

সুধার গলায় কথা আটকে যায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। এই অনিয়মকে নিয়ে কি করা উচিত ভাববারও সময় নেই।

ও কিছু নয়। আর একটু দেখেই যাই। বাড়ী দিয়ে আসতে পারবে তো ?

পারব না ?

সকলের সঙ্গে গেলে হবে না কিন্তু, ওরা রাত কাবার করবে। আমি অত রাত জাগতে পারি না।

পাকা হাসিমুখে অভয় দিয়ে বলে, যখন তুমি যেতে চাইবে, তখনি নিয়ে যাব। আধ ঘণ্টা পরে পরে তোমার খোঁজ নিচ্ছি।

সুধা শুধু চেয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে পাকা একটু বিব্রত বোধ করে নিজের বাহাদুরিতে। মনে হয়, সুধা যেন জগতে সকলের চেয়ে তাকেই বেশি আপন বলে চিনে ফেলেছে হঠাৎ !

কানাই কখন উঠে চলে গেছে তার নতুন বন্ধুটির সঙ্গে, পাকা টের পায় নি। কানাইকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। হঠাৎ সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, বন্ধুত্বও ত্যাগ করেছে। তার সঙ্গে মিশে বখে যাবার ভয় হয়েছে নাকি ওর?

নরেশ সঙ্গে লেগে ছিল গোড়া থেকে, মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য সেও যেন উধাও হয়ে গিয়েছিল কোথায়। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সে আবার এসে সঙ্গ ধরল।

পাকা, তুই আমাকে চাস্ কি না বল্ তো স্পষ্ট করে?

তার মানে?

মানে, তুই যদি আমার বন্ধুত্ব না চাস্, সোজা কথায় বল্, আমি কানাইয়ের দলে যাই।

কানাই দল করেছে নাকি?

দল নয়, তোর সঙ্গে কানাই মিশবে না।

তুই কানাইয়ের দলে যা নরেশ।

নরেশ আহত হয়ে ফোঁস করে ওঠে কিন্তু লেগে থাকে পাকার সঙ্গেই।

গাড়ী ফিরে এলে ভৈরব আর অনন্তলালের সঙ্গেই পাকা নতুন মামীকে বাড়ী পাঠিয়ে দেয়। হুকুমের ভঙ্গিতে তার কথা বলার ধরন শুনে সুধা হেসে ফেলে।—থিয়েটার দেখব না?

না, খারাপ শরীরে রাত জাগতে হবে না।

তোমায় জাগতে হবে, কেমন?

আমার শরীর তো খারাপ নয়!

মস্ত নাটক, অভিনয় শেষ হয়ে প্রহসন আরম্ভ হতে হতে চারিদিকে ফরসা হয়ে এল। তখন পাকার খেয়াল হল, আজ তার ব্যায়ামের আখড়ায় যাওয়ার কথা, কালীনাথকে কথা দিয়েছে। ঘাটে নেমে মুখে চোখে জল দিয়ে দোকানে এক কাপ চা খেয়েই সে জোরে জোরে হাঁটতে আরম্ভ করে। রাত জাগা আর ছটফট করে ঘুরে বেড়ানো পা দুটিকে ছুটিয়ে জোরে হাঁটা অসহ্য হয়। পাকা ভাবে, সাইকেলটা আনলে এখন কাজ দিত।

চলতে চলতে পথে এক অদ্ভুত গুজব শোনে পাকা। মাঝ রাত্রে থিয়েটার দেখে বাড়ী ফেরার পথে নলিনী দারোগার স্ত্রীর গায়ের গয়না ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতেরা নাকি ভদ্রঘরের ছেলে, মুখোশ পরা ছিল। নলিনী দারোগার স্ত্রীকে তারা নাকি বলেছিল, মা, আপনার বিয়ের গয়না রেখে অন্যগুলি খুলে দিন—আমরা কিন্তু জানি কোন্‌টি কোন্‌টি আপনার বিয়ের গয়না। তারা নাকি আরও বলে দিয়েছে যে আজ মহাপাপের গয়নাগুলি গেল, স্বামী যদি তার সাবধান না হয় একদিন তাকেও হারাতে হবে।

৩

আখড়ায় পৌঁছবার তাড়ায় খবরটা ভাল করে শুনবারও সময় সে পেল না। ছেলেরা সবাই ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে, খেলা ও ব্যায়াম শুরু হয়েছে। কালীনাথ হাজির ছিল, পাকা পৌঁছতেই কাছে ডাকল।

পাকা, তোমার নাম কাটা গেছে। তুমি আর এখানে এসো না।

নাম কাটা গেছে? দু'চোখ জ্বলে ওঠে পাকার, কেন?

তোমার মত ছেলেকে আমরা চাই না পাকা।

কি করেছি আমি?

বদ ছেলেদের এখানে স্থান হয় না ভাই।

অন্য যে কোন মানুষকে যা-তা বলা যায় রাগের মাথায়, কালীনাথকে গাল দেওয়া যায় না। পাকা অনুযোগের সুরে বলে, এ আপনার অন্যায় কালীদা। আমি বদ, আমার নাম কেটে দিলেন, আমায় বলবেন না আমি কি করেছি?

তুমি নিজেই বেশ বুঝতে পারছ।

কালীনাথ ভাবে, এখনো সতেজে কথা বলছে ছেলেটা। এই বয়সে চরম অধঃপাতে গেছে অথচ সোজাসুজি মুখের দিকে চেয়ে কথা বলছে সহজ ও স্পষ্ট। পোকায় না ধরলে কী যে তৈরি করা যেত একে! মনের মত একটা আগুনের গোলা!

সিগ্রেট খাই, আড্ডা মেরে বেড়াই বলে ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকায় কালীনাথ।—চাল মারছ, না? তুমি কি শুধু সিগ্রেট খাও, আড্ডা মেরে বেড়াও? ওসব দোষ আছে জেনেই তোমায় ক্লাবে নিয়েছিলাম। ও দোষগুলি ধরি নি। যে সব ছেলের এনার্জি বেশি থাকে, ঠিক মত ট্রেনিং না পেলে তারা একটু ওরকম বিগড়ে যায়—এনার্জির আউটলেট চাই তো। আবার দু'দিনে শুধরেও নেওয়া যায় ওদের। গোবেচারি ভোঁতা ভাল ছেলের চেয়ে এরকম ছেলেদের দিয়েই বরং কাজ হয়, মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু তুমি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছ, তোমাকে দিয়ে আর কোন আশা নেই।

পাকা চেয়েই থাকে জিজ্ঞাসু চোখে।

কালীনাথ আবার বলে, আজ তোমায় বলতে বাধা নেই, তোমার কাছে অনেক আশা করেছিলাম পাকা। অদ্ভুত প্রাণশক্তি দেখেছিলাম তোমার মধ্যে, তেজ আর সাহস। ময়দানে যেদিন চারজন গুণ্ডার সামনে একা রুখে দাঁড়িয়েছিলে, শঙ্করের কাছে শুনেই পরদিন তোমার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তোমায় ডিসিপ্লিন মানানো কঠিন হবে জানতাম, কিন্তু সেজন্য ভাবি নি। আমার সত্যি বিশ্বাস ছিল, অল্পে অল্পে তোমাকে ক্লাবের সেরা ছেলে করে তুলতে পারব। তোমার তুলনা থাকবে না। সারা দেশ একদিন তোমায় নিয়ে গর্ব্ব করবে।

নিন্দা নয়, সমালোচনা নয়, আন্তরিক আপসোস। কালীনাথের আবেগ ও দরদে ফাঁকি নেই। বুকটা তোলপাড় করে পাকার। ক্লাবের ছেলেরা ব্যায়াম করে চলেছে, ডন বৈঠক কুস্তি, মুগুর ভাঁজা, লাঠি ছোরা খেলা, মুষ্টি-যুদ্ধ, যুযুৎসু। সুন্দর সুগঠিত শরীরগুলি, নতুন কয়েকটি ছেলের শরীর গড়ে উঠছে। শঙ্করও আছে ওদের মধ্যে। ময়দানে দুটি মেয়ের পিছু নিয়েছিল চারজন গুণ্ডা গোছের জোয়ান ছোকরা একদিন সন্ধ্যাবেলা। পাকা একাই এগিয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু দেহটা আস্ত থাকবে এ ভরসা রাখে নি। তবে মেয়ে দুটি সরে পড়তে পারবে সে কাবু হতে হতে এটুকু জানত। কিন্তু মারামারি বাধতে না বাধতে চার জনেই আচমকা দৌড় দিয়েছিল পাশের নালা ডিঙিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের দিকে।

সাইকেল থেকে নেমে শঙ্কর আপসোস করে বলেছিল, পালিয়ে গেল!

সেই দিন থেকে পাকার মনে গভীর শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ জেগেছে কালী-নাথের ক্লাবের প্রতি। যে ক্লাবের একটি ছেলেকে আসতে দেখেই চার জন গুণ্ডা মরি কি বাঁচি ভাবে পালায় সে ক্লাব তো সামান্য নয়!

আমার স্বভাব খারাপ জেনেই ক্লাবে নিয়েছিলেন বলছেন, তবে কেন তাড়াচ্ছেন কালীদা?

আগে জানতাম না তুমি বেশ্যাবাড়ি যাও, বস্তিতে গিয়ে তাড়ি খেয়ে হৈ চৈ কর।

ও! এবার বুঝতে পেরে পাকা মাথা হেঁট করে। এই দোষ দুটি এতক্ষণ তার মনে আড্ডা মারা হৈ চৈ করে বেড়ানোর অন্তর্গত হয়েই ছিল।

কালীনাথ বলে, যদি পার নিজেকে শুধরে নিও ভাই। এ ভাবে নষ্ট করার জন্য মানুষের জীবন নয়। কত মহান আদর্শ আছে, সাধনা আছে, কাজ আছে জীবনে, সমস্ত ভবিষ্যৎটা তোমার সামনে…

মাথা হেঁট করে শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে মাথা উঁচু হতে থাকে পাকার। উপদেশ তার সয় না, কোন অবস্থাতে কারো কাছ থেকেই না।

…নিজেকে যদি বদলে নিয়ে মানুষ করে তুলতে পার ভাই, সবার চেয়ে আমি বেশি খুশি হব।

একটা কথা বিশ্বাস করবেন কালীদা? আমি বেশ্যাবাড়ি যাই না, তাড়ি খাই না। দু'দিন শুধু গিয়েছিলাম ওরা কি রকম মানুষ, কি ভাবে থাকে দেখবার জন্যে, একটু সময় থেকেই চলে এসেছি। আর ওই গরীব দুঃখী ছোটলোকদের সঙ্গে মিশতে আমার ভাল লাগে তাই মাঝে মাঝে যাই, তাড়ি খেতে নয়।

কালীনাথ গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকে। সরল হলেও বোকা নয় পাকা। সে জানে তার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কালীনাথ ভাবছে, এ তার চালাকি। বিশ্বাস করলেও তাতে দোষ কাটানো যায় না। বেশ্যাবাড়ি যাওয়াটাই কম গুরুতর অপরাধ নয় এবং তাড়ির ভাঁড় ঠোঁটে ঠেকানো। কিন্তু হৃদয় যে এদিকে তার প্রচণ্ড আবেগে ঠেলে উঠছে, কোন মতে মানতে চাইছে না আজ থেকে ক্লাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকে যাবে। মাঝখানে কয়েকদিন একটু

উদাসীন ভাব এসেছিল, খানিক আগে পাকা নিজেও জানত না ক্লাবের জন্য তার এত মায়া, ক্লাব ছাড়তে গিয়ে মনে হবে সব ফুরিয়ে গেল, সর্ব্বনাশ হল তার। দু'হাতে ক্লাবের মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছা হবে।

সত্যি বলছি কালীদা, আমার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় নি। কোন দিন এক ফোঁটা তাড়ি আমি গিলি নি। আমায় আর একটা চান্স দিন।

আর্ত্ত আবেদন জানায় পাকা।

তা হয় না পাকা।

আমি আজ থেকে অক্ষরে অক্ষরে ক্লাবের নিয়ম মেনে চলব প্রতিজ্ঞা করছি। সিগারেট ছোঁব না, আড্ডা দেব না—

তা হয় না ভাই। আমাকে ক্লাবের ডিসিপ্লিন বজায় রাখতেই হবে। তোমায় আর একটা চান্স দিলে অন্য ছেলেদের নিয়মনিষ্ঠা দুর্ব্বল হয়ে পড়বে। প্রলোভনে পড়লে মনে হবে, একবার ভুল করলেও চান্স পাওয়া যায়। ক্লাবে নাই বা রইলে, নিজেকে বদলে ফেল। ইচ্ছে হলেই এসো আমার কাছে।

অমিতাভের সঙ্গে কানাই আসে আখড়ায়। পাকার রাত-জাগা শুকনো মুখ দেখে অমিতাভ বলে, অসুখ করেছে?

না। তুই ক্লাবে ঢুকেছিস নাকি কানাই?

কানাই অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, কথা বলে না।

পাকা বেরিয়ে যায়। ব্যায়ামরত ছেলেদের দিকে চোখ তুলে সে তাকাতে পারে না। দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করে অপমানে, অভিমানে। তাড়িয়ে দিয়েছে! কানাইকে বরণ করে নিয়েছে, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে ক্লাব থেকে! চলতে চলতে বাড়তে থাকে জ্বালা আর আক্রোশ। আজ থেকে সে শত্রু কালীদার, কালীদার ক্লাবের। মহান আদর্শের জন্য ক্লাব করেছে না কচু! মারপিট করার জন্য তৈরি করছে কতকগুলি গুণ্ডা। সেও একটা ক্লাব করবে। কালীদার ক্লাবে আর কটা ছেলে, তার ক্লাবের মেম্বার হবে একশো।

সুধা বলে, তুমি সত্যি অধঃপাতে গেছ পাকা।

বেশ করেছি। একশোবার অধঃপাতে যাব। তোমাদের কি?

পড়ার টেবিলে দু'হাতে মাথা গুঁজে দেয় পাকা।

সুধা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। পাকা কাঁদছে! তাকে কখনো কাঁদতে দেখেছে বলে মনে করতে পারে না সুধা।

পাকাও তবে কাঁদে? ওর কাঁদুনে মুখখানা দেখতে বড় সাধ হয় সুধার।

কি হল? চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ধরে সে তুলবার চেষ্টা করে পাকার মুখ।

যাও, যাও, চাই না তোমাদের। আমায় কেউ ভালবাসে না, দেখতে পারে না। কাউকে চাই না আমি।

যাঃ, ও কথা বলতে নেই।

এবার জোর করে পাকার মাথা তুলে সুধা বুকে চেপে ধরে। চোখের জলে ভেসে গেছে পাকার মুখ। রাত-জাগা দু'চোখের গভীর দুরন্ত ব্যথা প্রায় অভিভূত করে দেয় সুধাকে।

ছি, একটু বকেছি বলে এমন করে? রাত জেগে বুঝি বিগড়ে গেছে মাথা? যে ভালবাসে সে-ই বকুনি দেয়, বোকা ছেলে। চলো, এখুনি চান করে একবাটি গরম দুধ গিলে, সঙ্গে সঙ্গে বিছানা নেবে। নইলে শুধু বকুনি নয়, মেরে আস্ত রাখব না।

নতুন মামী, আমি খুব খারাপ, না?

না, তুমি খুউব ভাল। ওঠো দিকি এবার।

চার

১

শহর তোলপাড় কদিন থেকে।

ঘটনাটাই একটা চমক, শান্ত অহিংস ভদ্র শহরের ঘাড় ধরা ঝাঁকুনি। তার উপর পুলিসের আকস্মিক কর্ম্মতৎপরতা, খোঁজখবর জিজ্ঞাসাবাদ খানাতল্লাসের হিড়িক—গ্রেপ্তার। অন্দরে-বাইরে রাস্তায়-বাজারে স্কুলে-কাছারিতে লোকের মুখে অন্য কথা নেই। এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে সাবধানে নীচু গলায় কানাকানি ফিসফাস কথা,—সতর্ক হওয়া ভাল, কে চর, কে শত্রু, কে জানে! মুখোশপরা স্বদেশী ডাকাত কেড়ে নিয়েছে নলিনী দারোগার বৌয়ের গায়ের গয়না—বিয়ের গয়না বাদ দিয়ে! বলেছে, মাগো, পাপের বোঝা খানিক হালকা করে দিলাম, এবার একদিন পাপটার কবল থেকে মুক্তি দেব তোমায়। কতকাল এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে নি এ শহরে, অহিংস অসহযোগের আগে তখনকার পুলিস সায়েব ডেভিসকে স্টেশনে মারবার সেই চেষ্টার পর থেকে। বছর গুনে হয়তো খুব পুরানো নয়, অহিংসার বন্যাই যেন স্মৃতিটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে দূর অতীতে। নগেন বোসের ছেলে পনের যোল বছর বয়সের বাচ্চা নারায়ণ গিয়েছিল পিস্তল নিয়ে, একা। গুলিটা বেরিয়েছিল ঘোড়া টেপার দশ পনের সেকেণ্ড পরে পিস্তলটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার সময়, ডেভিসের বুকের বদলে ভেদ করেছিল শেষ বেলার নীল আকাশ।

এবার পিস্তল ছিল চারজনের হাতেই। দেখেই কেঁউ কেঁউ করে উঠেছিল মেয়েদের সঙ্গে চাকর-আরদালী আর নলিনীর শালা। পিস্তল নিয়ে ডাকাতিটুকুই যথেষ্ট ছিল শহরকে নাড়া দেবার পক্ষে, ওদের শাসানিটা চরমে তুলে দিয়েছে উত্তেজনা। এই শেষ নয়, এ শুধু ভূমিকা, আরও আছে ভবিষ্যতে।

রাত আড়াইটে তিনটের সময় জনহীন পথের ঘটনা, কিন্তু তার খুঁটিনাটি বিবরণও জানাজানি হয়ে গেছে। নলিনী অবশ্য ভয়ঙ্কর হুমকির সঙ্গে হুকুম দিয়েছিল সকলকে বাইরের লোকের কাছে মুখ বুজে থাকতে। শ্যামলী কি পারে সে হুকুম মানতে, পাড়ার মেয়েদের কাছে কি কি গয়না গেছে তার ফর্দ আর কি ভাবে গেছে তার রঙদার বর্ণনা দাখিল না করে বাঁচতে! ইয়ার বন্ধু আছে নলিনীর শালা সুখেন্দুর। চাকরটা আরদালীটা গাড়োয়ানটারও কি নেই?

ভদ্রলোকেরা সন্ত্রস্ত, ব্যক্তিগতভাবে যেন বিপন্নও। শঙ্কা ও উত্তেজনা চাপতে আরও বেশি ধীর স্থির। গভীর বিরক্তি আর আপসোস যে, কি কাণ্ড করে গুণ্ডাগুলি! বয়াটে বখাটে ছোঁড়া ক'টা গা ঢাকা দেবে, টানা হেঁচড়া চলবে নির্দোষ ছেলেদের নিয়ে। তবে, নলিনীরও বড় বাড়াবাড়ি, ইয়ংম্যান সব, এমনিতেই রক্ত গরম···। দেশের নামে মেয়েছেলেদের গয়না কেড়ে নেওয়া, গয়না-পরা মেয়েরা বলে, উচিত নয়, ছি! তবে, মাগীরও বড্ড গুমোর বেড়েছিল, সোনাদানা যেন কারো নেই আর, উনি একাই গয়না পরেন!

যুবকদের অনেকটা থমথমে ভাব, অসীম কৌতূহল, জিজ্ঞাসা আর সংশয়, এলোপাতাড়ি তর্ক কিন্তু হাতাহাতি নয়। ব্যাপারটা নলিনী-ঘটিত, তর্কের সময়ও দু'পক্ষের মাঝখানে তার অদৃশ্য উপস্থিতি ভোলা যায় না, ঘোচানো যায় না কিছুতেই, মুখের বদলে হাতাহাতি তর্ক চালাবার মত গরম হয়ে উঠতে পারে না তার্কিকেরা। ছেলেদের বিস্ফারিত চোখ, আবেগে গলায় আটকে আটকে যাওয়া কথা, যার মতে এটা জঘন্য কাজ, তারও। নিন্দা করা যায় কাজটার, কাপুরুষ বলা যায় আর গুণ্ডা ভাবা যায় ডাকাতদের, কিন্তু কোন তরুণ বা কিশোরের সাধ্য কি যে অখুশি হয় নলিনী দারোগার বৌয়ের গয়না লুট হয়েছে বলে।

গরীব সাধারণ মানুষের মধ্যে অতটা উত্তেজনা নেই, যেটুকু আছে তাও অন্য ধরনের। রূপকথার মত তাদের মুগ্ধ করে ডাকাতির গল্প, স্বদেশী বাবুদের দুঃসাহসে তারা অবাক, নলিনীর ক্ষতি ও লাঞ্ছনায় উল্লসিত। হাতুড়ি চালাতে, চাক ঘুরোতে, তাঁত বুনতে, ঘর বানাতে সারাতে, সাইকেল বাসন আসবাব

মেরামত করতে, মাছ ধরতে, কাঠ চিরতে, রাস্তা সারাতে, গাড়ি হাঁকাতে, মোট বইতে, চামড়া পাকাতে, বেসাতি নিয়ে এসে বাজারে বসতে জোরদার বলাবলির সময় বা সুযোগ কম, কাজ শেষের ক্লান্ত অবসরেও পেট-বুকের ভালমন্দের কথায় বার বার চাপা পড়ে যায় ও-আলোচনা। তবু ঘুরে ফিরে বার বার কথাটা ওঠে, স্বদেশী বাবুরা বৌয়ের গয়না নিয়েছে, খুনেটাকে খুনও করবে।

ডেভিসের চেয়ে কার্লটন চালাক বেশি, একটু পিছনে, আড়ালেই থাকে নিজে, যা কিছু করা দরকার করায় নলিনীকে দিয়ে। নলিনীকেই লোকে ভয় করে, ঘৃণা করে বেশি। সাদা হাতের চেয়ে সাদা হাতের কালো চাবুকটাকে।

সার্চ চলে চারিদিকে, সকলের আগে কালীনাথের অগ্রণী ক্লাব, সাধনা সঙ্ঘ, ক্লাব ও সঙ্ঘের সভ্য ও পুরানো দিনের ছাপ মারা কয়েকজন বিপ্লবপন্থীর বাড়ীতে। সাধনা সঙ্ঘ একটি ছোটখাট লাইব্রেরি, জেল-ফেরত প্রৌঢ়বয়সী আগের যুগের স্বদেশী ডাকাত বিপিন দত্তের বাড়ীতে একটি আলমারি ও একটি বুক শেলফ নিয়ে। তাতে সাজানো থাকে শুধু দর্শন ও যোগসাধনের বই। সঙ্গে গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা, ভূমার বিচার-বিশ্লেষণ, যোগসাধনার লাভালাভ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। বক্তা অধিকাংশ দিন বিপিন, মাঝে মাঝে তার সহযোগী দীনেশ দাশ। নারায়ণ মাঝে মাঝে এখানে আসে। বছর খানেক আগে ছাড়া পেয়ে সে বাড়ীতে অন্তরীণ হয়ে আছে। রসিকের সাইকেল সারাই-এর কারখানা আর বাড়ী তল্লাস করা হল তন্ন তন্ন করে, কানাইকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, মুখ চোখ ফুলিয়ে কানাই ফিরে এল। রাত্রে জ্বর এল হু হু করে। থিয়েটার দেখতে দেখতে উঠে গিয়ে সে বাড়ী ফেরে নি, রাত্রে শুয়েছিল সমরের বাড়িতে। সার্চ করা হল সমরের বাড়ী। তার বাবা দুর্গাপদ আদালতের পেশকার। যাকে তাকে বাড়ীতে আনার জন্য ছেলেকে সে একটা চাপড় মেরে বসল পুলিস বাড়ী ছেড়ে যাওয়ার পর। সমর এক কাপড়ে বেরিয়ে গেল বাড়ী ছেড়ে, দশ বারোদিন পরে খোঁজ পেয়ে দুর্গাপদকেই কলকাতা গিয়ে তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনতে হল

যাকে তাকে বাড়ীতে আনার তার যে পূর্ণ অধিকার আছে এটা পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়ে। অমিতাভ একবার গ্রেপ্তার হল ঘটনার পরদিন দুপুরে। রাত দুপুরে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, এগিয়ে গিয়েছিল জানবাজারের রাস্তা ধরে, সে পথ সোজা গিয়েছে ঘটনাস্থলের দিকে। ডাক্তার এন. রায় চৌধুরী স্বীকার করল যে, মাঝ রাতে অমিতাভ এসেছিল মার কলিকের ব্যথার জন্য তাকে ডাকতে, সে যায় নি, তবে ওষুধ দিয়েছিল আর ব্যবস্থা। দু'দিন পরে ছাড়া পেলে অমিতাভ, আবার গ্রেপ্তার হল তিন দিন পরে কলকাতা যাবার সময় স্টেশনে। হাজত থেকে আবার ছাড়া পেল কিন্তু বঞ্চিত হল ম্যাজিস্ট্রেটের লিখিত হুকুম ছাড়া শহর ছেড়ে যাবার বা সন্ধ্যার পর বাড়ীর বাইরে আসার অধিকার থেকে। নারায়ণের বাড়ী সার্চ করা হল দু'বার, চার-পাঁচবার থানায় গিয়ে তাকে প্রমাণ দিতে হল যে সে বাড়ী ছেড়ে বেরোয় নি ঘটনার রাত্রে, পুলিসের রাত দশটার হাঁকেও সাড়া দিয়েছিল, রাত তিনটের হাঁকেও সাড়া দিয়েছিল। সিদ্দিকের দর্জির দোকানেও একদিন হানা দিল পুলিস, এগার জন সন্দেহজনক লোক এত দর্জি থাকতে শুধু সিদ্দিককে জামা বানাবার অর্ডার দেয় কেন? দোকান ও পিছনে বসবাসের ঘর দু'খানা চার ঘণ্টা ধরে তল্লাস করা হল। রমেশ আর কান্তি প্রায়ই যায় দীপ্তির বাড়ী, দীপ্তি প্রায়ই যায় কালীনাথের কাছে, থার্ড ক্লাসের অতটুকু মেয়ে স্কুলের মেয়েদের সভায় জোরালো বক্তৃতা দেয় স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়ে—হেড মিস্ট্রেস মিসেস তরফদারের কড়া চিঠির জবাবে অবশ্য দীপ্তির বাবা রজনী সিকদার জানিয়েছে, মেয়ে তার ভবিষ্যতে কখনো ওরকম পাগলামি করবে না—তাকেও জেরা করা হল। শহর থেকে বাইরে যাবার পথের মোড়ে মোতায়েন পুলিস তল্লাস করতে লাগল পথিকের মোটঘাট, গাড়ির মালপত্র। স্টেশনে তছনছ করা হতে লাগল যাত্রীর বাক্স পেঁটরা শ্যামলীর গয়নার সন্ধানে।

বেশ একটু দিশেহারা ভাব পুলিসের, যাকে তাকে সন্দেহ করছে, যেখানে সেখানে ঢুঁ মারছে।

তখন কলকাতা থেকে এল স্পেশালিস্ট রায় বাহাদুর এন. এন. ঘোষাল। ঘোলাটে ফরসা মুখে বুদ্ধিজীবী বৈজ্ঞানিকের শান্ত সমাহিত ভাব, চোখে ভাবুক কবির অন্যমনা উদার দৃষ্টি। একটা দিন থেকেই সে কলকাতা ফিরে গেল, বেলা তিনটের গাড়িতে। পরদিন অদৃশ্য হয়ে গেল পথের মোড়ে, স্টেশনে, বাজারে মোতায়েন বাড়তি পুলিস, খানাতল্লাস ও যখন তখন যাকে তাকে টানাটানি ও গ্রেপ্তার প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। শ্যামলীর গয়না ডাকাতি হওয়ার মত তুচ্ছ বিষয় যেন হঠাৎ তুচ্ছই হয়ে গেল পুলিসের কাছে। শুধু বোঝা গেল, নজর কড়া হয়েছে। সাদা পোশাকের ছদ্মবেশী চোখ-কানের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করেছে, কয়েকজনের চলাফেরা গতিবিধি চব্বিশ ঘণ্টা দেখছে চোখগুলি, সবার সঙ্গে মিশে গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে কে কি বলে কানগুলি শুনছে।

কলকাতা ফিরবার দিন সকালে এন. এন. ঘোষাল দেখা করতে এল ভৈরবের সঙ্গে। পিসীর জা-এর মেয়ের জামায়ের মত কোন একটা সম্পর্কে সে ভৈরবের ভগ্নীপতি হয়।

কেমন আছেন রায় বাহাদুর ?

আসুন রায় বাহাদুর।

আত্মীয়তামূলক ভদ্র আলাপ চলে, নিকট ও দূর আত্মীয়কুটুম্বের সংসারে বিবাহ মৃত্যু পাস ফেল চাকরি-বাকরির সংবাদ আদান-প্রদান।

এই ব্যাপারে এসেছেন ? ভৈরব জিজ্ঞেস করে কিছুক্ষণ পরে।

হ্যাঁ, তা ছাড়া কি !

কি যে দাঁড়াচ্ছে ছেলেগুলো আজকাল, ভৈরব আপসোস করে, ধর্ম্ম নেই, নীতিজ্ঞান নেই, অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল, যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। গান্ধীজীর প্রভাবে আর কিছু না হোক, এসব চাপা পড়ে যাবে ভেবেছিলাম, একটু সংযত হবে। এই জন্য চরকায় এত জোর দেন গান্ধীজী, আমার যা মনে হয়। এমনি নিয়ম-নিষ্ঠা তো মানবে না কিছু, তবু নিয়মমত চরকা কাটলে মনটা হয়তো কিছু শান্ত থাকবে। তা, চরকাও ছোঁয় না ছোঁড়াগুলো। আচ্ছা রায় বাহাদুর, একটা কথা মনে হয়। স্বদেশী ছেলের নামে সাধারণ চোর গুণ্ডার কাজ হতে পারে না ?

রিভলবার পাবে কোথা ?

ও, হ্যাঁ, তা বটে, ঠিক কথা, খেয়াল ছিল না। তা, কদ্দিন চলবে এ রকম ?

আর চলবে না। নলিনী একটা গোমুখ্যু। তেমনি মুখ্যু কার্লটন আর আপনাদের নতুন ম্যাজিস্ট্রেট হার্টলি। সবে বিলেত থেকে এসেছে, কিছু জানেও না, বোঝেও না।

ওই সাদা মুখ্যুরাই তো চালাচ্ছে !

তা নয় রায় বাহাদুর, তা নয়। চালাচ্ছি আমরাই, কালা আদমিরা। আমাদেরই ব্রেন, আমাদের ওয়ার্ক, ওরা সেটা শুধু কাজে লাগায়। ওরা স্রেফ ঠুলো জগন্নাথ, আমরাই দড়ি টেনে রথ চালাই।

একটু থেমে ঘোষাল বলে, পাকা নাকি আপনার কাছে থেকে পড়ে ? ওর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শরীর খুব খারাপ দেখলাম। বহুকাল পরে দেখা, কি রকম বদলে গেছে মানুষটা। পাকা কোন্ ক্লাসে পড়ে ?

সেকেণ্ড ক্লাসে। বড় দুরন্ত ছেলে, বড় অবাধ্য। ওরে কাঞ্চা, পাকাবাবু আছে নাকি, ডাক্ তো।

চা মিষ্টির সঙ্গেই প্রায় পাকা আসে। ঘোষাল সস্নেহে বলে, তুমি পাকা ? কত বড় হয়ে গেছ ! আমি তোমার মেসোমশাই হই। তোমায় আগে দেখে-ছিলাম, দাঁড়াও দেখি হিসেব করি। তের না চোদ্দ সালে, বাঁকুড়ায়। তুমি তখন এইটুকু বাচ্চা। আমায় দেখলেই বলতে, মুস্থ, মুস্থ, লজেন ? রোজ পকেটে করে তোমার জন্যে চকোলেট লজেন্স নিয়ে যেতে হত। তোমার মা বলতেন—

মা তো বেঁচে নেই।

চুরমার হয়ে যায় আত্মীয়তা অমায়িকতা স্নেহপ্রীতির সংগঠন, বুঝি বা রবাররধর্মী ভদ্রতাও। এ কি কাণ্ডজ্ঞানহীন ছেলে, এ সময় এমন গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে এভাবে বলে তার মা তো বেঁচে নেই ! তিন বছর আগে তার মা মরেছে এ খবর যেন মানুষটা রাখে না—যে দাবী করছে আত্মীয়তার !

বিব্রত ভৈরব বলে, মেসোমশায়কে প্রণাম করলে না পাকা ?

একটু থতমত খাওয়া ঘোষাল বলে, থাক, থাক। তোমার মার কথা জানি ভাই।

পাকাকে ভাই বলে বসে ঘোষাল, বলে খেয়ালও হয় না, পাতানো মেসো শালী-পুত সম্পর্ক, ভাই বলার সম্পর্ক নয়। অতিরিক্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির রকমই এই, কয়েকটা ফলা চকচকে ধারালো হয়, কয়েকটা মর্চে ধরে মেরে যায় ভোঁতা।

শুভাদি আমায় আচার খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। কি শখ ছিল আচার করার! দিনাজপুরে একবার আমাকে সাতরকম আচার খাইয়েছিলেন, তুমি তখনো জন্মাও নি।

মা তো কখনো বলে নি আপনার কথা?

বলেছে, তুমি ভুলে গেছ।

এতক্ষণে পাকাকে একটু নরম, একটু উৎসাহী মনে হয়।

বলে, মার এগারটা আচারের জার ছিল। শ্মশান থেকে ফিরে আমি সব কটা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিলাম। বলুন না মেসোমশাই, আচারের জার দেখে, কার্পেট দেখে, ফটো দেখে মাকে মনে রাখতে হবে? ও রকম মনে নাই বা রাখলাম!

বোসো পাকা, দাঁড়িয়ে কেন? ঘোষাল তার সঙ্গে সস্নেহে আলাপ করে—এবার গুরুজনের বদলে খানিকটা বন্ধুর মত সস্নেহে।

২

সুধার কাছে সগর্ব্বে বলে পাকা, জানো নতুন মামী, আমি ইচ্ছে করলেই কালীদাকে আচ্ছা জব্দ করতে পারতাম। ঘোষাল মেসোমশায়কে বলে দিলেই হত। নাম কাটার মজা টের পেত কালীদা। ইচ্ছে করে বললাম না।

সুধা চমকে ওঠে, কি বললে না পাকা?

তা শুনে কি করবে তুমি? শোধ নিতে পারতাম, নিলাম না, বাস্।

সুধা হাত চেপে ধরে পাকার, আমায় বলো।

দারুণ বিব্রত হয়ে পড়ে পাকা। এ কি মুশকিল হল? বলবে নতুন মামীকে? না বললে ভয়ানক রাগ করবে নতুন মামী। কিন্তু বললে যদি জানাজানি হয়ে যায়? যে গল্প করার স্বভাব নতুন মামীর!

সাবডেপুটি হলেও লোকে কিছু ভয় করত, শ্রীমন্তও হয়তো বাড়ী মেরামতের অনুরোধটা অমান্য করতে সাহস পেত না, কিন্তু মুন্সেফকে কে মানে, একটা ছেঁচড়া চোরকেও যার পুলিস দিয়ে বেঁধে এনে জেলে দেবার ক্ষমতা নেই ? অথচ সে হাকিম, জোর করে ভাড়া না দিলে বদনাম রটবে যে অমুক হাকিম বাড়ী ভাড়া দেয় না—জজসায়েবের কানে গেলে রাগ করবে, ধমক দেবে। এ এক বড় আপসোস সুরেনের, বড় সে ঈর্ষা করে পুলিসী ফৌজদারী হাকিমদের।

ছাতটা হোগলা দিয়ে ঢেকে সেখানে সকলের পাতা পাতবার ব্যবস্থা। ভিতরের উঠানে ছোট সামিয়ানার নীচে বিয়ের আসর। সামনের অঙ্গনে মস্ত সামিয়ানার তলে বসবার জন্য ফরাস ও চেয়ার। ডে লাইট জ্বলে' আর কারবাইড পুড়ে' দরকারের চেয়ে অনেক বেশি আলোকিত করেছে চারিদিক। যে ঘর আর আনাচ কানাচে এ আলো পড়ছে না সেখানে জ্বলছে সাধারণ লণ্ঠন। শুধু আলোর বাড়াবাড়ি নয়। রাত আটটা নাগাদ বর নিয়ে বরযাত্রীরা এসে হাজির হবার পর কিছু বাজিও পুড়ল, তুবড়ি এবং হাউই। তখন সাধারণ নিমন্ত্রিতেরা অনেকেই এসে গেছে, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শুরু করেছে আসতে। সকলের সঙ্গে কুশ ঘাসের আসনে বসিয়ে পাতায় খাওয়ানোর বদলে এইসব পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত লোকগুলিকে বড় একটা ঘরে ভিন্নভাবে বিশেষভাবে খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছে বটে কিন্তু আসরে বসবার জন্য সাধারণ ভদ্রলোকের নাগালের বাইরে পৃথক কোন রিজার্ভ ব্যবস্থা করা হয় নি। তাদের জন্যও ওই সাধারণ চেয়ার। তবু যেন কি ভাবে সক্রিয় কৌশলে প্রকৃতির কোন্ অলঙ্ঘ্য নিয়মে আপনা থেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসবার একটা নিজস্ব এলাকা সকলের মধ্যে গড়ে উঠছে দেখা যায়। ফরাসে একাকার হয়ে গেছে ছোট-বড় সাধারণ ভদ্রলোক, চেয়ারের সারিগুলির একদিকে খানিকটা মাননীয় ও গণনীয় উকিল ডাক্তার চাকুরেদের মধ্যে পর্য্যন্ত মেশাল পড়েছে সাধারণ ছোট-বড় ভদ্রলোকের, কিন্তু অপর-দিকে শহরের শুধু সেরা ব্যক্তিদের নিছক নির্ভেজাল ঘাঁটি। ঘাঁটি গড়ার কেন্দ্রটা সহজেই লক্ষণীয়, কয়েকজন বড় অফিসার। ওঠাবসা নড়াচড়া হাসিকথা

রকম সকম দেখে মনে হয় ওরাই চুম্বকের মত জমিদার, ব্যবসায়ী, নেতা, কলেজের অধ্যক্ষ, সরকারী উপাধিধারী প্রভৃতিকে কাছে টেনে জড়ো করেছে —খাঁটি চুম্বকের মত ওরাই হল আসল সম্ভ্রান্ত,—লোহার টুকরোর মত অন্যদের মানসম্ভ্রম কেবল ওদের সঙ্গগুণে অর্জন করা।

লগ্ন রাত সাড়ে এগারোটায়।

প্রথম ফাল্গুনে শীতের ছোট দিন কিছু বড় হয়েছে বটে কিন্তু তিন-চার দফায় এতগুলি লোককে খাওয়াতে হলে আটটাই বা কি এমন কম রাত? প্রথম দলকে ভোজনে বসাইতেই হবে শীগগির। তার আয়োজন চলছে ছাতে। একতলায় চলছে বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, অকারণেই নানা ছুতায় উলুধ্বনি উঠছে ঘন ঘন। আসরে চলেছে আসুন বসুন রব তুলে সিগারেট বিতরণের সম্বর্দ্ধনা।

অথচ মেয়ের বাপ সুরেন যেন একেবারেই নিরপেক্ষ। এ যেন তার মেয়ের বিয়ে নয়, তারই পয়সার ঘটা নয়, সে-ই যেন শুধু নগদেই সাড়ে তিন হাজার টাকার পণ দিয়ে কলকাতা কর্পোরেসনের নতুন কাউন্সিলর অঘোরের জীবনের ভরসারূপ পুত্ররত্ন কর্পোরেসনেই সদ্য নিযুক্ত কেরানী রোগা ও কালো শ্রীমান পরিমলকে বাগায় নি মেয়েকে বিলিয়ে দেবার এই উৎসবের জন্য। তাকে কেমন যেন মন-মরা, উদাসীন মনে হয়। জেলা জজ অরবিন্দ-বাবুকে ফাগুনের দখিনা হাওয়ায় দামী শাল উড়িয়ে আসতে দেখেও সে এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানায় না। কাজটা করতে হয় তার দাদা হরেনকে।

অরবিন্দ বলে, সুরেনবাবু—?

জজ হয়েও বোকার মতই বলে। কারণ, দু'জনেই তারা খানিক দূরে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুরেনকে। বাঁশের খুঁটিতে লটকানো ডে-লাইটের নীচে তাদেরই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সুরেন যেন সব ভুলে তন্ময় হয়ে শুনছে তার মেয়ের বিয়ের সানাই। বাড়ীর সদর দরজার ডাইনে রোয়াকে বসে লখীন্দর তান ধরেছে তার নিজস্ব মেশাল পূরবীতে—এ জেলায় লখীন্দর বিখ্যাত সানাইওয়ালা। বিভোর হয়ে বাজাচ্ছে লখীন্দর, ওটা তার স্বভাব। পোঁ-ধরা তাল বাজানেদের নিয়ে সানাই বাজিয়ে মোট পাবে তেরটি টাকা,

পাঁচ বেলা খাওয়া আর একখানি কাপড়, আটহাতি কি বড় জোর ন'হাতি হবে কাপড়খানা জানা কথাই, গামছাও হয়ে দাঁড়াতে পারে শেষ পর্য্যন্ত। তবুও মন দিয়ে সানাই বাজায় লখীন্দর, শুনে মন কেমন করে মানুষের!

মেয়ের বিয়ের ব্যাপার বুঝতেই তো পারেন, হরেন সবিনয়ে জানায়, আসুন, বসুন এসে, সুরেনকে খবর দিচ্ছি। আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন শুনলে—

খানিক এমনি বিভোর আনমনা হয়ে থাকে সুরেন, আবার হঠাৎ সচেতন হয়ে খানিক এদিক ওদিক ছটফট করে বেড়ায়, যাকে সামনে পায় তার সঙ্গেই কথা বলে। বলে যে, সাড়ে এগারটায় লগ্ন, বিয়ে শুরু হতেই বারোটা বাজবে, কি দিয়ে সকলকে সে যে আপ্যায়ন করবে—একটু গান-বাজনার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করে উঠতে পারে নি। তার বিনয়ের জবাবে সকলে বিনয় করে, এটা যে আসলে তার একটা গোপন প্রার্থনা বুঝে উঠতে পারে না। বলে যে, আহা, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিছু ভাববেন না আপনি, এ তো আমাদেরই ঘরের কাজ!—কেউ ভুলেও বলে না তাকে যে, গান-বাজনার ব্যবস্থা নাই বা রইল, আপনিই আমাদের একটু কীর্ত্তন শোনান না সুরেনবাবু? ব'লে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে চেপে ধরে তাকে বাধ্য করে না কীর্ত্তন গেয়ে শোনাতে।

ভৈরব বরং বলে, আরে মশায়, এণ্টারটেনমেণ্টের ব্যবস্থা করেন নি, বেঁচে গেছেন। ওসব কিছু দিলেই ভজঘট বাড়ে। কাজের ভার দিয়েছেন যাকে সে দাঁড়িয়ে গান শুনছে, খেতে বসতে ডাকছেন কেউ উঠছে না, আবার হয়তো এক সঙ্গে সবাই হুড়মুড় করে এসে বসতে চাইছে।

আর একজন বলে, ডান হাতের আয়োজন আছে, আবার কিসের এণ্টারটেনমেণ্ট?

মাঝে মাঝে হরেন এসে তাকে ভৎ র্সনা করে যায়, তুমি করছ কি সুরেন?

আর ক্ষণে ক্ষণে এ এসে ও এসে জানায়, এটা চাই, ওটা হল না, সেটার কি করা যায়!

মেয়ের বিয়ে দেবার শ্রান্তিতে, চারিদিকের এই নীরস বাস্তব ব্যবস্থা আর বেসুরো কলরবের চাপে, উজ্জ্বল আলো আর উলঙ্গ আনন্দের কটুস্বাদে সত্যই ফাঁপর ফাঁপর লাগে সুরেনের। সব বন্ধ করে পালিয়ে যদি যাওয়া যেত দূরে, বহুদূরে, এসব হাঙ্গামার সীমা ছাড়িয়ে, যেখানে শুধু রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিরহের বিচিত্র মধুর রসে মশগুল হয়ে জগৎ-সংসার ভুলে থাকা যায়। পাকা নেশাখোরের যেমন কাজ আর দায়িত্বের ঝঞ্ঝাটে দম আটকে আসে, অভ্যস্ত নেশায় মাত্রা বাড়িয়ে ডুব দিতে প্রাণটা ছটফট করে, সুরেনেরও সেই দশা।

বিয়ের আসরেও দেশের কথা নিয়ে তর্ক বাদ যায় না। অসহযোগ আন্দোলন রাশ টেনে থামিয়ে দেওয়া উচিত হয়েছে কি হয় নি, সেই তর্ক। বয়ন সংঘের ভবতোষ বলে, আর কিছুই করার ছিল না। আন্দোলন বিপথে চলার উপক্রম করলে সেটা বন্ধ করাই নেতাদের কর্ত্তব্য।

অমিতাভ মৃদুস্বরে মন্তব্য করে, আন্দোলন বিপথে যায় কেন!

ভবতোষ বলে, দেশের লোক নিয়ে যায়। সংযম হারায়, নেতাদের কথা শোনে না, উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে।

অমিতাভ বলে, কিম্বা আন্দোলনটাই ভুল পথের বলে দেশের লোক ধৈর্য্য হারায়, নেতাদের কথা শোনে না, নিজেরা আন্দোলন চালাতে চায়?

ভবতোষ বলে, কি যে বলো তুমি অমিত! সাধারণ লোক কত রাজনীতি বোঝে!

অমিতাভ বলে, স্বাধীনতা চাই, এটুকু তো বোঝে? বৃটিশ শাসন ধ্বংস করা চাই, এটুকু তো বোঝে? মুখ বুজে মার খেলে স্বাধীনতা আসে, এ রাজনীতি তারা বুঝতে পারে না, তা ঠিক। কোন দিন বুঝতে পারবেও না। যে মারে তাকে মারতে হয়, এই সোজা সত্যটা তারা বোঝে। চিরকাল তাই বুঝবে।

তোমরাই দেশের শত্রু। বুঝলে অমিত, মাথা-গরম তোমরাই দেশের সর্ব্বনাশ করছ!

কেন? আমরা তো নেতা নই!

আহা, গরম হয়ে লাভ কি? তোমার কথাই ঠিক ভবতোষ। আর কি করার ছিল? ভবতোষকে সমর্থন করে ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, যে-ভাবে যে-পথে যিনি মুভমেণ্ট চালাবেন তিনিই যখন দেখলেন দেশের লোক সে-ভাবে সে-পথে চলছে না, তাঁর নির্দেশ মানছে না, বুঝতেই পারছে না তাঁর কথা, মুভমেণ্ট বন্ধ না করে তিনি করেন কি? তাঁরই মুভমেণ্ট তাঁরই দায়িত্ব, তিনিই সব। চৌরিচৌরার পর আর তিনি পারেন চালাতে?

ডাক্তার রায়চৌধুরীর পরণে ফেনার মতো কোমল আর ধবধবে সাদা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, কাঁধে চাদর, তার তুলনায় বয়ন সঙ্ঘের ভবতোষের জামা-কাপড় অনুজ্জ্বল, কর্কশ ও মোটা।

তাঁরই মুভমেণ্ট, তাঁরই দায়িত্ব, তিনিই সব!

নিশ্চয়! এ বিষয়ে সন্দেহ আছে? বলতে বলতে প্রশান্ত উদ্দীপনার ভাব ফুটেছে ডাক্তার রায়চৌধুরীর মুখে, একটা কথা ভেবেছেন মশায়? গান্ধীজী ছাড়া কারো সাহস হত বলতে, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, এবার বন্ধ কর! মুভমেণ্ট শুরু করতে পারে অনেকে, বন্ধ করতে পারে ক'জন? আমরা তখন ধরতে পারি নি, শুধু উনি একা বুঝেছিলেন মুভমেণ্ট চলতে দিলে কি অবস্থা দাঁড়াত, একা ওঁর সে দূরদৃষ্টি ছিল।

কিসের দূরদৃষ্টি? মুভমেণ্ট আর ওঁর থাকবে না, ওঁর একার দায়িত্ব থাকবে না, উনিই সব থাকবেন না, এই দূরদৃষ্টি?

ভৈরবের মেজ শালা গিরিশ বলে, আমি একটা কথা বুঝে উঠতে পারি না। মুভমেণ্টটা যখন আরম্ভই করলেন, ওঁর কি আগেই জানা উচিত ছিল না এতবড় দেশে ওরকম একটা মুভমেণ্ট চালালে এখানে-ওখানে হাঙ্গামা হবেই?

আহা, অ্যামেচার ক্লাবের অভিনীত স্বদেশী নাটকটির লেখক—উকিল নরেন দস্তিদার বলে, তাই তো উনি খোলাখুলি স্বীকার করলেন ওঁর মস্ত ভুল হয়েছিল। অন্য কেউ এমন সরলভাবে বলত একথা? ওঁর কাছে ছলচাতুরী নেই।

ঠিক কথা, ভবতোষ সায় দেয়, অহিংসা আর সত্যই ওঁর সাধনা। রাজনীতির চেয়ে তা ঢের বড় জিনিস। নইলে দেশশুদ্ধ লোক তাঁকে দেবতার মত পূজা করে?

বাস্, গান্ধীজীকে বুঝে ফেলেছ তো তোমরা? ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, আপনিও বুঝে ফেলেছেন তো ভবতোষবাবু? অতই যদি সোজা হত গান্ধীজীকে বোঝা, তিনি গান্ধীজী হতেন না, আর দশটা পলিটিক্যাল লীডারের মত সাধারণ নেতাই হয়ে থাকতেন। গান্ধীজী কখনো ভুল করেন না। তিনি সব জানেন, সব বোঝেন, ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে আয়নার মত স্বচ্ছ। মুভমেণ্ট শুরু করার আগেই তিনি জানতেন কিছুদিন পরে বন্ধ করে দিতে হবে।

গিরিশ, নরেন ও ভবতোষ তো বটেই, আরও যারা শুনছিল সকলেই অল্প বিস্তর ভড়কে যায়।—কি বললেন কথাটা? গান্ধীজী জানতেন? ফল কিছু হবে না জেনে শুনেই তিনি মুভমেণ্ট শুরু করেছিলেন বলতে চান?

ফল কিছু হবে না মানে? ডাক্তার রায়চৌধুরী প্রশান্ত গম্ভীর মুখে চেপে চেপে বলেন, ওইখানেই ভুল করেন আপনারা। ফল কি হয় নি কিছু? সাড়া কি পড়ে নি দেশে, দেশ কি জাগে নি? ওইটুকুই গান্ধীজী চেয়েছিলেন। তাঁর আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি, আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। দেড়শো বছরের পরাধীন দেশ, হঠাৎ একটা আন্দোলনে একেবারে তার স্বাধীনতা আসে না, দেশকে শুধু জাগাবার জন্তই দু'টো একটা আন্দোলন দরকার হয়। গান্ধীজী তা জানতেন, তাই স্বরাজ আসবে না জেনেও মুভমেণ্ট চালিয়েছেন—স্বরাজ যদি আনতে হয় কোন দিন, এ মুভমেণ্ট করতেই হবে। সেইজন্যই যতদিন মুভমেণ্ট চালানো দরকার চালিয়ে, ঠিক সময়ে বন্ধ করে দিয়েছেন।

আপনার এ ব্যাখ্যা জানিয়েছেন নাকি গান্ধীজীকে? অমিতাভ বলে হাসিমুখে, জানালে খুশি হবেন। আপনার মতে গান্ধীজী চালবাজ, না ডাক্তারবাবু?

নরেনও ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ জানায়, কি বলছেন আপনি ডাক্তারবাবু? উনি মনে মনে এক কথা ভাবেন আর দেশের লোককে অন্য কথা বলেন? আপনাদের মত ভক্তদের জন্যই মুভমেণ্টটা বানচাল হল!

আহা, মাথা গরম করবেন না নরেনবাবু! গিরিশ বলে।

ডাক্তারবাবু জেল খেটেছেন, নাটক লিখে দেশোদ্ধার করেন নি।—বলে ভবতোষ।

আপনার ব্যাখ্যার মানে কিন্তু তাই দাঁড়ায় ডাক্তারবাবু, গান্ধীজী সবাইকে ধাপ্পা দিয়েছেন। অমিতাভ সহজভাবে কথায় কথা বলার মত করে বলে, উনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন ভুল করেছেন, হিমালয় পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড ভুল করেছেন, দেশের লোক তাঁর অহিংস নীতি মানল না। আপনি বলছেন তিনি ভুল করেন নি, তিনি গোড়াতেই জানতেন সবাই পুতুলের মত মার সইবে না, উলটে পুলিসকে মারবে। তা হলে তাঁর মুভমেণ্টটাই ছেলেভুলানো ধাপ্পা দাঁড়ায় না?

চটে আগুন হয়ে ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, তুমি কি বলতে চাও গান্ধীজী দেশকে নিয়ে ছেলেখেলা করছিলেন?

আমি কি পাগল? অমিতাভ হাসিমুখেই জবাব দেয়, গান্ধীজী মহাপুরুষ, নেতা হিসাবে তাঁর তুলনা হয় না, এতে আপনি সন্তুষ্ট নন, তাঁকে অদ্ভুত উদ্ভট কিছু বানাতে চান, তিনি সর্ব্বজ্ঞ দেবতা, মহাঋষি, ম্যাজিসিয়ান, সব কিছু। আমার তাতেই আপত্তি। আপনার ব্যাখ্যা মানতেও আপত্তি হয় না, গান্ধীজীও তাতে ছোট হন না, তাঁকে যদি ধর্ম্মপ্রচারক না করে রাজনৈতিক নেতা বলে ধরেন। আর কিছু হোক বা না হোক, ঘুমন্ত দেশটাকে শুধু জাগাবার জন্যই একটা আন্দোলন দরকার এ বিশ্বাস নিয়ে যদি তিনি আন্দোলন চালিয়ে থাকেন, সে তো ভাল কথা, গৌরবের কথা। তাঁর বিশ্বাস ভুল কি না, সে প্রশ্ন আলাদা। ভাবুন তো তা হলে কত সরল সহজ হয়ে যায় তাঁর অহিংসা, আর সত্য? অহিংসনীতি পরাধীন দেশের শিকল কাটার অস্ত্র, রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি, আর কিছু নয়। বেদান্তের মাপকাঠিতে সত্য হোক বা না হোক, দেশের কোটি কোটি লোকের ভালমন্দের হিসাব কষে যা করা দরকার, যা বলা দরকার, তাই করা আর বলাই সত্য। হিসাব ভুল কি না সে প্রশ্ন অবশ্য আলাদা।

বাস্ হয়ে গেল! বিক্ষুব্ধ ভবতোষ ব্যঙ্গ করে, উনি শুধু রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজির প্রতীক? শুধু পাকা পলিটিসিয়ান? ভারতের যুগযুগান্তের জ্ঞান-কর্ম্মের সাধনা যাঁর মধ্যে মূর্ত্ত হয়েছে, বেশ একটা সার্টিফিকেট তাঁকে দিলে তো অমিত!

কি করব বলুন? অমিতাভ নির্ব্বিবাদে বলে যায়, অমন একটা মানুষের

নামে যা-তা রটাতে ভাল লাগে না। ভারতের যুগযুগান্তের জ্ঞানকর্মের সাধনা তাঁর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে থাকে, তাঁকে শত শত প্রণাম। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, তাহলে রাজনীতি করতে আসেন কেন? চল্লিশ কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে রাজনীতি, সেটা শুধু একটা সাইড লাইন হিসাবে গ্রহণ করেছেন, একথা বললে যে তাঁর মত মহাপুরুষকে অপমান করা হয় ভবতোষবাবু! তা ছাড়া দেখুন, তাঁর নীতি বুঝতে হাবুডুবু খেতে হয়, কূল-কিনারা মেলে না, একেবারে অবতারের লীলাখেলার সামিল করে তাঁর মত আর পথকে সমর্থন করতে হয় ডাক্তারবাবু। মানুষটা দেশের জন্য এত করেছেন এভাবে তাঁকে অপমান করা কি উচিত? তার চেয়ে তিনি যখন রাজনীতি করেন তাঁকে নিছক রাজনৈতিক নেতা বলে ধরে নিলেই গোল থাকে না। আমরা তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর নীতি বিচার করতে পারি, তাঁর পথ ঠিক না ভুল তাই নিয়ে ঝগড়া করতে পারি।

তুমি করবে গান্ধীজীর বিচার! ডাক্তার রায়চৌধুরী বলে, তার চেয়ে সোজাসুজি গালাগালি দাও, তাতে কম অপমান করা হবে।

চটেন কেন? অমিতাভ বলে, স্বাধীনতার লড়াইটা ফাঁসিয়ে দেওয়া, তার লজ্জা আর গায়ের জ্বালাটাও একচেটে করে নেবেন? আমারও হার হয়েছে, আমারও লজ্জা করে, গা জ্বলে।

আশেপাশের ক'জন যারা শুনছিল সশব্দে হেসে ওঠে। ডাক্তার রায়চৌধুরীর নিরুপায়ের আঘাত হেনে আত্মসমর্পণের ঝাঁজ উড়ে যায় সে হাসিতে।

২

এইখানে, চেয়ারের সারির এই সাধারণ প্রান্তে এরকম আলোচনা বা তর্ক বা কথার লড়াই শুধু এইটুকুই চলে, তাও অমিতাভ আলোচনার সূত্রপাতটা ঘটিয়েছিল বলে। ডাক্তার রায়চৌধুরী সদ্য সদ্য গান্ধী আশ্রম ঘুরে এসেছে, সেখানে ইলেকসন সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটা যে সাধারণ বৈঠক হয় সেই কমিটির একজন মেম্বারের সঙ্গে দর্শক হিসাবে—ডাক্তার রায়চৌধুরী

তার ছেলেবেলার বন্ধু। অমিতাভ জানতে চেয়েছিল ভবিষ্যতের ভিত্তিতে আজকের দিনের সমস্যা নিয়ে কি কথাবার্তা হয়েছে, নেতাদের মনোভাব কি— নিছক কৌতূহল নয়, জানবার তাগিদেই জানতে চেয়েছিল। কিন্তু আলোচনা আরম্ভ হতে না হতে ফিরে গেল অতীতের ব্যর্থতার ব্যাখ্যায়, বেশি দূর অতীতে নয়, এই সেদিন আকস্মিক রাশ টানায় গতিশীল জাতীয়তার গাড়িটা যে দুর্ঘটনায় উলটে গেছে। অমিতাভ চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, ব্যাকুল আগ্রহে কান পেতে শোনে কে কি বলছে। বিয়ের আসরের নানাবিধ গান-গল্প হাসি-তামাসা আর ঘরোয়া আলাপের সঙ্গে সঙ্গে না হোক, পাশে পাশে না হোক, ফাঁকে ফাঁকেও কেউ কি সাধারণ দুটো চারটে কথা বলবে না, যে কথা খাঁটি হোক ভেজাল হোক অন্তত দেশের কথা, দশের কথা, বাঁচার কথা? স্বদেশী একটা ডাকাতি যে হয়ে গেল শহরে কদিন আগে, শহর তোলপাড় হল কদিন ধরে, পুলিস তছনছ করল চারিদিক, তা নিয়েও কি দুটো কথা বলাবলি করবে না কেউ? বিয়ের আসরও কি অন্তত কয়েকজনের কাছেও চুলোয় যায় না এই বিবেচনায় যে একজনের মেয়ে বড় হয়েছে বলে তার বিয়ে দেবার সামাজিক বাস্তব প্রয়োজনের কল্যাণে তারা একত্র হয়ে সুযোগ পেয়েছে অজস্র বলাবলির? বেঁচে থাকার সহজ সরল তাগিদও কি এভাবে তালগোল পাকিয়ে তলিয়ে যাওয়া সম্ভব প্রত্যেকের বাঁচার কথা মুলতুবি রাখার অর্থহীন অপরিসীম ব্যাকুলতায়!

আলো জেলে সামিয়ানা টাঙিয়ে আসর সাজিয়ে সানাই বাজিয়ে উলুধ্বনি তুলে সবাই কি জেগে থেকে ঘুমোবে?

বিয়ের আসরে অমিতাভ খুঁজে বেড়ায় পরাধীনতার বেদনার, প্রতিবাদের চিহ্ন: একটুখানি প্রতীক-চিহ্ন, ইঙ্গিত। বিয়ের আসরে কি স্বাধীন হয়ে গেছে ছ-সাত শো লোক সকলেই, বিলাতী বুটের ছ্যাচার জালা মিলিয়ে গেছে?

খালি যে পাক খেয়ে বেড়াচ্ছ অমিত? দেখাচ্ছ নাকি যে খুব খাটছ?

চপলা বলে প্রায় সামনে দাঁড়িয়ে পথরোধ করে। তার দেশি মিলের মিহি থানে প্রায় সাদা সিল্কের জলুস, হাতকাটা সেমিজে সাদা আরও গাঢ়, গায়ের রঙ আশ্চর্য্য রকম ফরসা। পতিহীনতায় তিনি যেন বিশেষভাবে মহীয়সী।

না। দেখছি। দেখে বেড়াচ্ছি।—অমিতাভ বলে।

ফাঁকি দিচ্ছ তো? তা বাবা আমায় একটা কাজ করে দাও। মেয়েটাকে খুঁজে পাচ্ছি না, খোঁজও পাচ্ছি না। বেঁচে আছে, নিরাপদে আছে শুধু এই খবরটা তুমি আমায় এনে দাও।

চপলা নির্ভয় অব্যাকুল শান্ত হাসি হাসে। সে ভুবনের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ, ব-এ পাস, নাম-করা মৃত বৈজ্ঞানিক স্যার রাধাদুলালের স্ত্রী।

আপনি না কথা কইছিলেন ওর সঙ্গে?

তারপর থেকেই তো খুঁজে পাচ্ছি না, একটু থতমত খেয়ে চপলা বলে, কোথায় যে গেল!

অমিতাভ মজা বোধ করে না। দশ মিনিটের অদর্শনে মেয়ের জন্য চপলার ব্যাকুল হবার ভানকেও ভান হতে দেয় না, বলে, ডেকে দিচ্ছি। বইটা পড়েছেন মাসীমা?

কোন্ বইটা বাবা?

মাত্র চার-পাঁচ দিন আগে বাড়ী এসে বইটা পড়তে নিয়েছে, চপলার মনেও নেই।

আইরিশ রিভোলিউসনের সেই বইটা নিয়ে গেলেন না?

ও! প্রতিমা পড়ছে। আমি কি পড়াশোনার সময় পাই?

প্রতিমাকে খোঁজ করতেই পাওয়া যায়।

মা আমাকে খুঁজছে? আশ্চর্য্য হয়ে প্রতিমা অমিতাভের মুখের দিকে কয়েকবার তাকায়, মুখের ভাবের ভাষা পড়বার জন্যই তাকায়, বয়স বেশী না হলেও এ মুখখানা সে অধ্যয়ন করে আসছে অনেক দিন, ভাষাও আয়ত্ত করে ফেলেছে অনেকখানি।

মার শরীর ঠিক আছে তো?

ঠিক থাকবে না কেন?

তাই জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ যদি শরীর খারাপ হয়ে থাকে?

মাদ্রাজী একখানা শাড়ি পড়েছে প্রতিমা, খানিকটা রাজপুতানা ধরনে। বঙ্গে বর্গী নাটকে নিখিল ঘোষালকে যে বেশে মেয়ে সাজতে দেখে তার ঈর্ষা জেগেছিল তারই অনুকরণে।

মাসীমা নীচে আছেন, দেখা করে এসো।

কি আবার দেখা করব!

খুঁজছেন তোমায়।

খুঁজছে না হাতি। এটুকু বুঝতে পার না?—প্রতিমার দাঁতগুলি সুন্দর হাসিটি ভারি মিষ্টি।—সেই কবে এসেছ কলকাতা থেকে, অ্যাদ্দিনে একবার দেখতে এলে না জ্যান্ত আছি না মরে গেছি। মার ভাবনা হবে না?

অমিতাভের নীরবতায় ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে একেবারে মরে যায় প্রতিমার মিষ্টি হাসি।

কি ভাবছ?

কিছু না।

কি ভাবছিলে? বলো আমায় কি ভাবছিলে, বলতে হবে। অমন করে তাকিও না বলছি। কেমন যে কর তুমি!

কি হল তোমার? অমিতাভ বিপন্ন হাসি ফুটিয়ে বলে, রাগছ কেন?

চেপে গেলে তো? বেশ। যা শুরু করেছ, আমি বলে কথা কইলাম, আর কেউ হলে—

উদ্বেগের ব্যাকুলতায়, উদ্বেল অভিমানে, বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করা ভয়ে চপলার মত মুখখানা দেখায় প্রতিমার। না জেনে না বুঝে কিছু যাতে বলে না ফেলে সে সংযম বজায় রাখার চেষ্টাটুকু কষ্টটুকুও অনুভব করা যায়। মায়া বোধ করে অমিতাভ, জোরালো মায়া। হাসি মুখে মিষ্টি কথা বলার দুরন্ত সাধ জাগে। মনে হয়, মেয়েটাকে বড় আঘাত দেবার চরম সঙ্কল্প খাড়া রেখেও বুঝি এখন ওর এইটুকু দুঃখ অভিমান উপেক্ষা করার মত জোর সে খুঁজে পাবে না। তাই, নিজেকে একান্ত নিরুপায় ও অসহায় বোধ করায় অকারণ অর্থহীন কঠোরতার সঙ্গে ধমকের স্বরে বলে, এখানে এখন ঝগড়া কোরো না প্রতিমা।

প্রতিমা যেন ঝগড়া করছে!

তাই প্রতিমার ভয় ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েই আবার বলতে হয়, কাল তোমাদের বাড়ী যাব, কথা আছে।

কি হয়েছে? আবার ধরবে নাকি তোমায়?

না না, তা নয়। বলব'খন কাল।

কখন যাবে?

সকালে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিমা তাকে খুঁজে বার করে।

মা চলে গেছে। আমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসবে।

ভুবন তখনও যায় নি, তার বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও আছে। সে কথা তোলে না অমিতাভ, লাভ কি?

এখনি যাবে?

হ্যাঁ, যাই চল।

এবার সহজভাবে বলে অমিতাভ, সকাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরছে না বুঝি?

না, তা নয়।—একটু ভাবে প্রতিমা, আচ্ছা, বিয়েটা দেখেই যাই। বাড়ী পৌছে দেবে কিন্তু।

বাড়ী পৌছে দেব? বাড়ীতে খেয়ে ফেলবে না?

খেয়ে ফেলুক! দু' চোখ জলে ওঠে প্রতিমার, সুন্দর দু' সারি দাঁত টুক্ করে আওয়াজ তুলে ঠুকে যায়, তুমি আজ আমায় বাড়ী পৌছে দেবে। বল পৌছে দেবে, কথা দাও। নইলে এখানে আমি কেলেঙ্কারি করব।

তবে এখুনি চল।

না। বিয়ে দেখে যাব।

৩

কালীনাথ বলে অমিতাভকে, তুমি যে মুষড়ে গেলে একেবারে? এ তো জানা কথাই, হতাশা থেকে অবসাদ আসবে, প্রতিক্রিয়া আসবে। একটা কথা ভুলো না অমিত, এ কিন্তু একেবারে হাল ছেড়ে দেবার হতাশা নয়, রোগীর মত নির্জীব দুর্ব্বল হবার অবসাদ নয়। মনটা শুধু সবাই গুটিয়ে নিয়েছে, সরিয়ে ফেলেছে। আর কিছুই করার নেই তাই। নেতাদের যেমন ভাব, আমাদেরও তেমনি। স্বাধীনতার কথা, লড়াইয়ের কথা কেউ আলোচনা পর্য্যন্ত করতে

কিন্তু এখন সন্ত সন্ত ধনদাসের বাড়ী থেকে ডেকে এনে তাকে ভোজন করালে নিন্দা হবে বসন্তের! ধনদাসের চেয়ে জাতে বসন্ত উঁচু নয়, তবু!

পাঁচুর কাছে পাকা পরে এ সব জটিল ব্যাখ্যা ও বিবরণ শুনেছিল।

জ্ঞানদাসের সংযমও আছে। পাকার দিকে চেয়ে সে সশব্দে তপ্ত নিশ্বাস ছাড়ে, হঠাৎ কিছু বলে না। দু'ভায়ের ভাব দেখে হাসিটা মিলিয়ে যায় অর্জ্জুনের, তামাসার সুরে কথাও বন্ধ হয়।

অর্জ্জুন বলে, দোমনা ভাব দেখি? ও বুদ্ধি কোরো না বাবু, চাপান দাও, কত্তা নিজে দাঁড়িয়ে মাছ ধরিয়ে পাঠিয়ে দেছেন। শোন বলি কথা, মন করে কি যে সামলে সুমলে চল যদি দু'ভাই, কত্তা আর পিছে লাগবেন না গায়ে পড়ে। কত্তার মন ভাল।

অর্জ্জুন চলে যাবে, জ্ঞানদাস ডেকে বলে, মাছ নিয়ে যা অর্জ্জুন।

ধনদাস বলে, আঃ থাম না। মাছ মোদের নয়। মোদের পাঠায় নি মাছ।

যাকে পাঠিয়েছে সে তবে নিক। যা খুশি করুক নিয়ে!

জ্ঞানদাস গটগট করে বাড়ীর ভেতরে চলে যায়।

অপমান বোধ করে বইকি পাকা। এতটা বাড়াবাড়ি তার ভাল লাগে না। ধনদাস ঠিক কথাই বলে, ভাইটা তার গোঁয়ার। ঘর থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেঁধে মার দিয়ে রক্তপাত করে ছেড়ে দিলেও যার কিছু করার ক্ষমতা নেই, কথায় কথায় তার কেন এত তেজ? মার সয়ে নিঃশব্দে ফিরে এল, মাছ পাঠানোতে তার অপমান হয়েছে!

অর্জ্জুন, মাছটা ফিরে নিয়ে যাও। দাঁড়াও, একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

পাকা লেখে যে সে আজ শহরে ফিরে যাবে না, কাল যাবে, তাই মাছটা রাখল না। আজ ফিরে গেলে মাছটা নিয়ে যেত। বসন্ত মাছ পাঠিয়েছিল শুনে তার মামা খুব খুশি হবে।

পাকা এসব ডিপ্লোমেসী জানে। যতই হোক, ভদ্র ঘরের ছেলে তো।

চিঠি পড়ে একটু ভেবে বসন্ত সঙ্গে সঙ্গে লোক দিয়ে শহরে ভৈরবের বাড়ীর উদ্দেশে মাছটা রওনা করিয়ে দিল।

দুপুরে পাশাপাশি খেতে বসেছে পাঁচু ও পাকা, একটু তফাতে উঁচু হয়ে বসে ধনদাস তাদের খাওয়া দেখছে, জ্ঞানদাস কোথা থেকে এসে কাছের খুঁটিটায় ঠেস দিয়ে বসে। হঠাৎ মুখ তুলে লজ্জিত হাসির সঙ্গে বলে, তুমি কিছু মনে কোরো না পাকাবাবু!

পাকার মনে ছিল না। সে বলে, কিসের?

মাছটা নিয়ে মোর চটা উচিত হয় নি কো। ঘাট মানছি, দোষ-টোষ মনে রেখো নি। যে মোদের পাঁচু, সে তুমি, ঘরের ছেলে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ধনদাসের মুখ, ভাইয়ের দিকে সগর্বে চেয়ে চেয়ে চোখে তার পলক পড়ে না।

পাকা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা কাল তোমায় মেরেছিল কেন?

পাঁচুর কাছে জেনে রেখে ভেবেছিল, জিজ্ঞাসা করতে খেয়াল হয় নি এপর্য্যন্ত।

জ্ঞানদাস মুখ খোলার আগেই তার হয়ে ধনদাস বলে, ভোটাভুটি আসছে না? মোরা পাত্রসা'র জগৎ পাণ্ডাকে ভোট লাগাব ইবারে, তাইতে কত্তার রাগ। ফের, এ গোঁয়ারটা সমিতিতে ঢুকে গেছে বারণ না মেনে, তাতেও রাগ। আগে থেকেও রাগ ছিল। বেগারের ছুতা করে মারলে কাল ছোঁড়াটাকে। তোমাকে বলি, তুমি বামুনের ছেলে, ভদ্দর ঘরের ছেলে তুমি, ও পাপীটা উচ্ছন্ন যাবে। উয়ার গতি নাই। বদ ঘা হয়েছে পায়ে, সর্ব্বাঙ্গ খসে যাবে উয়ার।

ধীর শান্ত ধনদাসের আকস্মিক রূপান্তর চমকে দেয় পাকাকে। তার উগ্র ভঙ্গি, কথার হল্‌কা কল্পনারও অতীত ছিল। তুচ্ছ হয়ে যায় পাকা। তার লজ্জা করে।

আজ সকালেই ভাইকে ধনদাস যা বলেছিল, সেসব কথা মনে পড়ে। হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না, টাকা পয়সারও নয়, বীরত্বেরও নয়। বাঘ মারার কলকাটি না জেনে বাঘ মারতে যাওয়া গোঁয়ার্ত্তুমি।

৬

বিকালে বড় কুয়াতলায় পালাগানের আসরে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হল পাকার, যাকে শুধু সে মনে রাখে নি, জীবনে পরে খুঁজেও ছিল অনেকবার। একদিনের আলাপে চিরদিনের তরে মনে দাগ কেটে রাখার মত মোটেই অসাধারণ নয় চেহারা বা কথাবার্ত্তা মানুষটার। তবে ঠিক এরকম মানুষ পাকা আগে আর দেখে নি। চরিত্রের স্পষ্ট প্রচণ্ড বৈশিষ্ট্য আর চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব ছাড়াও একটা মানুষ যে মনের মধ্যে স্থায়ী আসন দখল করে নিতে পারে চলতি আলাপে মনের মত করে অজানা অভিজ্ঞতার কথা টেনে এনে, তখন এটা পাকার জানা ছিল না। পরে জেনেছিল, বড় হয়ে। শ্যামল জানা ততদিনে মারা গেছে।

শরীরটা ভেঙে গেছে, দেখেই টের পাওয়া যায়। চাষাড়ে চেহারার রোগা খাটো মানুষটা পাশে এসে বসলেও পাকার নজর পড়ত না, কথা যদি সে না বলত নিজে থেকে।

এ অঞ্চলে কেষ্টপালা জনপ্রিয়। কীর্ত্তন জিয়াগান কথকতায় মেশাল দেওয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত, তবে রাধাও নেই, কাঁদুনিও নেই। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পার্থসারথির কাণ্ডকারখানা নিয়ে কাহিনী, গীতার অনেক গূঢ় তত্ত্বকথা পর্য্যন্ত সহজবোধ্য লাগসই এবং স্বস্তিকর গ্রাম্য দর্শনে পরিণত করা হয়েছে কেষ্টপালায়।

আমি মারি আমি রাখি
আমি দুখী আমি সুখী
আমিই নিমিত্ত সখি—

বিষাদিত অর্জ্জুনকে নয়, উত্তরার গর্ভপাতে শোকাতুরা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দেবার ছলে বলা। তা হোক, আসল কথাগুলি এক, বরং চাষাভুষোর ভাষায় বলা হয়েছে বলে মর্ম্মস্পর্শী। কেষ্টপালা যাত্রা নয়, কোন চরিত্রই সেজেগুজে

আসরে নামে না, খালি গায়ে কোমরে উড়ানি বেঁধে একজন প্রধান গায়ক আর তার দুজন সহকারী কথায় গানে পুরাণকে রূপ দিচ্ছে, তবু শুনতে শুনতে একটি চাষী-বৌ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল উত্তরার সর্ব্বনাশে! কে বলবে সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে না শাউড়ী দ্রৌপদী ছেলের বৌ উত্তরাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে অসহ শোকের অতল গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে। চাষী-বৌটির নাকে নোলক, চোখে সুর্ম্মা, কণ্ঠা-ঢাকা আঁটো তেরঙা পিরান। আবার অমন যে তার গভীর বুকফাটা সহানুভূতি উত্তরার জন্য তা জুড়িয়ে এল জীবন ও মরণের বড় মানের কথা শুনতে শুনতে, দেখা গেল গভীর কৌতূহলের সঙ্গে মশগুল হয়ে সে শুনছে সৃষ্টিরহস্যের ব্যাখ্যা!

এসব ভাল লাগে না?

পাকা সংশয় ভরে বলে, মেয়েমানুষের কাছে ফিলজফি আওড়ানো—

ও, মেয়েমানুষের কাছে বলে তোমার আপত্তি! কিন্তু এ তো সে ফিলজফি নয়, অল্পবিদ্যা নিয়ে মুখ্যুকে তাক লাগানো। ওটা আমরা করে থাকি, আমাদের ভদ্রঘরে মেয়েমানুষরা মুখ্যু, আমরা বিদ্বান, আমরা ওটা পারি। এখানে ব্যাপার কি জানো, এসব চাষাভূষো পুরুষগুলোও সমান মুখ্যু!—

এই কথাই যেন শুনতে চাইছিল পাকা। মুখ ঘুরিয়ে সটান মুখোমুখি হল সে। অনেক কালের আত্মীয়ের মত শ্যামল জানা একটু হাসল।

অর্জ্জুন মহাপণ্ডিত, ভগবান আবার এমন পণ্ডিত যে বেদব্যাসও তার কাছে মুখ্যু। অর্জ্জুনের তো কথাই নেই। অর্জ্জুনের কাছে স্বয়ং ভগবান যে ফিলজফি আওড়ালেন সেটা শুধু আমরা একচেটিয়া করে রাখব? এসব মুখ্যু চাষাভুষো মেয়েপুরুষ একটু স্বাদ গন্ধ পাবে না? আমরা তো দেব না, ওরা তাই নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিয়েছে। মেয়েমানুষের কাছে ফিলজফি আওড়ানো নয়, মুখ্যুদের চাহিদা মেটানো—

একথাও যেন শুনতে চেয়েছিল পাকা।

—ফিলজফি দরকার বেঁচে থাকার জন্য। সমাজের যে স্তরে যার বাস সে তেমনি করে ফিলজফিকে ঢেলে গড়ে নেয়। আসল জিনিসটা চাপাই কিন্তু আমরা ওপর থেকে।

পাকা কথা কয় না। একজনের কাছে এত কথা শুনে কথা না কওয়াটা তার স্বভাব নয়।

—এদের ফিলজফি অদৃষ্ট। মেয়েরা যত ছেলে বিয়োয় অর্দ্ধেকের বেশি মরে যায় আঁতুড়ে, নয় তো বড় হয়ে। আকাশের দিকে চেয়ে পুরুষরা জমি চষে, বৃষ্টি না হলে মরবে, বেশি বৃষ্টি হলেও মরবে। এবার দেখছো তো অবস্থাটা? বন্যা ঘায়েল করে দিয়ে গেছে। শুধু এবছর নয়, আর বছরও। বন্যার ধাক্কা সামলে ভাল ফসল ফলাতে একটা বছর বরবাদ যায়।

জীবনে এই বোধ হয় প্রথম পাকা নিজে মুখ না খুলে একজনের কথা শুনে যায়, এই ধরণের কথা! এটা তার খেয়াল হয়েছিল পরে, শহরে ফিরবার পর, এক অবসর-মুহূর্ত্তে।

শ্যামল জানার খড়ের বাড়ী। দুটি ভিটের ঘর বাসের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে, একটি ভিটের ঘর সে সারিয়ে নিয়েছে মোটামুটিভাবে। জীবনযাত্রা তার সহজ অনাড়ম্বর। একা থাকে, নিকট আপনজন বলতে এক ভাই, যে আজ দশ-বারো বছর চাকরি নিয়ে বর্ম্মায় প্রবাসী। মাঝখানে একবার মাত্র দেশে এসেছিল ছুটি নিয়ে, কলকাতায় বাড়ী ভাড়া করে ছিল। পিসী সম্পর্কে পাড়ার এক প্রৌঢ়া বিধবা রেঁধে দিয়ে যায়, নিজেও খায়। শ্যামলের চেয়ে তার নিজের নিরামিষ রান্নাই বোধ হয় বেশি পদের আর বেশি মুখরোচক হয়। শ্যামলের মধ্যাহ্নের ভোজন হল শুধু জলে সিদ্ধ করা কুঁচি করে কাটা একটু তরকারী, ছটাক খানেক ছোট মাছ, দু-তিন চামচ ঘরে পাতা দই আর একেবারে জাউ করে ফোটানো আধমুঠি পুরনো চালের ভাত। রাত্রের ভোজন দুধ আর খই। সন্ধ্যার আগেই পিসীমা ভাগে। এই জেল-খাটা খুনের বাড়ীতে সন্ধ্যার পর একদণ্ড থাকতে তার ভরসা হয় না।

বেঁচে থাকার জন্যই তার এই বিলাসিতা! বঙ্গ-ভঙ্গ যুগের বোমারু দলের বিপ্লবী, বছর কয়েক আগে সরকার সদয় হয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছে—জীবন্মৃত অবস্থায়।

পাকা প্রশ্ন করে, কেন ছাড়ল?

হ্যারিকেনের আলোয় তার পাঁশুটে ঠোঁটের হাসিও যেন ঈষৎ রঙিন মনে হয়ঃ ওরা হিসেব করেছিল, বড় জোর পূরো একটা মাস! ডাক্তার বাজি রেখে বলতে পারত, দু-তিন মাসের বেশি শ্যামল জানা পৃথিবীতে টিকতে পারে না, দু'মাস যদি টেকে তো সেটা হবে জগতের আর একটা পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার! নইলে কখনো ছাড়ে?

শ্যামল একটু থামে। এটা তার স্বভাব।

দেশ জুড়ে আবার যখন নতুন করে শুরু হয়েছে সেই সময়? ইংরেজের হৃদয় নেই, ওরা ড্যামকেয়ার করে সেন্টিমেণ্ট। ওদের মত হিংস্র নেই, ধীর শান্ত হিসেবী হিংস্র। ওদের স্বার্থে ঘা দিয়েছিলাম, তের বছর ধরে আমায় ভেঙে চুরমার করেছে বলেই ওদের প্রতিহিংসা মিটেছে ভাবো? তাই ছেড়েছে আমায়? শ্যামল হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে, যেন সত্যই প্রশ্ন করছে, জবাব চায়।—দু-চার মাসে মরবই না জানলে কখনো ছাড়ত না। মরাই যখন নিশ্চয় বাইরে এসে মরি। উদারতাও দেখানো হবে, বিনা যত্নে বিনা চিকিৎসায় মরলে দেশেও একটা কলঙ্ক হবে।

পাকা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে, শ্যামল যেন তার কথা বলছে। রাজনীতি সে বোঝে না, সম্প্রতি হৃদয় তার পুড়তে আরম্ভ করেছে বৃটিশ-বিদ্বেষে শুধু এই জন্য যে হাজার হাজার মাইল দূরের ছোট একটা দ্বীপের কয়েকটা লোক তার এতবড় দেশের কোটি কোটি মানুষকে শাসন করছে, দু-একদিন নয়, দেড়শো দু'শো বছর ধরে। স্কুলে ইতিহাস পড়ায়, কিন্তু ইতিহাসের এক কণা মানেও সে বোঝে না, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমন থেকে পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল থেকে, যত কিছু ঘটে এসেছে সব তার কাছে উদ্ভট অবিশ্বাস্য মনে হয়। জাহাজে করে একমাস দেড়মাসের পথ যে ছোট্ট দেশ, সেদেশ থেকে এসে সারা দেশটা তারা দখল করল! একদিনে কয়েক ঘণ্টায় যাদের এই সামান্য কয়েকজনকে লোপাট করা যেত, খবর পৌছে আবার জাহাজে করে যাদের সাহায্য আনতে সময় লাগত দু-চার মাস, তারা খেলার ছলে পদানত করল দেশটা! তার মানেই আমরা ছিলাম বুনো অসভ্য, গরু-ছাগলের মত, ইংরেজরা ছিল সভ্য বুদ্ধিমান মানুষ। যাই বলি আর যাই করি এ ছাড়া অন্য মানে হয় না। দু-একটা

রাখাল যেমন গরু-ছাগলের পাল চরায়, দু-একজন ইংরেজ তেমনি আমাদের চরাচ্ছে।—কিন্তু বড় জ্বালা হয়, অপমান বোধ হয় একথা ভাবতে।

অন্য কোন মানে যদি কেউ তাকে বলে দিত! শুধু আমাদের অপদার্থতার জন্য ইংরেজ রাজা হয় নি, সহজে হয় নি—অন্য কারণ ছিল, যোগাযোগ ছিল যে জন্য ইংরেজ শাসন কায়েম করতে পেরেছে, পেরেছে অনেক কষ্টে।

ইংরেজকে উঁচুস্তরের জীব ভাবতে বুক পুড়ে যায় পাকার।

শ্যামল বলে, অনেকের বুক পুড়ে যাচ্ছে ভাই। শুধু আজ নয়, বহুকাল থেকে। ইংরেজ সহজে এদেশে রাজা হয়েছে, গায়ে ফুঁ দিয়ে সহজে রাজত্ব করে এসেছে, এটা মিছে কথা। আমরা মিছে বানানো ইতিহাস পড়ি। সাম্রাজ্য বাগাতে আর সাম্রাজ্য বজায় রাখতে বৃটিশ রাজের কতদিকে কতভাবে কি লড়াই করতে হয়েছে, আজো করতে হচ্ছে, সেটা ছোট হয়ে আছে ইতিহাসে। কিন্তু তাই বলে আমরা যে খুব পিছিয়েছিলাম আর ইংরেজ এগিয়ে গিয়েছিল এ সত্যটা উড়িয়ে দিলে চলবে না ভাই!

কেন, আমাদের ভারতীয় সভ্যতা—

এককালে মহান ছিল। সেই মহত্ত্ব আঁকড়ে থেকে প্রায় অনড় অচল গতিহীন হয়ে পড়েছিল। জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে প্রয়োগে আবিষ্কারে প্রকৃতির সঙ্গে জগৎটা দখল করার তাগিদে ওদেশের সভ্যতায় এসেছিল গতির জোয়ার। তাই সাত সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে এসে এদেশ দখল করতে পেরেছিল। এটা মানতে হবে ভাই, দেশকে ভালবাস বলেই মানতে হবে। আমরা ছোট ছিলাম, আমাদের জীবনে আমাদের সভ্যতায় ভাঁটা এসেছিল। এটা যদি না মানো দেশকে ভালবাসার ঝোঁকে, যদি অপমান বোধ হয় এটা মানতে, তোমার দেশপ্রেম ফাঁকি হয়ে যাবে। জগৎ জুড়ে মানুষ আছে, এসিয়া ইউরোপ আফ্রিকা আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ায়—মানুষের বাঁচা মরার লড়াইটাই আসল কথা, মূল কথা। ভারত বাঁচুক জগৎ চুলোয় যাক, এ কথা যে বলে সে ভারতের শত্রু। সে মানবতার, সে সভ্যতার মানে বোঝে না। কচি শিশু যেমন মায়ের স্তন, মায়ের কোলটাকেই মনে করে জগৎ—সেও তেমনি দেশটাকে মা মনে করে শিশুর মত মা মা করে কেঁদে জগৎ মাৎ করে দিতে

চায়। দেশে দেশে এগিয়ে পিছিয়ে আঁকাবাঁকা পথে সভ্যতা এসেছে, মানুষের শ্রেণীর লড়াই, শ্রেণীর আপস-মিলন ঘাত-প্রতিঘাত, দাসত্ব-প্রভুত্বের ভিত্তিতে। দেশ হিসাবে আমরা পৃথক কিন্তু এ নিয়ম থেকে পৃথক নই।

শ্যামল পাকার অসন্তোষ ভরা মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, পরাধীনতার জ্বালা সয় না, তাই বলে কি যেভাবে হোক এ সত্যটাকেই উড়িয়ে দিতে হবে যে আমরা পরাধীন! পিছিয়ে ছিলাম, অপরিণত ছিলাম, নইলে পরাধীন হব কেন? অতীতের বিচার কর, অতীতকে প্রাণের জ্বালা ভুলবার নেশা কোরো না। তার দরকার কি? ওঠা-নামা এগোনো-পিছানোর জোয়ার-ভাঁটা আজ তো আমাদের পক্ষে! আমরা এগোচ্ছি, আমরা উঠছি, আমরা স্বাধীন হতে চলেছি—সাম্রাজ্যবাদে আজ ভাঁটা শুরু হয়েছে।

বাইরে রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে, গ্রামের রাত্রি। পাকার ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে আটটা। গ্রাম সম্পর্কে যে বুড়ী পিসী শ্যামলের খাবার তৈরি করে দিয়ে যায়, সে একবার ঘরে এসে একটু দাঁড়িয়ে নিজের মনে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায়।

রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছে শুনেছ নিশ্চয়? মস্ত এক সাম্রাজ্য শেষ হল, অসংখ্য মানুষ স্বাধীন হল। নিজের দেশের উপরতলার গোটা কত লোকের শাসনও ওদেশে বরবাদ হয়ে গেছে। সারা দেশটা খাটুয়ে জনসাধারণের। ওরা যে ফিলোজফিটা নিয়েছে তাই কিছু কিছু পড়ছি। বেশিক্ষণ পড়তে পারি না, চোখ কট কট করে, মাথা ঘোরে। শরীরে কিছু আর রাখে নি। আগে একটানা এক পাতাও পড়তে পারতাম না, পাতার মাঝামাঝি ঝাপ্সা হয়ে আসত সব, কপালের এখানটা দপ দপ করত। আজকাল তিন-চার পাতা পড়তে পারি।

পড়েন কেন? এত কষ্ট হয়—

না পড়ে বাঁচতে পারে মানুষ?

পাকা একটানা আট-দশ ঘণ্টা পড়তে পারে। পরীক্ষার দু-তিন সপ্তাহ আগে থেকে সে একরকম দিবারাত্রি পড়ে, দৈনিক ষোল সতের ঘণ্টার কম নয়। একটু শুধু রোগা হয়ে যায়, নিজের সারা বছরের স্বাভাবিক জীবনটা মনে হয়

সাত

১

একদিন হঠাৎ চামারদের বস্তিটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ঘটনাচক্রের কি বিচিত্র গতি! একদিন নদীর ধারে অব্যবহার্য্য পড়ো জমিতে চামড়ার কারখানা বসায়, জঙ্গলে আমবাগানে চামারদের বস্তি গড়ে ওঠায় খুশি হয়ে সীতাপুরের রাজপরিবার ভেবেছিল যে ভগবান সত্যই দয়ালু, শূন্য থেকে এমনি ভাবে কিছু পাইয়ে দেন টানাটানির রাজভাণ্ডারে! ভীমশ্রীতিলকের বড় দরকার ছিল কিছু টাকার, স্থায়ী রোগের মতই ছিল এই দরকারটা, মাঝে মাঝে কঠিন হয়ে উঠত। চামড়ার কোম্পানীর কাছ থেকে টাকাটা পেয়ে ভীমশ্রীতিলক ঝাড়া দেড় ঘণ্টা গৃহ-দেবতার পূজা করেছিল।

সেদিন কে কল্পনা করতে পেরেছিল, লিটন ময়দানের দিকে গড়ে উঠবে শহরের ফ্যাশনেবল কোয়ার্টার, বেড়ে উঠে ছড়িয়ে পড়তে চাইবে, এমন অদ্ভুত অবিশ্বাস্য রকম বেড়ে যাবে জমির চাহিদা আর দাম এবং এমন অভিশাপ হয়ে উঠবে ওই মরা নদীর পোড়ো তীরের চামড়ার কারখানার অস্তিত্ব! দখিনা হাওয়া একটু পশ্চিম ঘেঁষা হলেই এদিকে দুর্গন্ধ যায়, যেদিকে বাড়বার জন্য উদ্যত হয়ে আছে শহরের নতুন ফ্যাশনেবল এলাকা। শুধু এই কারখানাটার জন্য এদিকে ছড়াতে পারছে না নতুন শহর, শত শত বিঘা জমি চড়া দামে বিক্রি হতে পারছে না, নগদ টাকা আসছে না রাজকোষে!

বাবা শালার বুদ্ধি ছিল না মোটে!

জয়শ্রীতিলক বলে। সে-ই এখন রাজা সীতাপুর এস্টেটের।

কোম্পানীর নিরানব্বই বছরের লিজ্!

মোটে একশ' বিঘার লিজ্।

এবং চামড়ার কারখানা খুলবার, চালাবার, বাড়াবার স্পষ্ট ঢালাও অধিকার

সমেত লিজ্। এই একশ' বিঘার আধ মাইলের মধ্যে কোন দিন যে কখনো জমির চাহিদা হবে তাও কল্পনাতীত ছিল এক যুগ অর্থাৎ মোটে বারো বছর আগেও। অমন কত অজস্র জমি, ঢাল, লালমাটির পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদি শত শত বছর ধরে পড়ে আছে।

একশ' বিঘা নয় বরবাদ গেছে জলের দামে। কারখানার গন্ধে আরও হাজার-বারো শ' বিঘা যে স্বপ্নের দামে বিক্রি হবার সম্ভাবনা নিয়েও বিক্রি হচ্ছে না, হবার আশাও নেই, এ জ্বালা কি সয় ?

কারখানার মালিক কানপুরের মহম্মদ আলি আবদুরী ঈষৎ ভুঁড়িযুক্ত রোগা লম্বা পাকা ব্যবসায়ী, ব্যাপারের গতি চেনে। জানে যে তাকে শেষ পর্যন্ত সরাতে হবেই কারখানা, কারণ নতুন যে শহর গড়ে উঠছে তার পিছনে বেশ জোরালো সরকারী সমর্থন আছে, বাড়ী যা হচ্ছে তার প্রায় অর্দ্ধেক বড় বড় সরকারী চাকরের এবং সরকারের পেয়ারের নেতাদের। শেষ পর্যন্ত লিটন টাউনের বিস্তার কোনমতেই ঠেকানো যাবে না। মহম্মদ আলি আবদুরী তাই জানিয়েছে ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনায় হিসাবমত যথোচিত মূল্য পেলে এবং কারখানা সরিয়ে নেবার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেলে উদারভাবে ন্যায্য দাবি ত্যাগ করতে সে রাজী আছে।

সুবিধা পেয়েছে, সে ছাড়বে কেন! এ অন্যায় শুধু যে অসহ্য ঠেকে জয়শ্রীতিলকের তা নয়, বড় বড় সরকারী অফিসার ও নেতাদের পর্য্যন্ত রাগ হয়। আইন যাদের তারাই যে মালিক আইনের—সেটা খানিক জেনেও অতটা স্পষ্ট করে জানত না মহম্মদ আলি আবদুরী।

তিন মাসের চেষ্টায় তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট হার্টলিকে শিকারে নিয়ে যেতে পারল জয়শ্রীতিলক—অর্থাৎ তার এস্টেটী কারবার যারা চালায় তারা। এত সময় লাগল এই জন্য যে আগে থেকে কার্লটনের মন ভিজিয়ে কাজ আদায়ের যথোচিত চেষ্টা হয় নি। অতটা ধরতেই পারে নি কার্লটনকে কেউ। চুপচাপ থাকে, আড়ালে থাকে, নিজে সোজাসুজি ঘা মারার বদলে নলিনীকে দিয়ে বা দেশী কোন অফিসারকে দিয়ে আঘাত হানে,—গোড়ায় সত্যই অতটা বুঝে উঠতে পারে নি সকলে। নিজের ক্ষমতা নিজের হাতে খাটানোর সুখ যে

কেউ কর্ত্তব্যের খাতিরে বাদ দিতে পারে—এটা ক্ষমতা খাটাবার সুখের মত্ততায় খেয়াল হয় নি কারো।

মন্ত্রী নয়, উকিল ব্যারিস্টার নয়, ডবল এম, এ, সেক্রেটারী নয়, এটা প্রথম খেয়াল করল জয়শ্রীতিলকের ভূতপূর্ব্ব গৃহশিক্ষক ইন্দ্র চক্রবর্ত্তী। গৃহশিক্ষক হিসাবে ঢুকে ইন্দ্র নিজেকে স্থাপিত করেছে, ছ-সাত বছর তার কোন আইন-সঙ্গত, স্বীকৃত বা ঘোষিত পদ নেই, তবু সে পিছনে থেকে প্রত্যেক পদস্থ লোকের কাজ খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করে। লোকে, নিন্দুক লোকে, এক অদ্ভুত কাহিনী বলে, কুৎসিত কাহিনী। জয়শ্রীতিলক খুব খাতির করত কিন্তু ভীমশ্রীতিলক লাথি মেরে দূর করে দিয়েছিল ইন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে। অল্পবয়সী অত্যন্ত সুন্দরী একটি বোন ছিল ইন্দ্রের, এখনো আছে। ইতিমধ্যে বিয়েও তার হয়েছে ঘটা করে, কিন্তু স্বামীর খোঁজ কেউ রাখে না। জয়শ্রীতিলক কোন দিন ইন্দ্রকে ত্যাগ করে নি, বাপ মরা মাত্র সগৌরবে ফিরিয়ে এনেছে।

কিন্তু সে যাই হোক, শুধু বোনের রূপ দিয়েই ইন্দ্র যে এতদিন নিজের এই খাতির বজায় রাখতে পারে নি, বিশেষত বড় বড় এত শত্রুর বিরুদ্ধে, তাতে সন্দেহ নেই। একটা মেয়ের রূপ, তা সে রূপ যতই অসাধারণ হোক, এতগুলি বছর কোন রাজার ছেলেকে বাগিয়ে রাখতে পারে না। ইন্দ্রের মাথাটা ধূর্ত্ত বুদ্ধিতে সত্যই অতিশয় শাণিত, তার বাস্তববোধ প্রায় মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের মত।

ঘুষ দিয়ে কাজ আদায়ের কায়দা, সরকারী কর্ত্তাব্যক্তি বাগাবার কৌশল ইত্যাদি অনেক অনেক নিগূঢ় ব্যাপারে তার পরামর্শ ছাড়া জয়শ্রীতিলকের চলে না।

হার্টলিকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না দেখে সবাই যখন চিন্তিত, ইন্দ্র বলল, কার্লটন ব্যাটাকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না। ওর হাতেই সব চাবিকাঠি। হার্টলি নতুন এসেছে, চোখ কান বুজে ওর কথা শুনে চলে। কার্লটনকে ডিঙিয়ে হার্টলিকে ধরা যাবে না।

দেখা গেল তার কথাই ঠিক।

কার্লটনের জন্য শিকারের আয়োজন করে শিকারে যোগ দেবার জন্য হার্টলিকে নিমন্ত্রণ করায় দু'জনকেই পাওয়া গেল।

কার্লটন পাকা শিকারী। পদেও সে হার্টলির চেয়ে অনেক বড়। শিকারের ব্যবস্থাটাও তারই জন্য। কিন্তু—

তবে বাঘের বদলে কার্লটনের হরিণ শিকারের কারণ সেটা নয়। হার্টলির মানটাও তো তাকে বজায় রাখতে হবে!

সারাদিন মহাসমারোহে শিকারের পর আপ্যায়নের মহাসমারোহ। সর্ব্বোত্তম স্কচ হুইস্কি থেকে সর্ব্বোত্তম অনেক কিছু দিয়ে দেবতার পূজা—বরপ্রার্থনায়।

শিকারের এসে হার্টলি দু-দুটো বাঘ মারল। একটা আসল বড় বাঘের ছোট বাচ্চা, আর একটা সদ্য-প্রসবা স্ত্রীজাতীয় চিতাবাঘ, প্রায় পৌনে চার ফিট। এসময় মারতে হলে এরকম বাঘই মারতে হয়।

কার্লটন মারল মোটা দুটো হরিণ। এসময় পাকা শিকারীর পক্ষেও এই খানিক রক্ষিত খানিক অরক্ষিত, খানিক আসল খানিক নকল জঙ্গলে হরিণ শিকার করা বাঘ হাতী কুমীর শিকার করার চেয়ে বাহাদুরির কাজ। কার্লটনের জন্যই পোষা কয়েকটা হরিণ হরিণী মাসখানেক আগে বনে ছেড়ে দিয়ে শিকারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কিন্তু কারখানায় তারা কোন মতেই আগুন লাগাতে পারল না। কারখানার কয়েকটি দালাল শ্রমিককে বাগিয়ে একটা গোল বাধাবার চেষ্টা করে তাদের সঙ্গে নিয়েই কারখানায় আগুন দেবার চেষ্টা হল বাইরের ভাড়াটে লোকদের নিয়ে। কিন্তু দেখা গেল মহম্মদ আলিও কম চালাক নয়।

রাত প্রায় আড়াইটের সময় খুবই ধীর শান্তভাবে কার্লটন চামড়ার কারখানা সম্পর্কে ইন্দ্রকে ব্যবস্থার কথা বলেছিল। না বলে পারে নি, যতই হোক, সেও তো মানুষ!

এদিক থেকে খানিকটা চাপ দিতে হবে।

কি রকম চাপ?

এই কারখানাতে ফাইট হল, ফায়ার টায়ার লেগে গেল, দু-চারটা মার্ডার জখম হল, লাইক দিস। ঠিক আছে?

ইউ আর গ্রেট!

কারখানায় আগুন দেবার ব্যবস্থা করেছিল ইন্দ্র।

কিন্তু দেখা গেল মহম্মদ আলিও কম চালাক নয়। সেও ইতিমধ্যে লিটন-ফণ্ডে আরও এক হাজার টাকা দান করে স্বয়ং কার্লটনের কাছে মজুরদের হাঙ্গামা ও আক্রমণ থেকে কারখানার নিরাপত্তা বিধানের জন্য আবেদন করেছে। কার্লটনের সঙ্গে দেখা করে সে নিজেও অবস্থাটা খুলে জানায়। কারখানা সরিয়ে নেওয়া হবে, অনেক মজুর ছাঁটাই হবে, বস্তি তুলে দেওয়া হবে, এসব গুজব শুনে মজুররা ক্ষেপে উঠেছে। এই সুযোগে ওদের মধ্যে কয়েকজন লোক সরকার-বিরোধী প্রচার শুরু করে দিয়েছে।

কার্লটনের বুক কেঁপে যায়। কী সর্ব্বনাশ! ইন্দ্রকে কারখানায় হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে বলার সময় সে তো তাদের সাবধান করে করে দেয় নি যে, মজুরদের যেন ক্ষেপানো না হয়।

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে কার্লটন বলে, ওসব বাজে গুজব। তোমার কারখানা ঠিক থাকবে। আমি হার্টলিকে চিট্ পাঠাচ্ছি যেন পুলিস দিয়ে তোমার কারখানা প্রোটেক্ট করে।

বলে বেয়ারাকে ডেকে মহম্মদ আলিকে এক কাপ চা এনে দেবার হুকুম দিয়ে বলে, বেশ বেশ। কথাটা হল কি, তুমি নাকি লীগের বিরুদ্ধে যাচ্ছ, কংগ্রেসীদের পক্ষ নিচ্ছ?

ঝুটা বাত।

ঠিক আছে।

মহম্মদ আলকে এভাবে ভজিয়ে কার্লটন সত্য সত্যই হুকুম দিল যে, মহম্মদ আলির কারখানায় পুলিস এবং দরকার হলে মিলিটারী প্রোটেক্‌শনের ব্যবস্থা যেন অবিলম্বে করা হয়।

দালালদের নিয়ে কারখানায় আগুন দেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল ইন্দ্রের পক্ষে।

কার্লটন প্রকারান্তরে বলে পাঠাল যে কারখানার বদলে বস্তিতে আগুন দিলেও আসল কাজ হাসিল হবে।

দুটো জ্যান্ত মানুষ আর কিছু চুরি করা চামড়া পুড়ে উৎকট গন্ধ ছড়াল

অগ্নিকাণ্ডে। শহরে গুজব রটল কাজটা মহম্মদ আলির নিজের। কারণটা মালিক-শ্রমিক বিরোধ নয়, মহম্মদ আলি ওদের মুসলমান করার চেষ্টা করছিল, ওরা রাজী না হওয়ায় আক্রোশে বস্তিতে আগুন দিয়েছে।

যোগাযোগটাই বা কি আশ্চর্য্য! সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখল শহরবাসী—কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছে, সাংঘাতিক দাঙ্গা। মসজিদের সামনে বাজনার ব্যাপার নিয়ে শুরু।

প্রায় চমকের মতই মোচড় খেয়ে সাম্প্রদায়িক আশঙ্কার শিরাটি টন টন করে উঠল শহরের মনে। কোথাও কিছু নেই, আচমকা। এবং অর্থহীন না হলেও উদ্ভট!

ভৈরব যেন ওৎ পেতে ছিল, সখেদে ঘোষণা করল, আমার অস্পৃশ্য হরিজন হিন্দু ভাইগণ—

নিজে তদন্তে এল কার্লটন। মহম্মদ আলিকে জানাল যে ব্যাপার খারাপ দাঁড়িয়েছে, আরও গুরুতর দাঁড়ানোর সম্ভাবনা। কারখানার হরিজনদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য তার জবরদস্তির বিরুদ্ধে আগেও বেসরকারীভাবে নালিশ এসেছে গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকে। রাজা জয়শ্রীতিলক স্বয়ং এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছে।

মহম্মদ আলি বলল, তুমি জানো মিঃ কার্লটন—

জানে বৈকি কার্লটন, মহম্মদ আলি নিজেই তো তাকে জানিয়েছিল। রেভাঃ ষ্টিফেনকে তার কারখানার লোকের কাছে যখন ঘেঁষতে দেবে না বলেছিল, তখন জানিয়েছিল শুধু পাদরী নয়, কোন মৌলবী মোল্লাকেও তার কারখানা বা বস্তির এলাকায় ঢুকতে দেবে না। কাজে সে কি করেছে কে জানে!

মহম্মদ আলি বোকা নয়, সেও তো মানুষ ভাঙিয়ে পয়সা করেছে, আরও পয়সা করার আশা রাখে। সে টের পায় তাকে সরতে হবে কারখানা গুটিয়ে শহরের সম্প্রসারণ ও আধুনিক-করণের খাতিরে এবং আপসে মীমাংসা করতে হবে মূল্যাদি ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে।

কিন্তু এ প্যাঁচ কেন? একখানা চিঠিতে শহর-সম্প্রসারণের প্ল্যানের কথা উল্লেখ করে তার নিঃস্বার্থ সহযোগিতার আবেদন জানালেই সে

ব্যাপার আঁচ করে কারখানা সরাবার আয়োজন করত, সে ক্ষেত্রে এত খাপছাড়া কাণ্ড ফাঁদা কেন? হিন্দুপ্রধান জেলা, শহরে কিছু মুসলমান আছে, বেশির ভাগ যেমন গরীব তেমনি মূর্খ—একটু যারা ভাল অবস্থায় আছে, গুন্‌তি দু-দশজন, তারাও এই গরীব মূর্খ কটার ঘাড় ভেঙে চালায়, অন্য কোন বিত্ত প্রায় নেই। এটা খুব গরম জেলা। নেতারা হরতাল করবার অনুরোধ জানালে লোকেরা সারাদিন সভা করে, শোভাযাত্রা করে, বিলাতী কাপড়ের স্তূপ পোড়ায়, কোর্ট আদালতে আগুন দিতে চায়। চাষারা কথায় কথায় খাজনা বন্ধ করে।

কিন্তু প্যাঁচের মানে কি? কার্লটন কিছু বাগাতে চায়, মোটা কিছু? ওর মেমটা কলকাতায় থাকে, ভীষণ খরচে। ঘর সামলাতে না পেরে মোটারকম কিছু দরকার হয়েছে কার্লটনের? কথাটা জোর পায় না মহম্মদ আলির মনে। ছোকরা ডেভিসের সম্পর্কে এটা ভাবা চলত, সে আচমকা বদলি হয়ে গেছে, ছোকরা হার্টলি এসেছে তার জায়গায়, ব্যক্তিগত অস্থায়ী লাভের হিসাব এদের একজনের কাছেও বড় কথা নয়, এরা স্বদেশপ্রেমিক খাঁটি ইংরেজ, এ তো সম্ভব নয় যে মোটা ঘুষের খাতিরে হাজার হাজার মাইল দূরের ইংলণ্ডের স্বার্থ এরা কেউ ছোট করবে! এমনি যত দাও তত নেবে, হাঁস মুরগি বোতল। কার্লটনের মত লোক বোঝাপড়া করে ঘুষ তো নেবে না সোজাসুজি!

তবু একবার চেষ্টা করে মহম্মদ আলি, জগতে অসম্ভব কি?—মিঃ কার্লটন, তোমার পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক ভাঙাতে নাকি হাঙ্গামা হচ্ছে? কোন্ ব্যাঙ্ক বল তো, তোমার চেক ভাঙাতে হাঙ্গামা করে? এ সব ব্যাপার তুমি বুঝবে না, আমরা বিজনেসম্যান, আমরা বুঝি। বল তো কালকেই টাকাটা ক্যাশ পাঠিয়ে দিচ্ছি, ও চেক আমি ঠিক করে নেব।

পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু কুঁচকে কার্লটন বলে, কিসের চেক?

সুতরাং মহম্মদ আলি বুঝেই উঠতে পারল না কার্লটনের চালটা কি।

সেদিন মঙ্গলবার। পরের রবিবার একটি বিরাট সম্মেলনের আয়োজন প্রায় এক মাস আগে থেকে আরম্ভ হয়েছিল শহরে, একজন ভারতবিখ্যাত

হরিজন-নেতা, সামঞ্জস্যপন্থী ত্রিপুরারি হাড়ি, গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিয়ে আসবেন। এ জেলায় হরিজনেরা সংখ্যায় ভারি। বাংলায় কেন, ভারতেরও কোন জেলায় এত হরিজন নেই। চামার বাগ্দী নমশূদ্রে জেলাটা ঠাসা।

তা সম্মেলনটা হতে পারল না। হিন্দু-মুসলমানের হানাহানির ভয়ে পাঁচজনের একত্র হওয়াই নিষিদ্ধ হয়ে রইল, পাঁচ-সাত হাজার হরিজনের একত্র হওয়ার কথাই ওঠে না। তারা অবশ্য মানুষ নয়, জন নয়, নিছক হরিজন।

২

জরুরী বৈঠক বসে ভৈরবের বাড়িতে। অনেক আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে হঠাৎ সরকারের এ উগ্রতার মাথামুণ্ডু তাদের কারো মাথায় ঢুকছে না, অনন্তকে ডেকে শোনা উচিত সে কি বলে।

উগ্রতা? পাকা ভাবে। মনের ধাঁচটা তার সাধারণ মানুষের। সঙিনের খোঁচা আর রেগুলেশন লাঠির পিটুনি আর মাঝে মাঝে উৎসবের মত গুলি বর্ষণ যার রীতিনীতি, এ তার কিসের উগ্রতা! ধীর শান্ত পরিণত মনগুলির চিন্তা করার রকমসকম ধরা গেল না মোটেই, বোঝা গেল না পরিস্থিতিটা কি! পোড়া বস্তির চামারদের সম্পর্কে কথা উঠল না একবারও। দাঙ্গা হতে পারে কি পারে না তা নিয়ে মাথা ঘামালো না কেউ। শুধু আগামী নির্বাচন সম্পর্কে উদ্বেগ, আশঙ্কা, অস্বস্তি!

আর মৃত নেতার জন্য আপসোস—আন্তরিক আপসোস। আন্তরিকতার কারণটা যাই হোক। আজ যদি সে সব মানুষ থাকত—কত সহজ হত নির্বাচন-তরঙ্গ উতরানো। দেশে সাড়া নেই, চারিদিকে চাপা বিরক্তি, অবিশ্বাস। বুকে কেউ জোর পাচ্ছে না। আর খুঁটির জোর হারিয়ে সরকারের প্রত্যেকটি চাল শঙ্কিত করছে।

দেশবন্ধুকে স্মরণ করে সখেদে বলে, আজ যদি বেঁচে থাকতেন!

অনন্তেরও এই একটা বিশেষত্ব ছিল—এখনো আছে কি-না পাকা জানে না—জীবিত অপেক্ষা মৃত নেতাদের মত ও পথ এবং মহত্ত্ব সম্পর্কে তার উচ্ছ্বসিত ভক্তি। দেশবন্ধু সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি, কারণ অতি-সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন। সভাসমিতিতে এমন ভাবে স্বর্গীয় নেতাদের কথা অনন্ত বক্তৃতায় টেনে আনে যে মনে হয় অন্তরালে থেকে তাঁরা প্রত্যেকটি কথা সমর্থন করছেন।

পাকাকে অনন্ত গত আন্দোলনের কাহিনী শোনাত, মৃত নেতাদের তেজবীর্য বীরত্ব মহত্ত্বের রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিত। পাকা শুনত মুগ্ধ হয়ে, চোখ তার জ্বলে উঠত স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের প্রেরণায়।

এটা পছন্দ হত না সুধার। অনন্তের দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলত :

নমস্য ছিলেন, বাস্, তার বেশি আমাদের দরকার নেই। তুমি পড়াশোনা করবে, শান্ত হবে, কথা দিয়ে এনেছি কিন্তু পাকা তোমায়—আমার মুখ রাখতে হবে কিন্তু।

তীব্র বিতৃষ্ণা বোধ করত পাকা। ইচ্ছা হত মারতে—নতুন মামীকে মারতে!

সুধা বোধ হয় টের পেত তার মনের ভাব, তাই অনেক রাতে তার মনটা বদলাতে আসত। পাকার ঘরে পড়ার টেবিল, বইয়ের সেল্ফ, বিছানা—যত দামী, যত সংক্ষিপ্ত, যত বেশি ঝকঝকে তকতকে করা সম্ভব সুধা তা করেছে। পাকা আরামে পড়বে, আরামে ঘুমাবে, তার বেশি আর কিছু যে সুধা চায় না ঘরটা যেন তারই সুস্পষ্ট ঘোষণা। আলো জ্বালিয়ে পাকা আধ ঘণ্টা পড়ত পড়ার বই—তারপর নিষিদ্ধ বই। সুধা তা জানত।

ঘরে এসে চেয়ারের পিছন থেকে তার গলা জড়িয়ে মাথায় গাল রেখে বলত, তাকে নিয়ে আমি কি করি বল্ তো!

পাকার মনে হত, এ আক্রমণ, অন্যায় আক্রমণ। তার প্রতিরোধ করা উচিত, অপমান করা উচিত নতুন মামীকে। কিন্তু ছেলেমানুষ মনটা তার দেখতে দেখতে গলে যেত, তথাকথিত আক্রমণে যেমন ঘৃতকুম্ভ গলে যায়।

নতুন মামীর গায়ের গন্ধ তখন মিষ্টি ছিল। স্নো পাউডার ঘামের একটা অদ্ভুত মেশাল গন্ধ।

এবার শোও।

শুই।

বাথরুম ঘুরে এসে এক গ্লাস জল খেয়ে কাপড় ছেড়ে পায়জামা পরে পাকা বসত খাটের বিছানায় পা ঝুলিয়ে। পাশে বসত সুধা।

মন কেমন করছে ?

হুঁ।

সুধার বুকে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসত পাকা। এক হাতে তাকে বুকে চেপে আর এক হাতে সুধা তার ঘাড়ের ঘামাচি মারত, মাথা তোকিয়ে দিত।

তাকে শুইয়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে সুধা চলে গেলে আবার যেন ছায়ার মত কারা সব ভেসে আসত তার আধঘুমের ছন্নছাড়া জগতে, ভাষায় ছন্দে নাচত। মারো কাটো, ফাঁসি লটকাও, বিদায় দে মা ঘুরে আসি, বানচাল কর, ফাঁকি ওড়াও, ধর্ম্মঘট কর!

মহম্মদ আলি হঠাৎ আসে ভৈরবের বাড়ীতে—রাত এগারটার সময়। দিনের আলোয় আসতে সে সাহস পায় নি, বেশি রাতে গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে এসেছে। উকিল রহমান আর শিক্ষক জামান খান আজ সন্ধ্যায় মহম্মদ আলির কাছে এসেছিল। শহরের মুসলমানরা আক্রমণের আশঙ্কায় উত্তেজিত হয়ে আছে। মহম্মদ আলির কারখানায় আক্রমণ হতে পারে, তার বাড়ীতেও—হিন্দু এলাকায় মস্ত একটা বাড়ী ভাড়া নিয়ে মহম্মদ আলি বাস করে।

ভৈরব এটা প্রত্যাশা করে নি যে হাঙ্গামার রাশ আলগা হয়ে যাচ্ছে বলে, মজুর ক্ষেপে উঠছে বলে, মহম্মদ আলি যেচে তার বাড়ীতে আসবে। মজুর ক্ষেপলে অবশ্য তাদের দু'জনেরি বিপদ—কিন্তু কার্লটনের কাছে না গিয়ে সোজাসুজি তার কাছে মহম্মদ আলির পরামর্শ করতে আসা কল্পনাতীত ছিল ভৈরবের। সে তাই খুব সাবধানে কথা কয়।

শুধু যে হিন্দুরা আক্রমণ করতে পারে তা নয়, তার চেয়ে বেশি ভয় কারখানার চামারদের হানা দেবার। তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, তাদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ, তারা প্রায় ক্ষেপে আছে।

ক্ষেপাচ্ছে ভুবন, সামনে রেখেছে বিশ্বম্ভর নাথকে।

ওই বিশুকে?—ভৈরব হাসে।

জোর চালিয়েছে মোশা। ফুলিশ বটে লোকটা, একদম গাধাকা মাফিক ফুলিশ, বাট তাগদ আছে।

শ' পাঁচেক দিয়ে দিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

পাঁচ শো কেন আরও বেশি দিতে মহম্মদ আলি রাজী, কিন্তু ডেকে পাঠালেও এবার বিশ্বম্ভর আসে নি। গতবার আর একটা হাঙ্গামার সময় ডেকে পাঠানো মাত্র বিশ্বম্ভর হাজির হয়েছিল, অল্পেই মিটে গিয়েছিল হাঙ্গামা। এবার তার কি হয়েছে কে জানে!

ভুবন এবার পেছনে আছে।

হাঁ, ঠিক।

ভৈরব পুলিস প্রোটেক্শনের কথা উল্লেখ করতে কানপুরের মহম্মদ আলি আবছুরি মুখ বাঁকিয়ে ঘরেই থুক্ করে থুতু ফেলতে গিয়ে সামলে নিয়ে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে থুতু ফেলে আসে।

শালা পুলিসকা বাত বোলবেন না মোশা!

মহম্মদ আলি চিঠি পাঠিয়েছিল সকাল এগারটা নাগাদ। কোন সাড়া শব্দ মেলে নি। না আসে জবাব, না আসে পুলিশ। বেলা তিনটেয় এল—লিটন মেমোরিয়েল ফাণ্ডের চাঁদার খাতা, পাঁচ হাজারের অঙ্কপাত করা আছে, রসিদও কাটা আছে, সম্পাদক কার্লটনের নামে। এ শহরের পুরানো শহীদ ম্যাজিস্ট্রেট লিটনের নামে বিরাট ময়দানটির নামকরণ করা হয়েছিল, সেখানে লিটন টাউনের পত্তন হয়েছিল, তাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছিল তখন। আবার নতুন করে সাদা সরকারী কর্ম্মচারীর ওপর সন্ত্রাসবাদীদের হানা শুরু হওয়ার পর শহরের বুকে বিরাট সুদৃশ্য এক স্মৃতিসৌধ স্থাপনের জিদ জেগেছে নতুন করে—বিশেষভাবে কার্লটনের।

কলকাতার মনুমেণ্ট নয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের অনুকরণে লিটন মেমোরিয়েল সৌধ গড়ার পরিকল্পনা আছে—যদিও অনেক ছোট স্কেলে।

এদের হয়ে এসেছে মোশা। আগে নেভার এইসান পাগলামি করত। আগে হলে মোকে ডেকে নিয়ে একঠো খানা খাইয়ে দিত, হাসিখুশিসে বলত যে মহম্মদ আলি আবদুরি, লিটন সা'ব কো মেমোরিয়াল ফণ্ডমে পাঁচ হাজার রুপেয়া নেই দিয়া? আজকে শালা লোককো মাথা বিগড়ে গেছে মোশা।

কার্লটন বাড়াবাড়ি করছে।—ভৈরব বলে চিন্তিত ভাবে, খুব মদ খাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। মেমটা এসে থাকলে ভাল হত। সে মাগীটার আবার কলকাতায় হৈ চৈ না করলে দিন কাটে না। এদেশে ইংরেজগুলো, জানো মিস্টার আবদুরি, মেমগুলোর জন্য এমনি খ্যাপাটে বনে যায়।

আবদুরি একগাল হাসে।

ভৈরব সংশয় ভরে প্রশ্ন করে, এসব দিকে খেয়াল নেই, না? কার্লটনের?

আবদুরি মাথা নাড়ে। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প শোনায় ভৈরবকে। খাদ্য ও মদ্যের মত একটি সুন্দরী মেয়েকে ভেট দিতে চেষ্টা করার গল্প—রাজা জয়শ্রীতিলক সে চেষ্টায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিল। কার্লটন আর সব নিয়েছিল, মেয়েটিকে গ্রহণ করে নি।

যাই হোক, ভৈরব বলে, অনন্তর একবার আসা দরকার। কাল সকালেই টেলিগ্রাম করব ভাবছি।

হাঁ, হাঁ, আবদুরি উৎসাহিত হয়ে ওঠে, অনন্তবাবুকো লে আইয়ে। আপনাকে মোশা সচ বাত বলি, বংগালী আদমি বহুৎ ইয়ে হ্যায়, লেকিন অনন্তবাবু—

বাঙালীর অপমানটা খেয়াল যেন হয় না ভৈরবের, অনন্তের প্রশংসা তার ভাল লাগে। অনন্ত তাকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান করে দেবে। অনন্তের সাহায্যে সে মালসীও হতে পারবে হয়তো।

কিন্তু অনন্তও যেন আজকাল কেমন এক উদ্ভট বাঙালী-প্রীতি আমদানি করছে তার কথায় ব্যবহারে কাজে। বাংলা দেশ আর বাঙালীকে সে যথেচ্ছ গালাগালি দেয় তার প্রত্যেক বক্তৃতায়, কিন্তু অবাঙালী কেউ বাঙালীর বিরুদ্ধে

কথা বললেই সে যেন ক্ষেপে যায়। একেবারে উল্টো সুর গাইতে আরম্ভ করে। বাংলা ভারতের মস্তিষ্ক, বাংলা ভারতের হৃৎস্পন্দন। বাংলা যা করে আর ভাবে ভারত তাই করে আর ভাবে। বাঙালীর তুলনা নেই!

একজন অবাঙালী উগ্র হিন্দু, তার নাম মোহন দাস, চরকা কেটে আর জেল খেটে চল্লিশ বছর বয়সে সে প্রায় আশী বছরের স্থাণুত্ব পেয়েছে, বলেছিল, পলাশী বংলামে থা, পহেলে বংলা বুট জুতামে পালিশ লাগায়া!

অনন্ত রেগে টং হয়ে গিয়েছিল।

অকালবৃদ্ধ মোহন দাস আবার বলেছিল, বংগালীকো বহুৎ বেশি মা-বোহিন ছিন লেকে নিকা করতা নবাব আউর চাষী। রাজা মহারাজাকো বংগালী ভেট্ দেতা মা-বহিন, দু-চার রুপেয়া মিল যাতা মুফতমে!

অনন্ত ক্ষেপে গিয়েছিল। মোহন দাস নীরব হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য, —চিতায় না কবরে কেউ তা জানে না। ক্ষমতা আছে অনন্তের। সে তাকে চেয়ারম্যান অনায়াসে বানিয়ে দেবে। মালসীও হয়তো বানিয়ে দেবে অনায়াসেই।

৩

পূব আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের সঞ্চার, জমজমাট গুমোট, মাঝে মাঝে আকাশে দিক্ কাঁপানো গর্জ্জন। আজ অপরাহ্নেও বুঝি বৈশাখের ঝড়-বাদলের দাপট। তা, জোরালো বাতাস উঠে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল এত মেঘ আর এত আয়োজন, বৃষ্টিহীন শুকনো ঝড়ে মিনিট পনের শাখা পাতা ঝাপ্টালো গাছগুলি, তারপর ডুবন্ত সূর্য্যের রঙিন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল আকাশ। যাক্ গে। কাল মাঝরাতে তো কালবোশেখী এসেছিল চৈতের দারুণ খরার পর পরিপূর্ণরূপে, কুঁড়ের চাল উড়িয়ে নিয়েছে, গাছপালা উপড়ে ফেলেছে, ঝাড়া তিন ঘণ্টা চালিয়েছে বর্ষার ঝাপ্টা।

আগের রাতে যদি আসত এই ঝড়-বাদল। একদিন পরে যদি আগুন লাগত চামারদের বস্তিতে। বৃষ্টিতে নিভে যেত, গলে যেত সেই অপবিত্র আগুন।

রং চাপালে, আগ দিলে !—বুড়ো নাত্তির উদ্দাম রূপ বেপরোয়া বিষম মূর্ত্তি !

ইংরেজ রাণীর আইন চালু, খেটে খাই না কি চুরি করি, মাগো রাণি !—ই কাম কি বজ্জাতি ? মার ই ইয়া-কে, মার ! মার ! মার ! রং চাপালে, আগ দিলে !

গিধর পুড়ে মরেছে, কারকির পুরুষ। আর নবাগত একটি যোয়ান ছোকরা, কানাইয়ার বৌ কাতার মামা, বাঙকা। বেখরচায় পেয়ে দু'জনে বেহিসেবী চোলাই খেয়ে কাৎ হয়েছিল সবার আগে, তাতে ওদের ওপর গভীর অবজ্ঞা জন্মেছিল অন্য সকলের—আধচেনা বাইরের একজন গুপ্তধন পাওয়ার খুশিতে উৎসব করার জন্য চোলাই খাওয়ার ঢালাও আয়োজন করছে বলেই এমন ধৈর্য হারিয়ে খেতে হবে—রাম রাম ! ধিক্ ! অবজ্ঞা ভরে কয়েকজন মিলে সাপটে তুলে তাদের আবর্জ্জনার মতই শুইয়ে রেখে দিয়ে এসেছিল সমরুর পরিত্যক্ত কুঁড়েটার ভেতরের আবর্জ্জনার মধ্যে। তার অনেক পরে মাঝরাত্রি। তখন অনেকের প্রায় ওদের মতই অবস্থা, বাকিদের কাছাকাছি। এ সময় হঠাৎ আট-দশটা ঘর জ্বলে উঠলে কারো কি অত খেয়াল থাকে যে বেখরচা নেশায় ওই মর মর অবস্থাতেও মা ভোলে নি তার বাচ্চাকে ঘর থেকে তুলে আনতে, বাপ ভোলে নি চোখের সামনে অচেতন ছেলেকে হেঁচড়ে টেনে তফাতে নিয়ে যেতে, বৌ ভোলে নি পুরুষটার প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজন, এক ঘণ্টা আগে যে নেশার ঝোঁকে তাকে খুন করতে চেয়েছিল, পিঁড়া-কাঠটা তুলে এক ঘায়ে দাঁত ভেঙে রক্ত ঝরিয়েছিল। প্রত্যেকে বিষে মর মর, তবু তারা নিজেকে বাঁচাতে ছুটে পালায় নি, সকলকে আগুন থেকে বাঁচিয়েছে—সকলকে ! আগুনকেও গ্রাহ্য করে নি। চৈতের খরায় শুকনো চালা দাউ দাউ করে জ্বলছে, পাঁচ-সাত হাতের মধ্যে গেলে আঁচে গা যেন ঝলসে যায়, তবু তাও অগ্রাহ্য করে কারকি শেষ মুহূর্ত্তে ছুটে গিয়ে ওনার এগার বছরের হাবা ছেলেটাকে বার করে এনেছিল। চুল ঝলসে গিয়েছে কারকির। অথচ, খানিক আগেও কারকি টলছিল। কারো যদি একবার খেয়ালও হত যে ওই ভূতুড়ে চালাটায় দুটো মানুষ অচেতন হয়ে পড়ে আছে, টেনে না আনলে পুড়ে মরবে !

অন্ত চালা হলেও হয়তো তাদের খেয়াল হত। সমরুর চালার ব্যাপারটা আলাদা। সব চালাতেই মাথা গুঁজে থাকে একজন, তার সঙ্গিনী এবং হয়তো বা ছেলেমেয়ে। সে চলে যায়, সে মরে যায়। আর একজন এসে মাথা গোঁজে সে চালাতে। সমরুর চালাটা ছিল অন্যরকম। ভূতপ্রেতের সঙ্গে কারবার ছিল সমরুর। সে নিজে স্বীকার করত, গর্ব্ব করত, বক্ বক্ করত, ওষুধ দিত, ধুঁকত আর ষোয়ান কচি মেয়েদের বলত তার রঙিন কাঁচের পুঁতি কোথায় বাঁধতে হবে, শিকড়গুলি বেঁটে কখন কি ভাবে খেতে হবে, তার প্রলেপ লাগাবার কায়দা কি।

সমরু মরার পর ও চালায় কেউ থাকে নি। সমরুর কুকুর বাচ্চা বিইয়েছিল, একটাও বাঁচে নি, মরেছে নয় শিয়ালের পেটে গেছে।

কে খেয়াল রেখেছে ওই চালাতেই দু'জন নেশায় বেহুঁস মানুষকে তারা শুইয়ে রেখেছিল নেশার ঝোঁকে!

জবর নেশা হয়েছে আজ, খাপছাড়া অদ্ভুত নেশা! এমন নেশা তারা কদাচিৎ পায়।

যে এনেছিল এ নেশা, বন্ধু ভাবে প্রিয় ভাবে আত্মীয় ভাবে, সে গেল কোথা? এ আগুনে তাকে যদি তারা পুড়িয়ে মারতে পারত—পোড়া বাঁশের জলন্ত ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চালার আগুনে শিকায় সেঁকার মত উল্টেপাল্টে মারতে পারত!

কারো বুঝতে বাকি নেই যে গুপ্তধন পাবার কাহিনী মিথ্যা, বস্তিতে আগুন দেবার সুবিধার জন্য তাদের নেশায় মাতিয়ে রাখতেই লোকটা এসেছিল বন্ধু সেজে। তাদের নিজের জাতের লোক—দালাল। ঘৃণা উথলে ওঠে সবার বুকে, রাগে সর্ব্বাঙ্গ জলে যায়।

কারখানা বন্ধ। এদিক-ওদিক ছড়ানো ছোট ছোট বস্তির চামাররাও এসে আমবাগানের ছায়ায় জড়ো হয়েছে।

শহরের ধাঙড় ঝাড়ুদাররাও এসেছে ঝেঁটিয়ে। এদিকে ভুবনের প্রতিভা আছে, হাঙ্গামা ফেনিয়ে তুলতে সে ওস্তাদ, সুযোগ একটা পেলেই হ'ল, কোন একটা ছুতো। ক্লাবের লাইব্রেরিয়ান রাখালের সঙ্গে পাকার সামান্য বিবাদকে

উপলক্ষ্য করে সে শহর তোলপাড় করেছিল, শহরের গণ্যমান্যদের ডেকে ভৈরবকে অপদস্থ করার জন্য। তবে সে শুধু বাধায় নিছক হাঙ্গামা, নিজের বাঁকা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, এই যা বিপদ। নতুবা অর্থ প্রতিপত্তি জনপ্রিয়তা ক্ষমতা সব দিক দিয়ে ভৈরবের চেয়ে অনেক ছোট হলেও খেটে খুটে কৌশল বিস্তার করে সংঘাত সৃষ্টির শক্তিতে সে ভৈরবকে হার মানাতে পারে।

বিশ্বম্ভরকে পেয়ে তার বিশেষ সুবিধা হয়েছে। জেলায় হরিজন আন্দোলন গড়বার চেষ্টা সে করছে অনেক কাল থেকে—প্রথমে কংগ্রেসের মধ্যে ঢুকে আন্দোলন গড়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল কিন্তু মতবিরোধের ফলে আমল পায় নি।

ভুবনের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। পোশাকে চেহারায় মানুষটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁটেল মাটির কাদার মত মোলায়েম মেটে রঙ, বেঁটে আঁটো চেহারা, কদমছাঁটা শক্ত চুল, নিকেলের চশমা।

গত রাত্রের বর্ষণে ভেজা পোড়া বস্তি থেকে উঠছে অল্প অল্প ধোঁয়া আর বাষ্প। ক্রুদ্ধ অশান্ত স্ত্রী-পুরুষ, কিন্তু কি করা উচিত জানা না থাকায় একটু বিমূঢ়। বিশ্বম্ভর বিষোদ্গার করে চলেছে উগ্র উদাত্ত কণ্ঠে ঃ ভুলো না তোমরা হিন্দু। হিন্দুর স্বার্থ তোমাদের স্বার্থ, হিন্দুর ভবিষ্যৎ তোমাদের ভবিষ্যৎ। কংগ্রেস মুসলমানের খাতিরে তোমাদের জবাই হতে দেবে—দ্বিধা করবে না। কি দিয়েছে কংগ্রেস তোমাদের? কতটুকু করেছে তোমাদের জন্য? কংগ্রেস বর্ণহিন্দুর স্বার্থ ছাখে, বড়লোকের স্বার্থ ছাখে, তোমরা মরবে কি বাঁচবে কংগ্রেস ভাবে না। ভুলো না তোমরা হিন্দু···

সত্য মিথ্যা আবেগ উন্মাদনা ইত্যাদির এই খিচুড়ি ভাষণে উত্তেজনা বাড়ে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট রূপ পায় না। কারণ বুদ্ধির যত দৈন্য থাক্, বাস্তববোধ তাদের খাঁটি ও শক্ত। কারখানার মালিক হিসাবে নয়, মুসলমান মালিক হিসাবে, অবাঙালী মুসলমান হিসাবে, মহম্মদ আলি তাদের আঘাত হেনেছে—ভুললে চলবে না তারা হিন্দু। কংগ্রেসী বড় বড় হিন্দুর সঙ্গে তার দহরম মহরম, ভৈরবের সঙ্গে তার গোপন বোঝাপড়া—গরীব অস্পৃশ্য হিন্দু তারা—তাদের ঘা দিতে, ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে তার সাহস হয়। কেন এ স্পর্দ্ধা? সে জানে কংগ্রেস তার পক্ষে। কংগ্রেসে যে বড় বড় হিন্দু নামধারী পাণ্ডা আছে,

তাদের এই শহরেও আছে, তারা কথাটি বলবে না অস্পৃশ্য হিন্দুদের ওপর এই অত্যাচারের প্রতিবাদে, চুপচাপ হজম করে যাবে।...এমন করে বললে বক্তব্যটা শিশুও বুঝতে পারে। কিন্তু সকলের ঠেকছে অন্য জায়গায়। মহম্মদ আলিই যে তাদের বস্তিতে আগুন দিয়েছে এই মূল কথাটাতেই তাদের সন্দেহ আছে। এ সময় এ ভাবে বস্তিতে আগুন দেবার কোন মানেই হয় না মহম্মদ আলির। শান্ত নিরঙ্কুশ ভাবে কাজ চলছে, তাদের সঙ্গে কোন খিটিমিটি নেই, সে কেন বস্তিতে আগুন দিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়ে নিজের ক্ষতি করবে?

মহম্মদ আলির লোক যে বস্তিতে আগুন দিয়েছিল তারও কোন প্রমাণ নেই।

তাদের আঘাত হানার জন্য উদ্যত ক্রোধ তাই অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য হাতড়ে ফিরছে এখনো।

শহরে একশো চুয়াল্লিশ, তা সত্ত্বেও যখন আমবাগানে চলছে এই জমায়েৎ, তখন এক ঘটনা ঘটেছিল শহরের অন্য এক পাড়ার রাস্তায়। ঝাঁকায় গোস্ত নিয়ে গিয়ে আবদুল মুসলিম-অঞ্চলে ফিরি করে—কাপড়ে ঢাকা থাকে গোস্ত।

'ফ্যাল্ ঝাঁকা—ফ্যাল্ ওই নরদমায়।'

অনেক অনুনয় বিনয় কাঁদাকাটার পর ঝাঁকাটা ফেলতে হয়েছিল।

'ব্যাটা তুই গরুর মাংস নিয়ে এ রাস্তায় হাঁটিস!'

কত মার খেতে হত, মরত কি বাঁচত কে জানে লোকটা, অমিতাভ এবং পাকা ছুটে এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

কিছু দূর তারা এগিয়েছে, দারুণ আক্রোশে পিছন থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, রাত দুপুরে মেয়ে চরিয়ে বেড়াও, তাই করলেই হয়!

আর একজন বলল, লোকটা প্রতিমা দেবীর ভাই নাকি হে অমিতাভ? জানা ছিল না তো?

অমিতাভ এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গেল, শক্ত করে পাকার হাত ধরে তাকেও সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে।

পাকা আশ্চর্য্য হয়ে যায়। এ অপমান নীরবে সয়ে যাবে অমিতাভ, তাকেও কিছু করতে দেবে না!

কিছু বলবেন না ওদের ?

কিছু বলার নেই।

বলার না থাক্, করার তো আছে। পায়ে ধরে মাপ চাওয়ানো তো যায়।

না ভাই, কিছু করার নেই। তুমি বুঝবে না।

কিছু করার নেই। চুপ করেই চলে যেতে হবে তাকে। ওদের শিক্ষা দেওয়া যায় না এই কুৎসিত মন্তব্যের জন্য। নিজের এই অপমান, প্রতিমার এই অপমান সয়ে যেতে হবে তাকে, নিষ্ক্রিয়ভাবে, বিনা প্রতিবাদে। কি তার বলার আছে ? রাত দুপুরে নির্জ্জন রাস্তায় তাকে আর প্রতিমাকে সত্যই তো আবিষ্কার করেছিল সুধা।

আরও কে কে দেখেছে কে জানে ! এদের শিক্ষা দিতে গেলে, হাঙ্গামা করলে, আরও বেশি ঘোঁট হবে প্রতিমার নামে।

ক্ষোভে বুক জলে যায়, হাসিও পায় অমিতাভের। তাকে কদর্য্য ইঙ্গিত শোনাবার সাহস হল এই বাঁদর ক'টার প্রতিমার নাম জড়িয়ে, সে মাথা নীচু করে শুনে গেল ওদের ধূলিসাৎ করে কাঁদিয়ে ক্ষমা না চাইয়ে !

এরা শুধু প্রতিধ্বনি, অনেক প্রতিধ্বনির মধ্যে দু-চারজন। যে মৃদু ধ্বনিটি সুধা সরল মনে না জেনে না বুঝে উচ্চারণ করেছিল গল্পচ্ছলে মেয়ে-মহলে, শহরের মেয়ে-পুরুষ ভদ্র সমাজে তা মৃদু নির্ঘোষে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে।

মেয়ে-মহলে গল্প করেছে সুধা, বিয়েবাড়ীর গল্প। সুরেনের মেয়ের বিয়ের দেওয়া-থোয়া আয়োজন-পত্র আদর-অভ্যর্থনা, অন্যায়-অব্যবস্থা, বরের চেহারা, মেয়েদের সাজপোশাক দেমাক-বোকামি, মেয়ের কেলেঙ্কারি কাণ্ড—এমনি সব অজস্র কাহিনী বর্ণনা ও সমালোচনার মধ্যে প্রতিমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার ব্যাপারটা। দুপুর রাত। মেয়েটাকে নিয়ে মোটরে উঠবে, তাকে তার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে নিজে বাড়ী ফিরবে, ওমা, মেয়ের পাত্তাই নেই ! একা একাই বাড়ী চলে গেল নাকি, কি কাণ্ড, এ্যাঁ ? অমিতাভ নিজে তাকে দায়িত্ব দিয়েছে মেয়েটাকে ভালয় ভালয় বাড়ী পৌঁছে দেবার—বাড়ী সে ঠিকমত পৌঁচেছে কি-না না জেনে বাড়ী ফিরে তো ঘুম হবে না সুধার।

প্রতিমার বাড়ীর দিকে তাই গাড়ী চলল। ওমা, ভাঙা পুলের ওপর গিয়ে ছাখে কি, দুজনে কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে এসে—

সুধাকে দোষ দেওয়া যায় না। এ জগতে কাউকেই বোধ হয় দোষ দেওয়া যায় না। অকারণ বজ্রপাতের মত একটা দুর্ঘটনা যেন ঘটে গেল তার জীবনে। এর একমাত্র প্রতিকার চিরকালের জন্য তার দগ্ধ হয়ে যাওয়া। সেই শুধু থামিয়ে দিতে পারে কদর্য কলরব, তার পক্ষেই সম্ভব প্রতিমার মিথ্যা কলঙ্কের উদ্দাম সত্য রূপকে বাতিল করা। আর কেউ পারবে না, আর কোন উপায় নেই। আগামী যে জীবনটা তার আছে, যে জীবনকে সার্থক করার রসায়িত করার যে পরিকল্পনা আর সিদ্ধান্ত সে গ্রহণ করেছে, ভাঙা পুলে ব্যক্তিগত আকাশ-বাতাস কামনা-বাসনা আনন্দ-বেদনা বাতিল করে প্রতিমার কাছে আদায় ক'রে নিয়েছে মরণের সঙ্গে কারবার করে জীবনের দাবী প্রতিষ্ঠা করবার অনুমতি,—সে সমস্ত বাতিল করে, উলটে দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রতিমাকে বিয়ে করে সে থামিয়ে দিতে পারে সর্ব্বনাশা কুশ্রী গুঞ্জন।

পাকা মূক হয়ে পথ চলে। অমিতাভের মুঠি থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। সে জানে প্রতিমা আর অমিতাভের নামে সারা শহরে কুৎসা রটেছে। শুধু যে জানে তাই নয়, উৎসাহের সঙ্গে এই মুখরোচক খবরটা তাকে জানাতে এসেছিল বলে একজন সাধারণ ভক্ত বন্ধুর গালে সে একটা থাপ্পড়ও কষিয়ে দিয়েছে। সে ভেবে পায় না অমিতাভ কি করে এমন অহিংসপন্থী হয়ে উঠল যে মিথ্যা বদনাম নিয়ে বিশ্রী তামাসা শুনেও তার রক্ত গরম হয় না!

চলতে চলতে হঠাৎ সে ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, আমায় বলুন, বলতে হবে। ওদের মারলেন না কেন? নিজে থেকে অনেক কথা বুঝিয়েছেন, এটাও আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে। আমি ছেলেমানুষ বলে যদি উড়িয়ে দেন অমিতদা—

পাকা অবশ্য বলে না ছেলেমানুষ বলে তাকে উড়িয়ে দিলে সে কি করবে, তবু অমিতাভের চমক লেগে যায়। চোখের পলকে সে বুঝতে পারে, তাদের বদনামটা সত্য কি মিথ্যা সে জন্য পাকার এতটুকু মাথা ব্যথা নেই। সে কেন ছেলে ক'টাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল না, এই সমস্যা বড় হয়ে উঠেছে পাকার কাছে।

তুমি সত্যি বড় বেশি রকম পেকে গেছ পাকা, অমিতাভ ক্ষোভের সুরে বলে, বুঝিয়ে বললেও কি তুমি বুঝবে? রাত দুপুরে ফাঁকা রাস্তার ধারে গাছ-তলায় সত্যিই তো আমরা কথা কইছিলাম। তুমিও তো গাড়ীতে ছিলে, দেখেছ। আরও হয়তো দেখেছে কেউ কেউ। তুমি আমায় চেনো, তুমি খারাপ কিছু ভাবলে না। কিন্তু লোকে তো খারাপ মানেটাই করবে!

করুক না? তাতে কি বয়ে গেল?

শহর জুড়ে কলঙ্ক রটা তার আর প্রতিমার পক্ষে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে কি ভয়ানক সমস্যার ব্যাপার, পাকার কাছে সেটাও বড় নয়।

বয়ে যায়, অমিতাভ বলে, মেয়েদের পক্ষে খুব বেশি বয়ে যায়। ভুলটা করেছি আমি, অত রাত্রে ওভাবে প্রতিমার সঙ্গে কথা না বলাই আমার উচিত ছিল। পরদিন কি কথা বলা যেত না? মিথ্যে হলেও দুর্নামটা সত্যি হয়ে গেছে। আমিই তাই প্রায়শ্চিত্ত করছি, টিটকারি সয়ে যাচ্ছি। নইলে মিথ্যা নিন্দাটাকেই বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

মিথ্যাকে মেনে নিলে মিথ্যার জোর কমে?

প্রতিমার কথাটা ভাবতে হবে তো!

প্রতিমাদির জন্য মিথ্যাকে মানতে হবে!

মানলাম কই?

মানলেন না? গাল শুনে চুপ করে রইলেন!

অমিতাভের রাগ হয় কিন্তু পাকাকে ধমক দিতে পারে না। সত্য কথা বলতে কি, টিটকারি শুনে চুপচাপ পালিয়ে আসা উচিত কি অনুচিত হয়েছে, এ বিষয়ে তার নিজের মনেই সংশয় ছিল। নইলে পাকাকে সে কি প্রশ্রয় দিত! তার পাকামিভরা কথা শুনেই ধমক দিত প্রচণ্ড।

আমি কিন্তু তা বলি নি অমিতদা।

অমিতাভ একটা নিশ্বাস চেপে যায়। আদর্শের জন্য কাজ করা, মরা কি কঠিন! বয়সের কত আর তফাৎ হবে তার আর এই পোক্ত ছেলেটার মধ্যে, বড় জোর, বার-তের বছর। তবুও যেন ওর মধ্যে নতুন একটা জগতে জন্মেছে, তার জগতের চেয়ে বড় হয়েছে।

দু'আনার মুড়ি-মটরশুঁটি ভাজা কিনুন না অমিতদা, খিদেয় পেটটা চোঁ চোঁ করছে। পয়সা আছে তো পকেটে? বেন্দার দোকানে চায়ের সঙ্গে খাই আসুন।

আর তো পয়সা নেই।

হোগলার চালা তুলে, হাইস্কুলের দুটো চোরাই ডেস্ক বেঞ্চ সস্তায় কিনে, বেন্দা এক চা-বিস্কুট-পাঁউরুটির দোকান দিয়েছে। বেন্দা ছিল এই ছোট শহরের বড় জেলের একজন সাধারণ ওয়ার্ডার। জেল থেকে একদিন দু'জন কয়েদী পালিয়ে যায়, রাজনৈতিক কয়েদী, অবশ্য কংগ্রেসী নয়। আগের দিন বেন্দা ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল, তার বৌ একটা মরমর ছেলে বিয়োতে গিয়ে নিজেও মরতে বসেছে বলে। বৌ বাঁচে নি। এ রকম অবস্থায় বৌরা এদেশে বাঁচেও না। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে বুকিয়ে দিতে মোটে তিন দিন লাগিয়ে ফিরে এসে শোনে কি যে সে ছাঁটাই হয়েছে, কয়েদী পালানোর জন্য তাকে দায়ী করে তাকে কয়েদী বানাবার চেষ্টাটা উপরওয়ালাদের দয়ায় শুধু বাতিল হয়েছে।

বেন্দা দরখাস্ত ঝেড়েছিল। বড়কর্তার কাছে। বড়কর্তা বেন্দার এতদিনের চাকরিটা বজায় রাখার কথা কিছুই বলে নি, শুধু বেন্দার নামে মামলাটা তুলে নিয়ে বেন্দাকে এক মাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করার হুকুমজারি করেছে।

তাই অবিবেচক খেয়ালী সরকারের উপর বেন্দা ভীষণ চটে গেছে।

সরকারকে সে গাল দেয়। কড়া বা নরম বা মিষ্টি ভাষায় যে সরকারকে গাল দেয় তাকেই বেন্দা আদর করে চা খাওয়ায়, তিন পয়সা কাপের দাম ধরে এক পয়সা। কখনো দাম ধরেই না।

বেন্দার দোকানে বসে পাকা বলে, সত্য হোক মিথ্যা হোক লোকের কি? আপনারা বড় হয়েছেন, যখন খুশি যেখানে খুশি যাবেন, যা খুশি করবেন। অন্য কারোর ক্ষতি তো করছেন না!

এবার অমিতাভও একটু হাসে।

পাকা বলে যায়, লোকের পছন্দ না হয়, নিন্দে করুক, নিজেরা নিজেরা নিন্দে করুক আর ঘরের ভাত বেশি করে খাক। সামনে কিছু বলতে এলে

গাঁট্টা মেরে ঠাণ্ডা করে দেব। আপনি নিন্দাকে ভয় করলেন, তাই ভীরুর মত ছোঁড়াগুলোর যা-তা কথা শুনেও চুপ করে থাকতে হল।

কে জানে, হয়তো তোমার কথাই ঠিক।

যে রেটে কুৎসা ছড়িয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। মহাসমারোহে প্রচার চলছে অমিতাভ ও প্রতিমার নামে ফেনানো বানানো কাহিনীর। সত্যই প্রচার, কারণ এই সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে অমিতাভদের সকলকে—ওরা এই রকমই, ওরা করবে দেশোদ্ধার!

অমিতাভ খারাপ এবং সে একটা দলের ছেলে। সুতরাং দলের সকলেই তার মত খারাপ!

চা খেয়ে তারা উঠতে যাবে, সর্ব্বাঙ্গে মটকার চাদর জড়িয়ে কালীনাথও চা খেতে দোকানে ঢোকে। তারা ওঠে না। দোকানে বাঁশের বাতার বেঞ্চ। কালীনাথ সামনে মুখোমুখি বসে বলে, চা আর টোস্ট দিও।

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কেটে যায়।

কালীনাথ সখেদে নিশ্বাস ফেলে। অমিতাভের বোমার বারুদের ফরমূলা নিজের হাতে ঘেঁটে দেখতে গিয়ে হঠাৎ বারুদ জ্বলে উঠে বাঁ হাতটা তার ঝলসে গেছে। যন্ত্রণার ছাপ তার মুখে ছিল না, এখন আফ্‌সোস ও তিরস্কারে তার মুখের চেহারা বদলে যায়। কথা সে কম বলে চিরকাল, আজই বোধ হয় প্রথম অমিতাভ তার মুখে এত কথা একসঙ্গে শোনে।

অমিত, এই জন্যই মেয়েদের বাদ দিয়েছি, মেলামেশা সম্পর্কে কড়া নিয়ম করেছি, এসব ঘটে বলেই। আমি জানি এ জন্য বরাবর তোমার মনে ক্ষোভ ছিল, প্রতিবাদ ছিল। মেয়েরা কি মানুষ নয়? আসল কথাটাই তোমরা বুঝতে পার নি, বুঝবার চেষ্টাও কর নি। সহজ কথা তোমরা সহজভাবে নিতে পার না, ঘুরিয়ে জটিল করে তোল।

ক্ষুব্ধ চোখে চেয়ে থাকে অমিতাভ। দোষ তার? সে-ই তবে দোষী?

কালীনাথ বলে, বাদ দেওয়া হয়েছে কি মেয়েরা মন্দ বলে? মানুষ নয় বলে? এ কথা কেন তোমাদের মনে হয়! কেন মনে হয় না, আমাদের

কাজে মেয়েদের দরকার নেই, ওদের আনলে গোলমাল হয়, শুধু এইজন্যই ওদের দূরে রাখা হয়। যার যা কাজ, সে কাজ তাকে দিলে ভালভাবে সে তা করবে। অন্যে পারবে না। আমার মা মেয়ে ছিলেন, জীবনে এক পয়সা রোজগার করেন নি, বাবার রোজগারের পয়সায় সংসার চালিয়েছেন, ছেলেমেয়ে মানুষ করেছেন। বাবার কাজ মা করেন নি বলে কি তিনি ছোট ছিলেন, তুচ্ছ ছিলেন ?

মায়েরা কিন্তু একটু ছোট হয়েই থাকেন কালীদা। বাপেদের অধীন হয়েই থাকেন।

কি বলতে চাচ্ছ ?

বলছি, কিছু রোজগার করতে দিলে মায়েরাও একটু উঁচু স্তরের মানুষ হতে পারতেন। মা হিসেবে যেমন হোন, মানুষ হিসাবে মায়েরা তেমন কিছু নন কালীদা।

একটু উত্তেজনা এসেছিল কালীনাথের, হঠাৎ যেন শান্ত হয়ে যায়। মৃদুস্বরে বলে, তোমার মনটা এমন বাঁকা কেন অমিত ? ও কথা তো আসে না, আমি তো তা বলি নি। সমাজ-ব্যবস্থায় কি দোষত্রুটি আছে তাই নিয়ে কি তর্ক আমাদের ? আমার কথার মানে কি এই যে, সব বিষয়ে মেয়েদের পুরুষের সমান অধিকার পাওয়া উচিত নয়, তারা অন্দরে থাকবে, রোজগার করবে না ? এ ভাবে ধরলে সব গুলিয়ে যাবে অমিত। মেয়েদের কি হওয়া উচিত আমরা তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে বসি নি, আমরা নারী-মুক্তি আন্দোলন করছি না, সমাজ-সংস্কারের কাজে নামি নি। আমাদের উদ্দেশ্য ইংরেজকে মেরে তাড়ানো, দেশটাকে স্বাধীন করা। আমাদের একমাত্র বিবেচ্য এ কাজে মেয়েদের নেওয়া যায় কি না! আমরা দেখছি কাজটা মেয়েদের শুধু অনুপযুক্ত নয়, ওদের সংস্রবে এলে পর্য্যন্ত হাঙ্গামা হয়, কাজ পণ্ড হতে বসে।

কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে আসে কালীনাথের, একটু থেমে আবার সে বলে, অন্যরকম সমাজ হলে, মেয়েদের অবস্থা অন্যরকম হলে, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পর্ক অন্যরকম হলে কি করা হত, সে কথা আলাদা। ভবিষ্যতের জন্যে

তাকে তুলে রেখে দেবার কাজ আমাদের নয়, আমাদের কাজ বর্ত্তমানে। মেয়েদের কথা ভেবে চোখের জলে বোমা বারুদ ভেজাবার সময় আমাদের নেই। যারা কাব্য করে ওটা তারাই করুক।

অমিতাভ বলে, প্রতিমার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়াই করে এসেছিলাম কালীদা।

কালীনাথের কথার ধারে আহত হয় অমিতাভ, একটু আশ্চর্য্যও বোধ করে সেই সঙ্গে। মেয়েদের সম্পর্কে বিধিনিষেধের আসল কারণ তার জানা ছিল অন্য, সাধকের দেহমনে ব্রহ্মচর্য্য পালনের পুরনো সংস্কার, নারীকে নরকের দ্বার মনে করে চলার জের। এরকম সোজাসুজি বাস্তব একটা হিসাবও যে আছে কালী-নাথের সেটা অমিতাভের ধারণা ছিল না। হিসাবটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। আজ কোনমতেই নয়। একদিন অসময়ে একটি ছেলে আর মেয়েকে পথ চলতে চলতে ভাঙ্গা পুলে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল শুনে অশ্লীলতার তুলো ভানছে শহরের জিভ। দেশের জন্য ছেলেটির প্রাণ দেবার আর কি বিশেষ কোন মূল্য থাকবে লোকের কাছে? কেউ কি উদ্বুদ্ধ হবে?

কালীনাথ বলে, এখনো উপায় আছে, এখনো সামলানো যায়।

কি করে? সাগ্রহে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে।

এই মুহূর্ত্ত থেকে শক্ত হও, সমস্ত যোগাযোগ ছেড়ে দাও পিতুর সঙ্গে। সব ঠিক হয়ে যাবে, একটিবারও যদি তোমাদের কাছাকাছি না দেখা যায়। আস্তে আস্তে গুজব ঝিমিয়ে পড়বে, মরে যাবে।

যাবে কি? কে জানে!

কালীনাথ প্রতিমার দূর সম্পর্কের মামা। অথচ প্রতিমার দিকটা সে ভাবছে না।

পিতুর দিক?

ভাবনা তো ওকে নিয়েই। এ কেলেঙ্কারি ভুলবে না কেউ। আমার বেলা হয়তো উদারভাবে তুচ্ছ করে দেবে, কিন্তু পিতুকে রেহাই দেবে না। সবার কাছে ওর পরিচয় কি হবে জানো কালীদা? আমি শাঁসটুকু চেঁছে খেয়ে ছিবড়ে ফেলে দিয়েছি। এখন সবটা রসালো মজার ব্যাপার, সবাই বিয়ের দিন গুণছে, যেই আমি ছিটকে সরে যাবো—

তবে বিয়ে করো।

কি করে করব? বিয়ে করে সংসারী হবার জন্যে—

গলা বুজে যায় তার কালীনাথের ভেসলিন-মাখা ঝলসানো হাতের দিক চেয়ে। এ দুর্ঘটনার জন্যও হয়তো সে দায়ী। নানা চিন্তায় অন্যমনা থেকে কি এসব ঠিকমত হয়?

ব্যাকুল হয়ো না অমিত, কালীনাথ ভেবেচিন্তে বলে, আমি পিতুর সঙ্গে কথা কয়ে দেখি। ব্যাপারটা সে কি ভাবে নিয়েছে জানা দরকার।

না কালীদা, তুমি এ ব্যাপারে হাত দিও না।

কালীনাথ আশ্চর্য্য হয়ে যায়।—কেন?

এটা অন্যের কাজ নয়। যা ঠিক করার আমরাই করব।

কালীনাথ গম্ভীর হয়ে যায়। যে কাঠিন্য ফুটে ওঠে তার মুখে তার সঙ্গে অমিতের পরিচয় ঘনিষ্ঠ।

সতেরোই কিন্তু বাতিল হবে না অমিত। তুমি সরে গেলেও নয়।

সরে যাব কেন?

দরকার হতে পারে না? তোমরা কি ঠিক করবে আমি জানি না, কিন্তু যদি ঠিক কর পিতুর সুনাম বাঁচানো তোমার কর্ত্তব্য, সতেরো তারিখের রিস্ক নেবে কি করে? কত কি ঘটতে পারে, তুমি সরে যেতে পার, জেলে যেতে পার পাঁচ-দশ বছরের জন্যে।

ভুলি নি কালীদা।

আজ বারো তারিখ।

তাও মনে আছে।

সরকারী ভাণ্ডার লুটের পরিকল্পনা অনেক দিন পিছিয়ে দিতে হয়েছিল নারায়ণের একগুঁয়েমির জন্য, নলিনী দারোগার বৌয়ের সামান্য কিছু গয়না নাটকীয়ভাবে কেড়ে নেবার জিদ বজায় রাখায়। নলিনীও বাহাল তবিয়তে জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে। নারায়ণের অনুমান সফল হয় নি, বৌয়ের গয়না ডাকাতি হবার রাগে দিশেহারা হয়ে চারিদিকে অনাচার অত্যাচার চরমে তুলে মানুষের

ছড়ানো ঘৃণা স্পষ্ট পুঞ্জীভূত করে তুলবার আয়োজন শুরু হয়েই থেমে গিয়েছিল। রায় বাহাদুর এসে শুধু সরকারী তাণ্ডব নয়, নলিনীকেও শান্ত করে দিয়েছিল। নলিনী ছুটি চেয়েছিল তিন মাস, ছুটি পায় নি। বদলি হতে চেয়েছিল, বদলি হয় নি। কড়া ধমক আর ঝাড়া দু'ঘণ্টা উপদেশ শুনে ধীর শান্তভাবে দৈনন্দিন কাজ শুরু করেছিল।

এদিকে টাকা ছাড়া কাজ চলে না কালীনাথদের, কিছু করা যায় না—সংগঠন, অস্ত্র সংগ্রহ, বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ, আঘাত হানার কার্য্যকরী পরিকল্পনা। নারায়ণের সঙ্গে মিলেমিশে সরকারী টাকা লুটের ব্যবস্থা করার চেষ্টা আর একবার হয়েছিল, ফল হয় নি। একটা নিষ্ঠুর সত্য আরও প্রকট হয়ে উঠেছে এই চেষ্টার মধ্যে। দুটি বিপ্লবী দল, তাদের আদর্শ এক, উদ্দেশ্য এক, পণ এক, কর্ম্মপন্থা এক, কিন্তু দুটি দলের মধ্যে মিলন হওয়া প্রায় অসম্ভব। দেশের মুক্তির জন্যে তারা প্রাণ দেবে, কিন্তু একসঙ্গে দেবে না।

আট

১

নাই-বা দিল একসঙ্গে প্রাণ? প্রাণ দেওয়াটাই আসল কথা।

প্রতিমা মৃদুস্বরে বলে।

বলে অমিতাভকে, সে বোঝাপড়া করতে এলে, তাকে চা আর পাঁপড় দিয়ে। এমনি অভ্যাস হয়েছে তাদের, প্রতিমারও। আলোচনা তাদের দুজনের ব্যক্তিগত, প্রণয়গত ও আদর্শগত সাংঘাতিক পরিস্থিতি নিয়ে, কিন্তু কথা শুরু হয় প্রাণোৎসর্গের মধ্যেও অনৈক্যের সমস্যা নিয়ে। গুপ্ত কথা বাদ দিয়ে সাধারণভাবে প্রতিমাকে অনেক কথা শুনিয়ে এসেছে অমিতাভ। শোনার আগ্রহ প্রতিমার দিন দিন বাড়ছিল।

তবে, আজ অবশ্য অমিতাভ একেবারে গোড়া থেকে শুরু করে দিল সমস্যাটা, তার ও প্রতিমার সমস্যাটা, আগাগোড়া খোলাখুলি স্পষ্ট করে তুলতে চেয়ে। তা আসলে তার প্রাণটাকে পণ করাটাই তো আসল সমস্যা। নইলে আর ভাবনা কি ছিল! তাপ কিছু কম নয়, পুড়িয়ে দিচ্ছে দুজনকেই। ব্যবহারিক, পারিবারিক বা সামাজিক প্রতিবন্ধক কিছু নেই, উদ্যত ব্যগ্র আশীর্ব্বাদ!—বর্ত্তমানে উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত।

ইতিমধ্যে আরও টের পাওয়া গেছে প্রতিমার দুর্নামের বহর। শহরে যেন একটা অবৈধ-প্রেম-বিরোধী আন্দোলনই শুরু হয়ে গেছে তোড়জোড়ের সঙ্গে, ঘরে বাইরে পথে ঘাটে জিহ্বায় জিহ্বায় ছি ছি উচ্চারণ, আপসোস আর নোংরা টিটকারি। এ শহরের সুপবিত্র ভদ্রসমাজের ইতিহাসে আর যেন ঘটে নি বিয়ের বয়সী সোমথ ছেলে-মেয়ের কেলেঙ্কারি। এই প্রথম ঘটল—সৃষ্টিতে অনাছিষ্টির মত, চলতি জীবনে বিপ্লবের মত, সমাজ সংসার ধ্বংস করে পৃথিবী ওলোট-পালোট করে দেবার মত ভীষণ কাণ্ড! বোঝা যায়, প্রচণ্ড প্রচার চলেছে, প্রচুর অধ্যবসায়ের সঙ্গে, পেছনে আছে সঙ্ঘবদ্ধ

জ্বালা আর দুরভিসন্ধি। প্রচার খুব স্পষ্ট—অমিতাভের মত ছেলেগুলির নাকি এই ব্যবসা। তাদের স্বদেশী করার মানে এই, ভদ্র ঘরের মেয়ে বাগিয়ে নষ্ট করা। প্রতিবেশী মায়েরা এসে চৌকাঠের এপাশ থেকে প্রতিমার মাকে বলে গেছেঃ বলি নি তোমায় আমরা, বলি নি? এখন সামলাও! বাপেরা বলেছে প্রতিমার বাবাকে, বাপ হয়ে স্বদেশী ছোঁড়াকে মেয়ে ঘুষ দিয়ে স্বদেশী করা, ইলেকসনে ভোট বাগানো? পথে-ঘাটে খেলার মাঠে ক্লাব-লাইব্রেরী-দাওয়ায়-বৈঠকে জগতের এই কুৎসিততম বীভৎসতম কাণ্ডের রসালো বর্ণনাযুক্ত ছাপা হ্যাণ্ডবিল নিয়ে হাসাহাসির সীমা নেই।

হাঁ, ছাপা হ্যাণ্ডবিল বেরিয়ে গেছে! রাতারাতি বাড়ীর সামনে দেয়ালে ও দুয়োরে আঠা দিয়ে আঁটা হয়ে গেছে, বাড়ির প্রত্যেকের নামে লেখা খামে এসেছে বিনা মাশুলে। প্রতিমার নামের খামের কাগজটির উল্টো পিঠে আবার একটি কালি দিয়ে ছবি আঁকা। ছবিটা ঝানু আর্টিস্টের সন্দেহ নেই, প্রতিমা আর অমিতাভের মুখ কার্টুনের মুখের মত কয়েকটা আঁচড়ে স্পষ্ট। বাকিটা চরম—গা ঘিন:ঘিন করিয়ে ছাড়ে দেখা মাত্র।

আমারও মরাই ভাল।—প্রতিমা বলে অমিতাভের গুছিয়ে বলার চেষ্টার শুরুতেই। আলোচনাও তাই আপনা থেকে ভিরমি খেয়ে পড়ে আসল কথায়।

জানলার শিকে বাঁধা রঙিন পাড়ের টুকরোটা বাতাসে উড়ে উড়ে আছড়ে পড়ে। একটু জোরেই বইছে বাতাস। চোখের জলের বালাই মিটিয়ে দিয়ে অসহ্য প্রতিবাদে যেন লালচে হয়ে গেছে প্রতিমার চোখ, বন্ধ হয়েছে পলক পড়া। নাকের ডগায় বড় ঘামাচির মত ছোট ব্রণটি টুকটুকে হয়ে পেকেছে। সমস্ত পাংশু মুখে যেন জ্বালাই লেপা আছে, শুধু ওই ব্রণটুকু তার ব্যথার প্রতীক।

আমি চারিদিক বিবেচনা করেছি পিতু, সব কথা।

তাড়াতাড়ি বলে অমিত।

করেছ?

সে কথাই বলছিলাম তোমাকে—

জেঠিমা আচমকা ঘরে আসে, প্রতিমার জেঠিমাই সংসারের কর্ত্রী। রোগা ফরসা শুদ্ধ মূর্ত্তি, চ্যাতালো মুখখানায় ভদ্র ঘরের গৃহিণীপনায় প্রৌঢ়া হবার ভ্রান্ত বিষাদের সৌম্যতা, কপালে ডগডগে লাল সিঁদুরের মস্ত ফোঁটা, চুলওঠা সিঁথিতে কিন্তু সিঁদুর প্রায় নেই। সিঁদুর লেগে চুল ঝরে যায়—কার কাছে এ কথা শোনার পর থেকে সিঁথির সিঁদুর কপালের ফোঁটায় নামিয়ে জেঠিমা চুলকে রেহাই দিয়েছে। ঘরে ঢুকে সে দেখতে পায় মেয়ে তার তাকিয়ে আছে জানলার দিকে, টিপয়ে এলানো পিতুর বাঁ হাতের আঙুলগুলি অমিতের থাবার আঙুলে আটকানো। এই হাতে মেলানো হাত স্থগিত করে দেয় তার রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য, মুখোমুখি খোলাখুলি প্রচণ্ড আক্রমণে অমিতাভকে ঘায়েল করা।

অমিত যে! কখন এলে, কেমন আছ বাবা? ওমা, দুধের কড়া চাপিয়ে এসেছি উনুনে!

হার মেনে নয়, জয়ের আশায় জেঠিমা যেন পালিয়ে গেল তাদের ছেড়ে।

আমি সব ভেবেছি পিতু। চারিদিক বিবেচনা করে আমি শেষ সিদ্ধান্ত করেছি। সব কথা ভেবে চিন্তে—

আমার কথাও?

জানালার বাইরে জোর বাতাসে দোল খাওয়া গাছপালার দিক থেকে এমন ভাবে মুখ ফিরিয়ে লালচে চোখে এমনি কটমট করে তাকায় প্রতিমা পেছনে মাথা হেলিয়ে আঘাত করার উদ্যত ভঙ্গিতে যে মুগ্ধ হয়ে মাথা গুলিয়ে যায় অমিতাভের।

তাই বলে প্রতিমা রেয়াৎ করে না, ঘা মারে। কি তিক্ত তার গলার আওয়াজ, ওই সুঠাম গলা, ঘাড়ে নামা বাঁকের মাঝামাঝি যেখানে তার একটি আঁচিলের মত নীল জন্মচিহ্ন।

আমার কথাও তুমিই ভেবেছ! ভেবে চিন্তে তুমিই ঠিক করেছ আমাকে কি করতে হবে। শোনাও হুকুম, শোনাও!

এত বেশি বাড়াবাড়িতে একটু তখন চটে যায় অমিতাভ। হাতে গাঁথা হাত দুটি পড়ে আছে টিপয়ের আশ্রয়ে, অ্যাসট্রেতে নামিয়ে রাখা জলন্ত

সিগারেটের ছ্যাকা যে কোন মুহূর্তে লাগতে পারে তাদের যে কোন জনের হাতের চামড়ায়। তবু কি আশ্চর্য্য কথা অমিতের মনে হয় ত্যাখো ওই বদ্ধমুষ্টির দিকে চেয়ে। সমান নয়, শক্ত নয়, অনেক ছোট, অনেক কোমল, স্পর্শরূপী লাবণ্যভরা থাবা প্রতিমার। মাখনে গড়া, তবে ভেতরে হাড় আর বাইরে চামড়া দিয়ে ঠেকানো হয়েছে থেবড়ে যাওয়া, গলে যাওয়া।

সে মরিয়া হয়ে বলে, হ্যাঁ, ঠিক করেছি, তুমি কি করবে তাও আমি ঠিক করেছি। হুকুম দিতেই এসেছি। শোন আমার হুকুম—তুমি কি করতে চাও, স্পষ্ট করে বলো।

তার মানে?

আমি ঠিক করেছি, তুমি যা বলবে তাই হবে। তোমার কথাই শেষ কথা। তারপর আর কোন তর্ক নেই, বিচার বিবেচনা নেই।

প্রতিমা ভড়কে গিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু ভাবে।

আমি যদি বলি—

তার অসমাপ্ত কথাতেই সায় দেয় অমিত, তাই হবে। আমি ভেবেচিন্তে কি দেখলাম জানো? আমি এমন একটা মহাপুরুষ নই যে আমাকে ছাড়া বিপ্লব হবে না। বোকার মত সত্যি তাই আমি এ্যাদ্দিন ভেবেছিলাম পিতু। আমি যদি করি তবেই দেশোদ্ধার হবে, নইলে হবে না, আমি বাদ পড়লে কালীদা'দের চেষ্টা পণ্ড হয়ে যাবে! আমি অবশ্য চাই—

নিজের কথাও অসমাপ্ত থেকে যায় অমিতের।

আমি কি বলব? কাতরভাবে বলে প্রতিমা।

তুমিই বলবে।

তিনটে বাজে, চা আনি চা খাও।

চা বরং পরে খাব—

চা খাও।

স্টোভ ধরিয়ে চা করে আনতে পনের বিশ মিনিট লেগে যায়, সেই অবসরে ধীরে ধীরে শান্ত হয় অমিতাভ, প্রতিমাকে নতুন করে শ্রদ্ধা করার আরও একটা কারণ পায়। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার হিসাবও আসে, সহজ বাস্তব বিচার।

প্রতিমা একটা মেয়ে। কালীদা বলে, মেয়েরা বিপ্লব-প্রচেষ্টায় বাধা। প্রতিমা তার বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে সাবাড় করেছে। চা করে আনতে গেছে গোছ-গাছ হয়ে আসার জন্য সন্দেহ নেই। কি, তার কথাই শেষ কথা, এই চরম ক্ষমতা মেয়ের মত, কি ভাবে করুণ কোমল শরম-শালীন অসহায়তার রূপে খাটানো যায় তার কায়দা ঠিক করতে গেছে তাতেই বা সন্দেহ কি!

চিনিকাটা চা করে আনে প্রতিমা। খাওয়া চলে, তবে কিনা মিষ্টিতে স্বাদ গুলিয়ে যায়।

প্রতিমা বলে, শোন। তুমি যা বললে আমি তাই মানলাম। আমার কথাই শেষ কথা।

অমিত অসহায়ের মত বলে, নিশ্চয়।

প্রতিমা বলে, আমার কথা এই, তুমি বলো আমরা কি করব। আমি সত্যি বুঝে উঠতে পারছি না কি করা উচিত।

মিষ্টি করে হাসে প্রতিমা তার কাঁদা চোখ আর পাংশু মুখে,—তুমিই বলো।

অমিত বলে, আগে সুপুরি এলাচ কিছু দাও।

আবার অশান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ভেতরটা। কর্ত্তব্য স্থির করার দায়িত্ব ফিরে এল। প্রতিমার রায় বিনা তর্কে মেনে নেবার সিদ্ধান্ত করে সে আত্মলোপের এক আশ্চর্য্য শান্তি অনুভব করেছিল। তার যা খুশি করার স্বাধীনতা আছে, সে বেছে নিতে পারে। প্রতিমার সে জোর নেই, তার ইচ্ছা অনিচ্ছা তবেই খাটে দয়া করে যদি সে তা মেনে নেয়। সে যেচে না এলে তার নাগালও প্রতিমা পেত না। দুর্নাম রটেছে দুজনেরই, কিন্তু ঘায়েল যদি হয় তবে শুধু প্রতিমাই হবে। সতীশ নাগের মেয়ে করুণা বিষ খেয়ে মরেছিল, কতদিন আগে? তিন বছর হবে? অমিত ভোলে নি। ভূতনাথের কিছুই হয় নি, রোমাঞ্চকর উপন্যাসের বীর নায়কের মত ঈর্ষার গোপন পূজাই যেন সে পেয়েছিল। চাকরি নিয়ে বিয়ে করে সে সুখী হয়েছে, সমাজে তার স্থানটুকু সঙ্কুচিত হয় নি। তাই অমিত ভেবেছিল, প্রতিমাকেই শেষ সিদ্ধান্তের অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। এটা খেয়াল হয় নি, যার জোর নেই তার অধিকার খাটাবার জোরও থাকে না। প্রতিমার পক্ষে সত্যই সম্ভব নয় শেষ কথা বলা।

তবে দেখা যায় ঠিক অতটা অবলা নয় প্রতিমা। তাদের সারা জীবন সম্পর্কে শেষ কথা বলতে না পারুক, আজকের শেষ কথাটা সে বলতে পারে।

বলে, আজ থাক্। আজ আমরা কিছু ঠিক করব না অমিত। তুমিও না, আমিও না।

বেরোতে পাব বাড়ী থেকে? অমিত প্রশ্ন করে,—মা, জেঠিমা, সুষমাদি এঁরা শেষ জবাব না শুনে ছাড়বেন?

প্রতিমা ভেবে চিন্তে বলে, হাসি খুশি মুখ নিয়ে বেরিয়ে যাও। জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবে, পিতু জানে, পিতুর কাছে শুনবেন।

তুমি কি বলবে?

বলব'খন।

যাওয়ার আগে অমিত বলে, কালীদা বলছিল ও দুটো নিয়ে যেতে। দরকার আছে।

নিরাপদে রাখার জন্য দুটি পিস্তল প্রতিমার হেফাজতে দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিমার মুখে হাসি ফোটে।—স্যুইসাইড করতে পারি ভয় হচ্ছে? নিয়ে যাবে নিয়ে যাও কিন্তু তোমাদের রিভলবার দিয়ে স্যুইসাইড করব, অত বোকা ভেবো না। ওর দাম জানি। মরি যদি এমনি মরব, আরও ঢের উপায় আছে, মরব তো তোমাদের রিভলবার দুটো ধরিয়ে দিয়ে শত্রুতা করে মরব কেন?

তবে এখন থাক্।

কতক্ষণ মানুষ মাথা ঘামাতে পারে নিজের ব্যাপার নিয়ে, যত তা গুরুতর হোক? এই অস্থায়ী ব্যবস্থায়, বিচার বিবেচনা সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখায়, কি যে স্বস্তি পায় অমিতাভ! আজ পনের তারিখ, পরশু সতেরো। ওইদিনের পরিকল্পনার সাফল্যের উপর কত কিছু নির্ভর করছে। দলের ভবিষ্যৎ, সংগঠনের দৃঢ়তা, আরও অস্ত্রশস্ত্র, প্রবলতর বিপ্লবী সংগ্রাম, রক্তের বর্ষণে মাটি ভিজিয়ে স্বাধীনতার ফসল গজানো। ভাল কি লাগে এসব ঝঞ্ঝাট, হৃদয়ের এই ক্ষুদ্রতার বালাই? এই একটা মেয়েকে ভালবাসা, একটা মেয়ের সুনাম দুর্নামের ভাবনায় বিব্রত হওয়া? হঠাৎ যদি অসুখ হয়ে মরে যেত প্রতিমা—

না, স্যুইসাইডের সে পক্ষপাতী নয়, ওটা ঘৃণ্য কাজ—একমাত্র দলের জন্যে বিপ্লবের প্রয়োজনে ছাড়া। ধরা পড়তে, পুলিসের অসহ্য নির্য্যাতনে, দেহমনে অমানুষিক পীড়নে ভেঙে পড়তে বা উন্মাদ হতে হবে এটা এড়াবার জন্যও সে আত্মনাশ সমর্থন করে না। হোক পীড়ন, চুরমার হয়ে যাক দেহের হাড়, মনের গঠন, ওই পীড়ন দেশে প্রতিশোধের আগুন জ্বালাবে। তবে অসুখ হয়ে প্রতিমা যদি হঠাৎ মারা যায়, কারো কিছু বলার বা করার থাকে না। পুলিসের গুলিতে বা ফাঁসির দড়িতে মরার আশায় ওই মরণের শোক সে তুচ্ছ করতে পারে।

অন্তত পারে কি না পারে দেখা তো যায়, যখন আর প্রতিবাদ বা প্রতিকারের উপায় থাকে না।

অমিতাভ অনুভব করে, সারা জীবনের আত্মজ্ঞান আর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তার এতদিনে এই প্রথম ওলোট পালোট হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে। বিপ্লবী দলে যোগ দিতে তাকে বদলাতে হয় নি, তারই সঞ্চিত ক্ষোভ পুঞ্জীভূত আক্রোশ তাকে এদিকে ঠেলে দিয়েছে। বিদ্রোহের পথে, দলের শিক্ষায় বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশায় শুধু কঠোর হয়ে জমাট বেঁধেছে সেই ঘৃণা, দৃঢ় হয়েছে বিশ্বাস, কঠিন হয়েছে পণ। নিজের সঙ্গে বিরোধিতায়, বোঝাপড়ার দরকার হয় নি। আজ প্রথম প্রচণ্ড আত্মবিরোধী লড়ায়ে কেমন যেন নতুন মনে হচ্ছে জীবন আর জগৎ। বাতিল করা স্নেহ-মমতা আশা-কামনা স্বপ্নগুলি যেন যেমন সে ভেবে রেখেছিল তেমন ছিল না কোন দিন, আজ তাই প্রহরে প্রহরে দিনে দিনে তাকে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হচ্ছে—নিজের ওই রূপগুলির নতুন নতুন চেহারা দেখে।

মোড়ে মোড়ে পুলিস মোতায়েন, পথে লোক চলাচল কমে গেছে, কাঙালি-টোলার গা-ঘেঁষে ছোট বাজারটা এক রকম বসে নি। শহরের শঙ্কা আর চাপা উত্তেজনার শান্ত রূপ ঝাপ্‌টার মত চোখে লাগে। সোনাতুল্লার একতলা জীর্ণ বাড়ীর আলকাতরা মাখানো কালো দরজায় মরচে ধরা তালা আঁটা। মরচে ধরাই ছিল তালাটায়; দরজায় তালা পড়েছে কাল। সোনাতুল্লার সঙ্গে দরকার ছিল অমিতাভের। ওকে খুঁজে বার করতে হবে মুসলমান মহল্লায়।

২

কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল কালীনাথের মুখ। এত কাছে ঘনিয়ে এসেছে নির্দ্দিষ্ট দিন, সতেরোই তারিখ, এখন আবার ভাবতে হচ্ছে সমস্ত পরিকল্পনা স্থগিত করার কথা। এ যেন ভাগ্যের পরিহাস—যে ভাগ্য তাদের বৈপ্লবিক কাজে বাধার পর বাধা সৃষ্টি করতে কোমর বেঁধে লেগেছে গোড়া থেকে। সতেরোই তারিখের চার-পাঁচটি দিন বাকী—কোন রহস্যময় অন্ধকার থেকে মাথা তুলল এই হিন্দুপ্রধান শহরে হিন্দু-মুসলমান হাঙ্গামার আশঙ্কা। ছোটখাট হাঙ্গামা হয়েও গেল দু-একটা। এক গাদা বাড়তি পুলিস এসেছে, একশো চুয়াল্লিশ টাইট হয়েছে, থমথম করছে শহর। সাধারণ বিশৃঙ্খলায় খুশি হত কালীনাথেরা, অন্য দিকে নজর থাকত সরকারের পুলিসের, কিন্তু এই অসাধারণ অবস্থার জন্য স্বাভাবিক ঢিলেমি ঝেড়ে ফেলে ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে লাঠিধারী কনস্টেবল পর্য্যন্ত সবাই সতর্ক, সজাগ—একদল সশস্ত্র পুলিসও এসে ভিড় করেছে শহরে। নারায়ণের কাণ্ডের ফলে যা হয়েছিল প্রায় সেই অবস্থা, শুধু সরকারের এই সজাগ দৃষ্টি তাদের দিকে নয়। কি উদ্ভট, অসঙ্গত, অর্থহীন এই হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ! এই সেদিন দেশের মুক্তি আন্দোলনে এই শহরের হিন্দু-মুসলমান কোলাকুলি করেছে, হিন্দু জল খেয়েছে মুসলমানের হাতে, মুসলমান বলেছে বাজাতে চাইলে বাজাও বাজনা মসজিদের সামনে, তুমি আমার ভাই।—কটা বছর কেটেছে তারপর? এ তো মোটে ছাব্বিশ সাল!

কালীনাথের সতেরোই তারিখটির একটা ইতিহাস ও তাৎপর্য্য আছে, শুধুই ডাকাতির পরিকল্পনা নয়।

আঠারোই লিটনের মৃত্যুতিথি, যার পুণ্য অথবা অনুরূপ স্মৃতিতে শহরের একাংশ লিটন টাউন নামে খ্যাত। লিটন নিহত হয় এক ছেলেমানুষের কাঁচা অপটু হাতের হোমমেড জবরজং অস্ত্রে। মসার বা রডা পিস্তলের গুলিতে নয়, চলনসই রকম বোমাতেও নয়, কলোরাপটাস অর্থাৎ পটাসিয়াম ক্লোরেট আর

মোমঝাল মিশিয়ে কালীপূজার রাত্রে ফাটাবার যে পটকা বানাবার বারুদ ছোট ছেলেরাও তৈরি করতে জানে, সেই বারুদে তৈরি দু'সের আড়াই সের ওজনের দেশী বোমায়। সরু পাটের দড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ানো বস্তুটি দেখে কারো কল্পনা করার সাধ্য ছিল না সেটা বোমা হওয়া সম্ভব, জগতে যখন ডিম্বাকৃতি ছোট কালো প্রচণ্ড বোমার আবিষ্কারও পুরানো হয়ে গেছে।

দুটি দিন নিদারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করে লিটন মরেছিল। তার হত্যাকারী ছোকরাটিও অবশ্য ওই বোমাতেই আহত হয়ে জেল-হাসপাতালে অনেক দিন ছটফটিয়ে বেঁচে উঠে তারপর ফাঁসি গেছে। কিন্তু অত অল্পে কি শোধ হয় লিটন সাহেবের মৃত্যুঋণ! ধরপাকড়, জেল, বিনা বিচারে আটক, নির্য্যাতন, এ সবেও নয়। সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ ভারত-প্রেমিক ম্যাজিস্ট্রেটের স্মৃতিকে সম্মান দেখাতে হয়েছে কালো শহরবাসীদের।

শহরের সেরা আধুনিক অংশকে লিটনের চিরস্থায়ী স্মৃতিতে পরিণত করে পরবর্ত্তী ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাণ্ডেল সন্তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু কার্লটনের মন ভরে নি। বিশেষত সারা দেশে, আর এই শহরে যখন আবার গোপন ষড়যন্ত্র ভয়ানকভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে অসহ্য স্পর্দ্ধায়! শহরের লোক তো লজ্জা দুঃখ ভয়ে কাতর হয়ে ক্ষমা ভিক্ষার তাগিদে স্বেচ্ছায় লিটন টাউনের নামকরণ করে নি, ও নাম চালু হয়েছে ব্যাণ্ডেলের প্রীতিপূর্ণ কঠোর বেসরকারী এবং স্বীকৃত সরকারী ভাষারই ঘোষণাতে। ও রকম সরকারী ভাবে নয়, বেসরকারী দেশী ভাবে দেশী লোকের উদ্যোগে দেশী লোকের চাঁদায় লিটনের জমকালো স্মৃতিরক্ষার জিদ কার্লটনের। শহরবাসীর অনুতাপের, প্রায়শ্চিত্তের, রাজদ্রোহীদের প্রতি তিরস্কারের রূপধরা প্রতীকের মত সে স্মৃতিসৌধ চিরদিন শহরের বুকে বিরাজ করবে।

তাই, লিটন মেমোরিয়েল ফণ্ডের যে কমিটি তা খাঁটি বেসরকারী, প্রেসিডেণ্ট থেকে সভ্যেরা সকলে নেটিভ, বেসরকারী নেটিভ। কার্লটন নিজে সাধারণ সভ্য পর্য্যন্ত নয় সে কমিটির। তবে দুঃখের বিষয় কোন দেশী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যেচে এক পয়সা চাঁদা দেয় নি ফণ্ডে, ত্রিশ হাজার টাকা যে উঠেছে তার প্রত্যেকটি পাই কার্লটনের খাতিরে দেওয়া। কার্লটন তা জানে, জেনে সে অসুখী নয়। এও তো জয়, এও তো প্রতিপত্তি, এও তো মর্য্যাদা।

প্রথমে ডেকেছিল ভৈরবকে, সে প্রেসিডেণ্ট হতে রাজী হয় নি। আগামী নির্ব্বাচনের অজুহাত তুলে পাঁচশো টাকা চাঁদা দিয়ে সরে গিয়েছিল। রাজী হয়েছিল ভুবন, ভৈরবের রায়বাহাদুরত্ব তার মাথা হেঁট করে রেখেছে অনেক দিন, আগামী বছর সেও রায় বাহাদুর হবে। কার্লটনও চেয়েছিল এরকম লোক, কমিটির সভ্যের তালিকাও তৈরি করেছিল সে, কার্লটন বললে ভুবন কমিটির মিটিং ডাকে, কার্লটন যে প্রস্তাব আর পরিকল্পনা দেয় তা পাশ করিয়ে দেয়, কার্লটনের সঙ্গে পরামর্শ করে চাঁদার জন্য বাছা লোককে সময় মত সুযোগ মত ধরে, কাজ এগিয়ে নেয়—কার্লটন কোনদিন কমিটি মিটিং-এ উপস্থিত হয় নি বা ভুবন ছাড়া কোন সভ্যের সঙ্গে ফণ্ড সম্পর্কে আলাপ করে নি। ম্যাজিস্ট্রেট কার্লটন নয়, শহরের এই বিশিষ্ট গণ্যমান্য ভদ্রলোক ক'জন লিটনের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করছেন।

আঠারোই লিটনের মৃত্যুতিথিতে, সকালে সাধারণ সভা ডেকে লিটন মেমোরিয়েল হলের ভিত্তি পত্তনের অনুষ্ঠান পালন করা হবে। ত্রিশ হাজার একাশী টাকা যে চাঁদা উঠেছে ফণ্ডে, সেই টাকা থরে থরে সাজানো থাকবে সভাপতির সামনে টেবিলের ওপর সকলের দর্শনীয় হয়ে। এটাও কার্লটনের আইডিয়া। টাকার অঙ্কটা সভায় ঘোষণা করলেই চলবে—ভুবনের এ প্রস্তাবে সে আপত্তি করেছে। সবটাই লোক দেখানো ব্যাপার, বাইরের ভুয়ো নাটকের ভুয়ো অভিনয়, দেশী লোকের কমিটি থেকে শুরু করে চাঁদা তোলা পর্যন্ত লিটনের স্বদেশী স্মৃতি-তর্পণের আগাগোড়া সমস্ত আয়োজনটাই, কার্লটনের তাই বোধ হয় স্তূপাকার টাকা দেখিয়ে নেটিভদের তাক্ লাগাবার শখ হয়েছে।

কার্লটন এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীরা সভায় যাবে কর্ত্তা হিসাবে নয়, অতিথি হিসাবে। এও অসাধারণ ঘটনা, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং উপস্থিত থাকতে সভায় প্রিজাইড করবে সাধারণ বেসরকারী লোক।

শুধুই কি নৈতিক প্রতিশোধ চায় কার্লটন, প্রকাশ্য ঘোষণা চায় যে টেররিস্টরা যাকে হত্যা করে, দেশের লোক তাকে দেয় শ্রদ্ধা সমবেদনার পূজা? তাই তার এত উদ্যোগ আয়োজন, শুধু এই কারণে? টেররিস্ট দমনের আন্তরিক উগ্র প্রতিজ্ঞা তো তার আছে, এদিকে তার সক্রিয় উৎসাহ আর

কার্য্যকরী পরামর্শ বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছে সর্ব্বোচ্চ স্তরে, এও কি তার সেই মনোবাসনারই অঙ্গ ? কার্লটন নিজেও বোধ হয় তা জানে না। তার ছাঁচে ঢালা অসীম আত্মসন্তুষ্টিতে পরিপুষ্ট মন এ ধরনের আত্মচিন্তায় নিজেকে বুঝতে চাওয়ার চেষ্টা করতেও জানে না। মাঝে মাঝে সে শুধু ভাবে ভবিষ্যতের কথা। উঁচুতে উঠিয়ে কলকাতায় তাকে নিয়ে যাবে গবর্ণমেণ্ট, স্থায়ী ভাবে নিয়ে যাবে, মফঃস্বলে জীবনের অভাবের জন্য তাকে ছেড়ে একা কলকাতায় বাস করার কষ্ট আর মার্জোরীর করতে হবে না। তার কলকাতার বাড়িতে তার ঘরে তার শয্যায় তার সঙ্গে মার্জোরীর রাত কাটবে। উচ্চপদ! খুশি মার্জোরী! বৃটেনকে সে ভালবাসে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের জন্য সে প্রাণ দিতে পারে। সেটা জানা কথাই।

সতেরোই মেমোরিয়েল ফণ্ডের টাকাটা ভুবন বাড়ীতে এনে রাখবে, টাকাটা দরকার হবে পরদিন সকাল আটটায়। এই টাকাটা রাতারাতি লুট করার ইচ্ছা কালীনাথদের। টাকার দরকার তো তাদের আছেই, এমন ডাকাতি করার উপযুক্ত টাকা আর কোথায় পাবে! কার্লটনকে জানিয়ে দেওয়া হবে অত্যাচারী বিদেশী হাকিমের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার বাস্তব প্রতিবাদও করে দেশের লোক।

ভুবনেরও হয়তো চৈতন্য হবে আশা করা যায়। দেশের লোকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টায় এতটা উৎসাহ হয়তো ভবিষ্যতে সে দেখাবে না।

সতেরোই তারিখ পিছিয়ে দেবার প্রশ্ন তাই নেই, ওই দিনই হয় ভুবনের বাড়ী চড়াও হবে, না হয় বাতিল করবে সমস্ত পরিকল্পনা আর আয়োজন।

সতেরোই তারিখ কি আবার পেছিয়ে দিতে হবে ? নেতাদের মধ্যে কথাটা উঠেছিল বেশ জোরের সঙ্গেই। সে এক স্মরণীয় বিতর্ক গোপন বৈঠকের পাঁচজনের পক্ষে, গভীরভাবে আত্মবোধ নাড়া খাওয়ার অভিজ্ঞতার মতই বহুদিন চারজনের মনের মধ্যে গাঁথা হয়েছিল। বেঁচে থাকলে পঞ্চম জনেরও মনের ভবিষ্যৎ আলোড়নে সেদিনের ওঠা ঢেউ-এর রেশ থেকে যেত সন্দেহ নেই। পনেরই বিকালে কলকাতা থেকে সেজদা আসে, অমিতাভ তখন প্রতিমার কাছে। এ বছর বীরেন সেনের এ শহরে আসা এই প্রথম, দলের অনেক

তরুণ সভ্যই সাক্ষাৎভাবে তাকে চেনে না। সেজদা বিদেশে গিয়েছিল জার্মানী ঘুরে আসবার চেষ্টায়, সম্ভব হলে বিপ্লবোত্তর অজানা অদ্ভুত রহস্যময় রাশিয়ায়। ইংলণ্ডে পা দেওয়া মাত্র তার পাসপোর্টটি পরীক্ষা ও ভুল সংশোধনের ছুতোয় রহস্যভাবে তলিয়ে গেল সরকারী দপ্তরে, এমন সব গুরুতর আর মারাত্মক সে সব ভুল যে ইণ্ডিয়ার দপ্তরের সঙ্গে লেখালেখি করে সংশোধন করতে দু'মাস কেটে গেল। তারপর মিলল শুধু সোজা দেশে ফেরার ছাড়পত্র। নির্দোষ কৃষিবিদ্যায় বিশেষ শিক্ষালাভের যে প্রকাশ্য ছুতো নিয়ে সে বেরিয়েছিল সেটা কিঞ্চিৎ জুটল আর লাভের মধ্যে হল কয়েকজন বিশেষ লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টায় পশ্চিমের গোপন সাহায্য সহযোগিতা-সহানুভূতির চেয়ে বাস্তবরূপে পাওয়া সম্ভব হবার আশা। সেটাও কম কি!

প্রতিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অমীমাংসিত সমস্যার ভারে বিব্রত বিচলিত অমিতাভকে এক রকম সটান আসতে হল বৈঠকে, খবর সে পেল পথেই।

কি ভাবে কেন নাড়া খেল সমাজ ধর্ম্মবিশ্বাস সংস্কারের চেতনা, অতীত ভবিষ্যতে সুদূরপ্রসারী সমস্যার ছায়াপাত ঘটল তারিখ পিছিয়ে দেবার তর্কে, তখন চিন্তা করার অবসর ছিল না। জীবনের বিচিত্র বিরাট আশ্রয়-ভিত্তির বিনাশ বিকাশ রূপান্তর ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যাকুল জিজ্ঞাসু হৃদয়মন আজও মানে খুঁজে খুঁজে চলেছে যে ভাবসংঘাতের, অন্য আলোচনা-প্রসঙ্গে তারই প্রায় অচেতন ভূমিকা অভিনয় করে গেল বিপ্লবী পাঁচজন মানুষ। দুজনের মত হল তারিখ পিছিয়ে দেওয়া। কেন? না, এত যখন দেরি হয়ে গেছেই, আরো কিছুদিন দেরি হোক। শহরের এই অবস্থায় অ্যাকসন স্থগিত করাই উচিত। এই কোথাও কিছু নেই হঠাৎ খাপছাড়া ব্যাপার ঘটে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে অ্যাকসনে, এর মধ্যে নিশ্চয় একটা নিগূঢ় ইঙ্গিত আছে, ঘটনাচক্রের পিছনের দুর্ব্বোধ্য কোন শক্তির নির্দ্দেশ আছে। তাদের সাবধান করে দেবার জন্যই হয়তো চামড়ার বস্তি পুড়েছে, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি হয়েছে!

ঠিক এমনি করে না বললেও মোটামুটি এই ছিল দুজনের যুক্তি। এদের দুজনের আগে যোগ ছিল পুরানো দিনের বিপ্লবী দলের সঙ্গে।

কালীনাথের মুখ বিদ্যুৎভরা মেঘের মত। তার চুপ করে থাকার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় সে রাগছে, ভয়ানক রাগছে।

মা কালীর পা ছুঁয়ে বোমা করতে নামি নি মেঘেন। সে যুগ নেই, পার হয়ে এসেছি, জগতে ঢের লোক বিপ্লব করেছে, মাকালী-ফাকালীর নামও তারা শোনে নি।

মানে কি হল? প্রশ্নটাও ক্রুদ্ধ।

জবাবটা হয় কটু।—মা কালীকে সেলাম ঠুকে এক সঙ্গে বোমা-সাধনা আর কুমারী-সাধনা আজকাল চলে না।

এটা বাড়াবাড়ি কালীনাথের, কুমারী-সাধনার কথাটা। কবে দু-একজন কে বিপ্লবের নামে মেয়ে নিয়ে মজেছিল সেটুকু ভেজাল প্রমাণই করে বিপ্লবীদের কঠোর নিষ্ঠার খাঁটিত্ব। নিয়মভাঙা বাধাহীন উগ্র তপস্যার যাযাবর জীবনে কবে একজন অসাধারণ যোগাযোগের বিহ্বল রাত্রে আত্মহারা হয়ে প্রমাণ করেছে সেরা বিপ্লবীও বাস্তব মানুষ, আগুনের রাস্তা ছেড়ে ভোগের রাস্তায় নেমে কে অতীত গৌরবের গল্পে মিশিয়েছে প্রেমের কাহিনী, সে অপরাধে বিপ্লবীদের অপবাদ দেওয়া হাস্যকর। কিন্তু ওটাই তো আসল কথা নয় কালীনাথের। তা হলে হয়তো আরও কটু আরও অশ্লীল ভাষাতেই অপবাদ দিত। কুমারী-সাধনা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, তাতে তন্ত্র মন্ত্র আছে, অধ্যাত্ম জগতের অতল অন্ধকার আর রহস্যের ঐতিহ্যে শব্দটা টোল টোল। বিশ্বাসের যত তফাৎ থাক্, পাঁচজন তারা জীবন-মরণ সমান করা জীবনবাদী। তাই কালীনাথের অন্যায় মন্তব্য নিয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কথা কাটাকাটি, ছোট নোংরা মানে ছেড়ে ওই আসল সংঘাতের দিকেই আলোচনা মোড় নেয়। সকল আদর্শ সকল বিশ্বাসের, জগতের ইতিহাসে সকল অকাতর আত্মদানের যা উৎস তাকে অস্বীকার করে কোন্ আদর্শ টিকবে, কোন্ বিশ্বাসের দৃঢ়তা আসবে?

সুরেন বলে, তাই যদি না হবে তবে একটা কথার জবাব দাও। মুসলমান নেই কেন আমাদের মধ্যে? কেন তারা আসে না? বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসে শওকতের মত ছেলে, কেন তার মন বিগড়ে যায়, আমাদের পথ ঠিক নয় বলে কেন সে মাথা ঘামাতে বসে রাশিয়ায় কি হচ্ছে, মার্কস লেনিন

কি বলেছে তাই নিয়ে? ওরা একদিন রাজা ছিল এদেশে, ওদের গা জ্বালা করে না কেন, ইংরেজ না তাড়িয়ে ঘুমোয় কি করে?

আপনি উল্টো পাল্টো কথা বলছেন, অমিতাভ বলে, গত আন্দোলনে ওরা যোগ দিয়েছে।

নিরামিষ আন্দোলন! কান্নাকাটি উপোস করার আন্দোলন! মেঘেন মুখ বাঁকায়।

এটা তাদের সকলেরই মনের কথা। আন্দোলনটার বিরাটত্বের জন্ম কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত মনে যে কিন্তু কিন্তু ভাবটুকু ছিল তাদের, তাও দ্রুত উপে যেতে আরম্ভ করেছে। বরং দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগার জন্য আন্দোলনটার বিরাটত্ব, আন্দোলনের ব্যর্থতা বিরুদ্ধ মনোভাবটাই উগ্র করে তুলেছে।

আমরা ওদের টানবার চেষ্টা করি না বলেই হয়তো ওরা আসে নি। আমরা হিন্দু ছেলেই দলে টানি—আমাদের কে টেনেছিল? শুধু আমাদেরই কেন মাথা ব্যথা? আমাদের ধর্মে, আমাদের সভ্যতায় এমন বিশেষ কিছু না যদি থাকবে এতকাল ধরে শুধু আমাদেরই বোমার দল হত না কালীনাথ।

এসব কথা তলিয়ে কেউ ভাবে নি, বুঝবার চেষ্টা করে নি কোন দিন। আজ কিনা তাদের সতেরোই তারিখের অনেক কষ্টের আয়োজন বাতিল হয়ে যেতে বসেছে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায়, আজ কিনা কথা উঠেছে বিপ্লবীর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের, আজ এই ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যটা রূঢ়ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে যে হিন্দু-মুসলমানের এ দেশটার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহের দল গড়ছে শুধু হিন্দু! কল্পনায় আর পরিকল্পনায় আছে অনেক কিছু, দেশের যে যুবশক্তির ব্যাপক বিদ্রোহের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ইংরেজের শাসন তার জাত ধর্ম্ম প্রদেশ থাকবে না, স্বাধীনতা আসবে না বিশেষভাবে এর জন্য অথবা ওর জন্য,—কিন্তু আগুন জ্বালাবার ভূমিকা তো শুধু তাদেরই দাঁড়িয়েছে। কেন এমন হয়? কি মানে এই অসঙ্গতির? অস্পষ্ট জিজ্ঞাসার অসীম গুরুত্ব অনুভব করে তাদের হৃদয় উতলা হয়, মনে হয় জীবন দিতে এগিয়েও অনেক কিছু ভাবা হয় নি। জীবন এত বৃহৎ, এমন ব্যাপক আর সামঞ্জস্য-বিরোধিতায় এত বেশী

দুর্ব্বোধ্য তার সমগ্র মূর্ত্তি যে তাদের মত দু-চার শ'র দু-চার হাজারের জীবন-পণ ব্রতপালন সেই বিস্তৃতিতে দু-চারটি ঢেউ ছাড়া কিছু নয়।

এ চিন্তা বড় ক্লেশকর তাদের পক্ষে। বৃহতের চিন্তা কেন উদ্বুদ্ধ করার বদলে হতাশা অবসাদ ঘনিয়ে আনে কে জানে!

মেঘেন যেন সুযোগ বুঝেই গোড়ার কথায় ফিরে আসে, মা কালীকে অত তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিও না কালীনাথ। সবই বুঝি, তবু সোজা কথাটা কি জানো, এমনি কথার কথায় একটা প্রতিজ্ঞা করায় আর গভীর রাত্রে নির্জ্জন মন্দির ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করায় তফাৎ আছে। মানুষ তো আমরা।

বীরেন বলে, থাকৃগে ওসব কথা, কাজের কথায় এসো। যা বুঝি না সে সব ইঙ্গিত সংকেত নয়, মুস্কিলটা কি, সব বানচাল হবে কিনা হিসাব করে দেখা যাক।

আমার হিসাব করা আছে। কালীনাথ বলে।

তার হিসাবে, অসুবিধা যা দাঁড়াচ্ছে তা আর কিছু নয়, টাইম ফ্যাক্টরের অসুবিধা, শহরে অফিসার ও সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা বেড়েছে, পুলিশ অনেক বেশী সতর্ক, খবর পেলেই ছুটে যাবার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত। সাধারণ অবস্থায় ভুবনের বাড়ীতে মাঝরাতে হানা দিতেই চারিদিকে সোরগোল উঠলেও, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিতে লোক ছুটে গেলেও, টাকাটা বাগিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ার যথেষ্ট সময় তারা পেত। এখন তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি পুলিশ এসে পড়বে। সৈদবাজারের মোড়ে যে আর্মড পুলিশের ঘাঁটি পড়েছে সমাদ্দারদের বাইরের দালানে, সেখানে আজ মোট এগারজন পুলিশ আছে খবর জেনেছে কালীনাথ, সতেরোই তারিখেও সম্ভবত মোটামুটি তাই থাকবে, ওই ঘাঁটিটাই সবচেয়ে কাছে ভুবনের বাড়ীর। তবে হৈ-চৈ হলেই শব্দ শুনে ছুটে আসবার মত কাছে নয়। তাদের বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ আর সোরগোলের অল্প যে আওয়াজ পৌঁছাবে, তাতে বড় জোর কান খাড়া করে থাকবে। বিশেষত ভুবনের বাড়ী যেখানে সে এলাকায় কোন হাঙ্গামা নেই, হাঙ্গামা হবার আশঙ্কাও কেউ করে না। তবে থানার চেয়ে ওদের খবর দেওয়া যাবে আগে, থানার পুলিশের চেয়ে ওরা এসে পড়তে পারবে কম সময়ের মধ্যে।

কাজেই তাদের নতুন সমস্যা শুধু এই যে সময় তারা পাবে কম। তা ছাড়া আর কোন বিশেষ মুশকিল ঘটে নি। বাড়ীতে চড়াও হয়ে যারা টাকাটা লুট করে কাজের শেষে পালাবে তাদের কিংবা টাকাটা নিয়ে যারা শহরের বাইরে সরে পড়বে তাদের পক্ষে শহরের যেদিকে হাঙ্গামা তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে হবে না। সেদিক দিয়ে কোন নতুন অসুবিধা সৃষ্টি হয় নি। তবে এরাও সময় পাবে আগের হিসাবের চেয়ে কম। সময়ের সমস্যাটাই গুরুতর।

তবে সেজন্য আটকাবে না, কালীনাথ সাবধানে হিসাব করে দেখছে, শুধু স্পিড তাদের বাড়াতে হবে খানিকটা, আগের পরিকল্পনাকে কঠোর নির্ম্মমভাবে সংশোধন করতে হবে একটু। যেমন, আগে যে ঠিক ছিল একেবারে চরম প্রয়োজন উপস্থিত না হলে কাউকে গুলি করা হবে না, ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখিয়ে বুঝিয়েই কাজ হাঁসিলের চেষ্টা করা হবে শেষ পর্যন্ত, এ নিয়ম বদলাতে হবে। কেউ বাধা দিলে অসুবিধা সৃষ্টি করলে একবার সাবধান করেই গুলি করা হবে, মেরে ফেলার জন্য অবশ্য নয়, জখম করতে। দারোয়ান জগজীবন সত্যই দুঃসাহসী বেপরোয়া লোক, একনলা বন্দুক নিয়ে সে খুব সম্ভব বীরত্ব দেখাবার চেষ্টা করবে, ওর সঙ্গে সময় নষ্ট করা চলবে না। ভুবনকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা যে আমরা দেশের জন্য টাকা তুলছি ভুবনবাবু, লিটনের স্মৃতিরক্ষার চেয়ে টাকাটার সদ্ব্যয় হবে, দরজা দিয়ে লাভ নেই—আমরা দরজা ভাঙব, সিন্দুকের চাবির মায়ায় কেন মরণ ডেকে আনছেন, চাবিটা দিন, এসব বিস্তারিত মার্জ্জিত ভদ্র পন্থা চলবে না। সংক্ষেপ করতে হবে সব।

পালানোর সময় সংক্ষেপ করার কথাও ভেবেছে কালীনাথ। ঠিক ছিল যে কাজের শেষে পাড়ার বাইরে থেকে গতিবিধি গোপন হয়ে হারিয়ে যাবে লোকের কাছে। কয়েকজন তলিয়ে যাবে শহরেই এদিক ওদিক, একটি ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করবে বিছানাপত্রের বাণ্ডিল নিয়ে, সেই গাড়ীতে কয়েকজন ঠিক বারোটা দশের গাড়ীটা ছাড়ার সময় স্টেশনে পৌছে সাধারণ যাত্রীর মত টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠবে। দুজন টাকার পুঁটলি নিয়ে গেঁয়ো লোকের বেশে অপেক্ষা করবে পলাশপুরের রাস্তায়, শেষ ট্রেনের যাত্রী নিয়ে যে বাস ছাড়বে স্টেশন থেকে সেই বাসে উঠে ঝাউতলার শাল-বনের ধারে নিতাইনী গাঁয়ের কাছে

নেমে যাবে। এখন এ অবস্থা চলবে না। কাল চুরি হবে শঙ্করের বাবার ফোর্ড গাড়ীটা, শঙ্করের সাহায্যেই হবে। ওটা চেনা গাড়ী তো বটেই, মোটর গাড়ীর চলাফেরার শব্দ লোকে শোনে, চেয়ে ছাখে এবং মনে রাখে বলে মোটরে চেপে হানা দেবার কথা পুরানো পরিকল্পনায় ছিল না। নতুন অবস্থায় মোটরে চেপেই হানা দিতে হবে। টাকা লুটে নিয়ে মোটরেই পালাতে হবে সকলের, এখানে ওখানে নির্জ্জন নির্দ্দিষ্টস্থানে একে ওকে নামিয়ে দিতে দিতে, যারা ডুব মারবে শহরের ঘরে ঘরে ছড়ানো জীবনে। টাকা নিয়ে তিনজন মোটরে যাবে ঝাউতলার বন পর্য্যন্ত, দুজন নেমে যাবে টাকা নিয়ে, একজন মোটর হাঁকিয়ে চলে যাবে রূপসা নদীর তীর পর্য্যন্ত। সেখানে মোটর গাড়ীটি ফেলে রেখে নৌকায় পাড়ি দেবে গোপনতায়।

রাত এগারটা পর্য্যন্ত আলোচনা হয়, কালীনাথের পরিকল্পনাই মেনে নেয় সকলে। রাত্রি বারোটা দশের গাড়ীতে বীরেন ফিরে যায় কলকাতায়। গায়ে ফতুয়া, কাঁধে চাদর, গলায় কণ্ঠি, হাতে ভাঙা ছাতা, বগলে কাঁথা জড়ানো পুঁটলি দেখে কে ভাবতে পারবে সে অল্পদিন আগে ইংলণ্ডে গিয়েছিল, বিলাত-ফেরত লোক!

একটা নিশ্বাস ফেলে কালীনাথ, একবার হাই তোলে। দেহের মনের কি খাটুনি তার যাচ্ছে বোঝা যেন যায় তাকে দেখে, কিন্তু সীমাহীন ধৈর্য্যের কাছে শ্রান্তি ক্লান্তিও তার হার মেনেছে, বিরক্তি বিতৃষ্ণার ছাপটুকুও নেই তার মুখে।

সে অমিতাভকে প্রশ্ন করে, কি হল ভাই?

আমি রেডি আছি কালীদা।—অমিত শান্ত কণ্ঠে বলে। তারও যেন জীবনের চরম দুর্দ্দশার সমস্যা সরল হয়ে গেছে গত কয়েক ঘণ্টার বৈপ্লবিক আলোচনায়।

কি ঠিক করলে?

আমি রেডি আছি।

বেশ, সায় দিয়ে বলে কালীনাথ, বেশ তো।

৩

অ্যাকসনের পরিকল্পনায় কালীনাথের ভুল ছিল না, কেবল একটা দিক থেকে সে হিসাব ধরে নি, ধরাটা সম্ভবও ছিল না। শহরে অশান্তি ও আতঙ্ক, এ অবস্থায় হঠাৎ কারো বাড়ীতে স্বদেশী ডাকাত পড়লে, পাড়ার লোকের প্রতিক্রিয়া যে সাধারণ অবস্থার চেয়ে অন্য রকম হতে পারে, তাদের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে, এটা খেয়ালে আসে নি। বাড়ীর সামনে কর্ত্তার দেওয়া মস্ত যাত্রার আসর পর্য্যন্ত বিনা প্রতিবাদে স্বদেশী ডাকাতদের মেনে নেয়, কর্ত্তার হা-হুতাশ বৃথা যায়, এই তাদের জানা ছিল। প্রথমে কিছু ডাকাডাকি চেঁচামেচি শুরু হতে পারে আশে পাশে, তারা কে টের পাওয়া মাত্র সব চুপ হয়ে যাবে, মনে হবে ভুবনের বাড়ী ছাড়া সমস্ত পাড়া আবার ঘুমিয়ে গেছে। এত বেশি হৈ চৈ হবে, এমন দলবদ্ধ প্রতিরোধ আসবে কাজ যখন অর্দ্ধেক এগিয়েছে, ছাদ থেকে ভারী বেঞ্চ ও তক্তাপোশ ফেলে গাড়ীর রাস্তা আটক করবে, ভোজালির খোঁচায় ফাঁসিয়ে দেবে গাড়ীর টায়ার, কালীনাথেরও তা ধারণাতীত ছিল। বার বার ঘোষণা শুনেও যেন ওরা বদ্ধমূল বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারে না, বুঝে উঠতে পারে না যে সত্য সত্যই কসাইপাড়ার মুসলমানরা হানা দেয় নি, তারা স্বদেশী বিপ্লবী, লিটন মেমোরিয়েলের কলঙ্ক থেকে শহরকে তারা বাঁচাতে এসেছে। সেটা আশ্চর্য্য কিছু নয়, অনেকগুলি মনের একটা ধারণা বদলে আর একটা ধারণা আনতে বিশৃঙ্খলা জাগে, সময় লাগে। তারা স্বদেশী বুঝেও যেন সকলে সংশয়ভরে ইতস্তত করে, ঠিক করে উঠতে পারে না কর্ত্তব্য কি! তারই মধ্যে সংকেত আসে পুলিসের আগমনের, প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে, টাকার বাণ্ডিল বাগিয়ে যখন ভেতর থেকে দলের লোক বেরিয়ে আসছে, বেঞ্চ চৌকি সরিয়ে পথ করা হচ্ছে গাড়ি চলার, তারা যে স্বদেশী এ বিষয়ে সংশয় ঘুচে যাওয়ায় যখন পাড়ার বাসিন্দাদের প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয় হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকায় পরিণত হয়েছে। শহরের এটা পুরনো অংশ, দোতলা তিনতলা পাকা বাড়ীর এলাকা হলেও রাস্তাটা সঙ্কীর্ণ।

ভাগ্যক্রমে পুলিস আসে গাড়ীর পিছন দিক থেকে, এ রাস্তায় গাড়ী ঘোরানো যেত না। পুলিস তফাতে থাকতেই এরা গুলি চালায়, বুটের আওয়াজ তুলে ছুটে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ায় পুলিসের দল, জবাব দেয়। সংঘর্ষ চলতে চলতে তারা আয়োজন শেষ করে পালাবার। একজন ফাঁসিয়ে দেয় পিছনের চাকার ভাল টায়ারটি, একটা ভাল আর একটা চুপসানো চাকার চেয়ে এ ভাবে গাড়ী ভাল চলবে।

দু'দিকের বাড়ীর রোয়াক বারান্দা দেয়াল ঘেঁষে গুলি চালাতে চালাতে পুলিস এসেছে বরাবর। ওদের হাতে রাইফেল, সংখ্যাও অনেক বেশি, এদের শুধু পিস্তল।

তিনজন আহত ও তিনজন সুস্থ ডাকাতকে নিয়ে ফাটা চাকার গাড়ীটা তারপর বিপজ্জনক বেগে এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় রাস্তায় এদিকের মোড়ে, কালীনাথের হুকুমে অন্য চারজন আগেই এদিকে দৌড়ে যেতে যেতে দু'দিকে গলি ঘুঁজিতে মিশিয়ে গিয়েছে। এদিকে একজন পুলিস হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকে রাধানাথের বাড়ীর রোয়াকে, আর একজন দু'হাতে পায়ের হাঁটু চেপে ধরে বসে কাতরায়। তার আঘাত গুরুতর নয়।

প্রতিমাকে দেখে আশ্চর্য্য হয় না কালীনাথ। এটা জানাই ছিল যে তাদের অনেক গোপন খবর প্রতিমা জানে, অস্ত্রশস্ত্র গোপন রাখার মত কাজে পর্য্যন্ত বাইরের যারা তাদের সাহায্য করে তারাও যে সব বিষয়ের হদিস পায় না। পুরানো নীতি বাতিল করে প্রতিমাকে দলে নেওয়া নিয়ে দলের মধ্যে অনেক আলোচনা, অনেক তর্ক হয়ে গেছে।

প্রতিমার মুখ কঠিন, ব্যথা-কাতরতার ছাপ সে মুখে নেই দেখে স্বস্তি বোধ করে কালীনাথ।

শেষরাতে না এসে সকালে এলেই হত!

তুমি থাকো কি না থাকো।

মুখ কঠিন হোক, প্রতিমার গলা বেশ ভারি।

আমার সঙ্গে তোমাদের এরকম করা অন্যায় ছোটমামা। শঙ্কর কিছুতে

বলবে না অমিতকে কোথায় রেখেছ, রাত দুটো পর্য্যন্ত সাধলাম। তুমি না বললে সে বলতে পারবে না। তুমি কোথায় আছ তাও বলবে না। শেষকালে যখন বললাম তোমার খবর না দিলে সোজা থানায় গিয়ে যা জানি সব প্রকাশ করে সুইসাইড করব, তখন জানাল। এসব কি ছোটমামা? আমি কি তোমাদের পর? তোমাদের বুদ্ধি বিবেচনা কিছু নেই! যাকে বিশ্বাস করতেই হবে জানো তাকেও অবিশ্বাস কর। কি লুকানো আছে আমার কাছে?

শঙ্করের দোষ নেই। আমিই বারণ করেছিলাম, দু-চারদিন তোকে যেন কিছু না জানায়। ক'দিন পরে সব কিছুই তুই জানতে পেতিস পিতু।

মৃদুস্বরে ভীরুর মত কথা বলে কালীনাথ, প্রতিমার মুখের দিকে তাকায় না, সে যেন পিস্তল বাগিয়ে রাইফেলের সঙ্গে লড়াই করা শক্ত কঠোর মানুষটি নয়। হৃদয়মনের এ কোমলতা তার কেন আছে কি করে থাকে কালীনাথ জানে না। বিপন্ন বিচলিত হয়ে থাকে। কি করে এখন যে মেয়েটাকে জানায়, জগতের সব বীরত্ব সব পৌরুষের পালা শেষ হয়ে গিয়ে যখন শেষ রাতটা মড়ার মত নিঝুম হয়েছে, স্পষ্ট শুধু অনুভব করা যাচ্ছে প্রতিমার বুকের ধুকধুকানি।

ক'দিন পরে কেন ছোটমামা?

এ অসহ্য হয়ে ওঠে কালীনাথের। তাই যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে অল্পে অল্পে সইয়ে সইয়ে বলবে ঠিক করেও আগুয়ান পুলিসদের লক্ষ্য করে যেমন দ্বিধামাত্র না করে আচমকা বুলেট ছুঁড়েছিল, তেমনি সাদামাটা বাস্তব ঘোষণার মত সে সোজাসুজি খবরটা বলে বসে, অমিত মারা গেছে।

বলে যেন বাঁচে। নিজেকে ফিরে পায়। এই ভাল। এমনি করে বলাই উচিত হয়েছে, একটা মরণের খবর জানাতে সে-ই বা কেন বিব্রত হবে, খবর শুনে প্রতিমাই বা কেন ব্যাকুল হবে?

প্রতিমা ব্যাকুল হয় নিশ্চয়, তবে তার ব্যাকুলতা দিয়ে মোটেই বিব্রত করে না কালীনাথকে। বরং পাথরের মূর্ত্তির মত অনড় অচল হয়ে বসে থাকার জন্যই কালীনাথ বিব্রত বোধ করে বেশি।

কোথায় আছে ? শেষে এই প্রশ্ন করে প্রতিমা।

তা জেনে কি করবি ? টাউনে নয়।

একবার দেখব।

কে তোমাকে এখন নিয়ে যাবে ? কি করে নিয়ে যাব পাঁচ মাইল রাস্তা ? তাকে নিরস্ত করার জন্যই বুঝি কঠোর ভাবে কথা বলে কালীনাথ।

তোমায় নিয়ে যেতে হবে না। কোথায় রেখেছ দয়া করে বলো, আমি নিজেই যেতে পারব ছোটমামা। আরও কঠোরভাবে জবাব দেয় প্রতিমা।

শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে আসছিল কালীনাথের শরীর, কিন্তু প্রতিমাকেও আর না বলা চলে না। ভেবে চিন্তে তাকে সে পুরুষের বেশ ধরতে বলে, ভোররাত্রে এতবড় মেয়েকে রডে বসিয়ে সে পাঁচ মাইল সাইকেল চালাতে পারবে না। কালীনাথ ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়, ধুতি শার্ট আর একটা কোট দিয়ে যায়। বুক বাঁধার জন্য গামছাটা প্রতিমা নিজেই পেড়ে নেয় দড়ি থেকে, নির্জন ঘরে বসে ওই গামছাটা দিয়েই প্রথমে শুকনো চোখ দুটো কয়েকবার ঘষে নিয়ে যত জোরে পারে বুক বেঁধে নেয়। ভেতর থেকে যত কিছু অসহ্য চাপ দিচ্ছিল তাও যেন সে বাইরে চেপে গামছা বেঁধে ঠেকিয়ে রাখবে, বুকটা যাতে বোমার মত না ফেটে যায়।

নয়

১

এইভাবে মৃত অমিতকে দেখতে গেল প্রতিমা। শালবন ঘেঁষা গাঁয়ের প্রায় বনের মধ্যে গ্রাস করা অংশটুকুর মাটির ঘরটিতে পাকা এবং আরও কয়েকজন উপস্থিত ছিল। দলের লোক ও দলের বন্ধু। পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় শহরের অনেক বিশ্বাসযোগ্য বন্ধুর সাহায্য কালীনাথদের নিতে হয়েছে। পাকা বাদ পড়ে নি।

দলের ভিতরকার খবরাখবর পাকা মোটামুটি বরাবরই জানে। একটু তফাৎ থেকে দলের কার্য্যকলাপ কিছু কিছু লক্ষ্য করা, একে ওকে সতর্কভাবে অনুসরণ করা এসব রোমাঞ্চের লোভ সে সামলাতে পারে নি। তার শুধু জানা ছিল না যে তার এই গোপন গতিবিধি কালীনাথদের কাছে মোটেই গোপন নেই, আটুলিগাঁর জঙ্গলে গাড়ীর স্টীয়ারিং হুইলে তাদের সাবধান করে বেনামী স্লিপটি কে লিখেছিল তাও নয়। তার এই আগ্রহ ও কৌতূহল লক্ষ্য করে তাকে আর একটা সুযোগ দেবার কথাও কালীনাথ ভাবছিল।

পাকাও সারারাত জেগেছে কিন্তু তার চোখে ঘুম ছিল না। এ অবস্থায় ঘুম থাকার কথাও নয়। কিন্তু ভিতরের আলোড়ন আর কষ্টটা তার অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। এমন গৌরবময় মহান মরণকে সরকারী বন্দুকের গুলি কি কুৎসিত করে এঁকে দিয়েছে অমিতাভের সুশ্রী মুখখানার বিকৃতিতে তা চোখে দেখার পর থেকে তীব্র ক্ষোভের জ্বালা তাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। এ তার অবুঝ ছেলে-মানুষী ক্রোধ নয় যে, মানুষ যুদ্ধে মরলেও তার অমিতদা'র মুখশ্রীর কেন হানি হবে, মৃত্যুর এই বাহ্য রূপের মধ্যে তার কাছে স্পষ্ট হয়েছে এভাবে প্রাণ দিতে বাধ্য হওয়াটা কি অসহ্য অন্যায়, এই অকথ্য অনিয়ম! একদিকে বিদেশী দানবের কুৎসিত জবরদস্তি, অন্য দিকে সারা দেশটার তাই মেনে নেবার

কলঙ্ক। দেশের বিরুদ্ধেই আজ পাকার জ্বালাটা বেশি, কত দূর তারা অপদার্থ, এভাবে যাদের জাগাতে হয়! পাকার শোকাতুর হবার অবকাশ নেই, কার জন্য কিসের জন্য শোক সে জানে না, হয়তো সংসারের সাধারণ জীবনে আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যে মাঝে মাঝে নিজেকে একা বোধ করার যে অসহ্য উদাস বেদনা অনুভব করে সেই রকম কোন অবসরে অমিতদা'র কথা ভেবে কান্না আসবে। কি যেন এক সংশয় আর হতাশা এখন তাকে কাবু করেছে। অমিতাভকে দেখে যত তার মনে হয় এমন চরম অন্যায় এমন পাশবিক হত্যা জগতে আর ঘটে নি, যত তীব্র হয়ে ওঠে তার ক্ষোভ আর আক্রোশ, কেমন এক অসহায়তা বোধ করার কষ্ট তত বেশি উগ্র হয়ে উঠে তাকে আত্মহারা করে দিতে চায়।

এইটুকু সে টের পায় আর এটা তার কাছে অদ্ভুত লাগে যে এ সমস্ত ঘটনা, ষড়যন্ত্র আয়োজন সংঘর্ষ মৃত্যু, এসবের সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রতা তাকে পীড়ন করছে। তার অসন্তুষ্ট মন আরও বিরাট আর ব্যাপক লড়াই-এর অভাবে হাহাকার করছে। একজন অমিতাভ আর একটা পুলিসের মরণ নয়, এমন একটা লড়াই যাতে একটা পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

ওরকম লড়াই হলে তার পক্ষটা যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাতেও পাকার আপত্তি নেই। সেও তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর সবার সঙ্গে!

মনের এই অবস্থায় পুরুষবেশী প্রতিমাকে দেখে পাকার যেন চমক ভাঙার মত চমক লাগে। আশ্চর্য্য অভিভূত হয়ে সে বিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকে প্রতিমার দিকে। খানিকক্ষণ সে যেন বুঝেই উঠতে পারে না অনেক দিনের জানা চেনা প্রতিমার আবির্ভাবকে। অবাস্তব কল্পনার যে উগ্র স্তরে উঠেছিল তার কিশোর চেতনা, সেই স্তরের আর একটা স্বপ্ন যেন বাস্তব রূপ ধরে এসে তার চেতনাকে গ্রাস করেছে।

একসঙ্গে মেকি আত্মীয়তা, পচা ভদ্রতা, মার্জ্জিত ঝলমল কুরুচি আর দেশের পরাধীনতার বিরুদ্ধে অবাধ্য খেয়ালে বিদ্রোহ করে আসা অস্থির ছেলেমানুষী মন!—এ মন সব পারে, এ মনের সব সহ্য হয়।

তবে কি না, সাধারণ বেশে এলেও প্রতিমার এই অভিসারের গভীর

শোকাবহ দিকটা তার কাছে মামুলী মনে হত। মানুষকে মরতে দেখে তার কান্না পায়, যন্ত্রণা দেখে তার বুক টন টন করে, মৃতের জন্য শোক তার ধাতে নেই। তার মায়ের মরণ হয়তো জগতের চরম ও শেষ মৃত্যুর মত পরবর্ত্তী সমস্ত মরণকে তার কাছে অর্থহীন করে দিয়েছে।

নিজের বিপরীত অভিমানে গড়া নিদারুণ এক আত্মিক নির্য্যাতনের কবল থেকে মুক্তির স্বাদে সে এক অপরূপ সুস্থতা বোধ করে নতুবা এই পরিবেশে প্রতিমা যখন অপলক চোখে অমিতাভকে দেখছে তখন এভাবে তার দিকে চেয়ে থাকা অশ্লীল হয়ে দাঁড়াত। অন্দরে ড্রয়িংরুমে বা প্রকৃতির রোমান্স-ময় লীলাভূমিতে কোথাও ভদ্র সমাজের ভালমন্দ সরল-চালাক কোন মেয়েকে পাকা কখনো ভাল চোখে দেখতে পারে না, ওরা সবাই ন্যাকামি আর হীন ছলনা চাতুরীতে ভরা কদর্য্য, কুৎসিত ওদের হৃদয়মন। ওদের ভাবালু চোখ, মিহি কথা, কোমলতা, হাবভাব সব কিছু মুখোশ, সমস্ত ভাণ। ভাবকল্পনার মানেই শুধু বোঝে না তা নয়, মনে মনে হাসে। ওদের ভেতরটা ফাঁকা, বাইরেটা ফাঁকি। ফুলের মত বা পরীর মত সুন্দরী ভদ্র মেয়েদের মধ্যে পাকা চেয়ে দেখার বা তারিফ করার মত রূপ খুঁজে পায় না, সাজগোজ আর স্বভাবের ন্যাকামির মত এ রূপলাবণ্যও তার বিতৃষ্ণা জাগায়।

রুক্ষ মলিন ফুল, চাঁপা, বেঙিরা বরং তবু চেয়ে দেখার মত, ওরা তবু মনে তার একটু প্রীতি ও কামনার তাপ আনতে পারে।

কিন্তু আসলে সে তো আর সত্য নয়। ভদ্র জীবনের বিজাতীয় আত্ম-বিরোধিতা থেকে মুক্তিলাভের ছটফটানি অত সরস প্রক্রিয়া নয় যে ভদ্র জীবনকে সোজাসুজি ঘৃণা করে অভদ্র অসভ্য জীবনকে ভালবেসে ফেললাম। এক মিথ্যাকে অস্বীকার করতে অন্য মিথ্যা আসে, এক বিকার বর্জ্জন করতে অন্য বিকার প্রশ্রয় পায়। মোহই যদি না থাকবে পাকার বাবু-মেয়েদের জন্য, এত তার রাগ কিসের, এমন গায়ে পড়া জ্বালাবোধ? এদের নিয়ে গড়ে তোলা বাবু-ধর্ম্মী কাব্য-কল্পনার নির্য্যাস থেকেই যদি তারও অপার্থিব মানসী না সৃষ্টি হয়ে থাকবে, এরা কি আর কিসের মত নয় বলে কেন তার এত জ্বালা, আপসোস, অভিমান? নতুন মামীর আদর-যত্নের আবেগ-ব্যাকুলতা কি

করে তাহলে আকর্ষণ-বিরাগের জটিল আবর্ত্ত সৃষ্টি করে, মনের মধ্যে থাকে এক নতুন মামী, তাকে নিয়ে একা একা অবাধ স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে বিভোর হয়ে যাওয়া চলে, বাইরের নতুন মামী সামনে এলে টের পাওয়া যায় এ একেবারে অন্য মানুষ।

এ বিকার ছাড়া কিছু নয়। পাকার এইটুকু বয়সে অনেক অস্থিরতা, অশান্তি বিরোধ, অনেক ক্ষ্যাপামি অন্যায় আচরণ নতুবা অর্থহীন হয়ে যেত। পাকার জগতের কোন ছেলে কম-বেশি এ বিকার থেকে মুক্তি পায় না। কেউ মানিয়ে নেয় আপস আর আত্মসমর্পণে, কারো বিকার চাপা থাকে অন্য জগতের সংস্পর্শে না আসায়, শান্তশিষ্ট নিরীহ হয়ে থাকে নৈতিক আত্মপ্রবঞ্চনা আর দুমুখো জীবনের নিয়ম-অনিয়ম সব মেনে নিয়ে। শুধু পাকার মত পেট ভরে যত খুশি দুধ-খাওয়া-জীবনীশক্তি শাসনের যাঁতায় মুষড়ে না গিয়ে পরিণত হতে পারে তেজে, অবাধ বিচরণের অভিজ্ঞতায় তুলনামূলক বাস্তব বিচারবুদ্ধি, আর আদরে প্রশ্রয়ে গড়া একগুঁয়েমি থেকে হয় বিদ্রোহের সূত্রপাত, তাদের মধ্যেই উৎকট হয়ে প্রকাশ পায় এই ভাবগত বিকার।

যা চাই যেমন চাই তা-ই আমার পাওয়া চাই, সব কিছু গণ্ডগোলের মূল তো শুধু এই। আঁতুড় থেকে জীবন তাকে শিখিয়েছে অসম্ভব স্বপ্নকল্পনাও জীবনেরই অংশ, আকাশের ওই চাঁদকে হাতে পাওয়া যায়। এ শিক্ষা যাতে বিভ্রাট না ঘটায় সেজন্য তাই দরকার হয় ছেলেমেয়ের গড়ে ওঠার এত নিয়ন্ত্রণ, এত নৈতিক শিক্ষাদীক্ষার সমারোহ। চোখের সামনে দেখা যায় এসব ছাড়াই চাষাভূষোর ছেলেমেয়ে চিরদিন ঢের বেশি নীতিপরায়ণ হয়ে আসছে, তবু। দাবি করতে শিখেই ভদ্র ছেলেরা স্বভাবতই চাঁদকে চেয়ে বসে হাতের মুঠোয় কিন্তু ইতিমধ্যে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়াও শুরু হয়ে গেছে তাদের শিক্ষা যে না পেয়েও পেয়েছি ভেবে কিভাবে নিজেকে ঠকাতে হয়। চাঁদ না পেয়ে তাই শুধু আসে হতাশা আর বিষাদ, শুধু বিবর্ণ হয়ে যেতে থাকে জীবনটা বাস্তব রঙের অভাবে, ব্যর্থতার বেদনাকে রাঙাতে খরচ হয়ে হয়ে সাদাটে হয়ে যায় সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ জগৎটুকু। কিন্তু যে ছেলে মোটামুটি এড়িয়ে গেছে ওই নিয়ন্ত্রণ আর নৈতিক গড়নের প্রক্রিয়া,

সে কেন মানবে চাঁদকে না-পাওয়ার পরাজয়, জ্যোৎস্না দিয়ে ক্ষতিপূরণের ধাপ্পা! স্বপ্নকে সে চেয়েই যাবে বাস্তব পাওয়ার মধ্যে তার জন্মগত দাবির মত, না পেয়ে বেড়েই যাবে তার রাগ অভিমানের জ্বালা, ভেঙে সে চুরমার করে দিতে চাইবে তার জগৎকে আঘাত হেনে হেনে।

কেন্দ্র সে নিজেই, সমালোচনা বিদ্রোহ আর মুক্তি কামনার। অন্য এক জগতে, বাস্তব জগতে মুক্তি খোঁজার মধ্যেও তার আত্মগত অনেক বিরোধ।

এটা না হয় হল যে ভদ্র মানুষের প্রকাশ্য আর অপ্রকাশ্য জীবনের উৎকট পার্থক্য, বাড়ী-ঘর আসবাব-পত্র সাজ-পোষাক খাওয়া-দাওয়া আনন্দ-উৎসব সামাজিকতার রঙ আলো রূপ শোভা বুদ্ধি ও মাধুর্য্যের শোভন সুন্দর উপস্থিত সমারোহের সঙ্গে সঙ্গে কদর্য্য কুৎসিত হিংসা দ্বেষ হীনতা দীনতা স্বার্থপরতা নির্ম্মমতার সমাবেশ, সুখ শান্তি হাসি আনন্দের আবরণের নীচে অতল গভীর দুঃখ বেদনা হতাশার অভিশাপ—সব কিছু মিলে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল তাদের কাছে যাদের জীবনযাপনে বা হৃদয়মনে অন্দর-বাহির নেই। কিন্তু অন্দর-বাহির একাকার হওয়াটাই তো সব নয় তার কাছে, আত্মবিরোধিতা কম হলেই তো নোংরা নিঃস্ব বঞ্চিত ব্যাহত জীবন সুন্দর সার্থক জীবন হয়ে ওঠে না।

এ জগতে আশ্রয় আর ও জগতে মুক্তি, এর মধ্যে না আছে আশ্রয় না আছে মুক্তি। এ অমিলের সামঞ্জস্য খোঁজার মত মারাত্মক কিছু নেই। এ জীবনে সীমাবদ্ধ হয়ে মনের খিদে আর ও জীবনে সীমাবদ্ধ হয়ে পেটের খিদে তবু সয়, ভরা পেটের মনের খিদে কি করে মেটাবে পেটের খিদেয় ভরা জীবনের মন! তাই, দুটো জগৎ সে আত্মসাৎ করতে চায় তার চেতনায়। সযত্ন প্রসাধনে ও বেনারসীর আবরণে গৌরাঙ্গী নতুন মামী আর তাড়ির নেশায় আলুথালু ছেঁড়া গামছার বেড়ির টানাটানিতে নানা বিপর্য্যয় ঘটবেই। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব খৃষ্টান সহজিয়ার মেশালে হবে ভাবরাজ্যের আবর্ত্ত, পাক খাবে মাঝি চাষী কেরানী ব্যারিস্টার কামার চামারের মেয়ে-বৌ থেকে বাজারের রহস্যময়ী বেশ্যাকে ঘিরে, বছর ষোল বয়স হতে হতে!

এসব পাকারই জীবনের এক পরবর্ত্তী অধ্যায়ের চিন্তা। এ দিনটির অভিজ্ঞতা

বারংবার ঘুরে ঘুরে তার মনে পড়েছে বরাবর। দুটি বিশেষ কারণে অমিতাভের মৃতদেহের সামনে বসে গভীর হতাশার সঙ্গে জীবনে প্রথম এক অদ্ভুত অসহায়তা বোধ করে উতলা হওয়া আর ধুতি ও শার্ট কোট পরা মাথায় পাগড়ী বাঁধা প্রতিমাকে দেখে সমস্ত দেহে মনে মনোরম এক উত্তাপের সঞ্চারে উষ্ণ ও আনন্দিত হওয়া।

২

দেখা-শোনা সেবা-যত্নে যা-কিছু করার করছে শ্যামল জানার পাতানো পিসী। বয়সে সে শ্যামলের সমান হবে। কাল থেকে পিসী অবিরাম বিড় বিড় করে বকেছে আপন মনে, কাপের পর কাপ চা তৈরি করে দিয়ে মাছ তরকারী রেঁধে বেড়ে খাইয়েছে। হাসপাতাল হয়েছে বাড়ীতে, খুনে ডাকাত কুটুম এসে ভিড় করেছে খুনেটার ঘরে। পুলিস এবার ধরে নিয়ে পিসীকে নিশ্চয় ফাঁসি দেবে। কিন্তু এতদিনের নিয়ম ভঙ্গ করে পিসী কাল সন্ধ্যা হতে বাড়ী যায় নি। ভোর ভোর এসেছিল কাল পিসী, প্রায় রাত থাকতে। কাসতে কাঁসতে আগের দিন একটু বেশি কাবু হয়ে পড়েছিল শ্যামল।

শ্যামলকে বিছানায় শুইয়ে খানিকক্ষণ গোমড়া মুখে তাকিয়েছিল। তারপর নিজেই বলেছিল, না, আমি রইব নি। করব কি রয়ে? কেসে কেসে মরো নয়তো বাঁচো যদি মরণ ঠেকাতে পারব? মোর বাপু বেতো ব্যারাম।

শ্যামল কেসে কেসে রাতারাতি মরছে না বেঁচে আছে জানতে বুঝি সকাল হওয়ার তর সয় নি পিসীর। এসে রাতারাতি বাড়ীতে ব্যাণ্ডেজবাঁধা কেষ্ট ও অমিতাভ এবং আরও তিনজন অতিথির সমাগম হয়েছে দেখে তার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। আর ঠাণ্ডা হয় নি।

সন্ধ্যার পর শ্যামলের মৃত স্তিমিত চোখে নতুন প্রাণের দীপ্তি দেখে বলেছিল, ফুর্তি কিসের শুনি? খুনে ডাকাত কুটুম সাঙাৎ পেয়ে? এ মায়ের বাছাটার যে জ্ঞান হল না খেয়াল আছে? রেতে রইতে হবে তো মোকে? রইব না, মোর গরজ নেই!

কিন্তু পিসী রয়েছিল। নিজের গরজে।

পিসী চা এনে দেয়। প্রতিমার বেশ তার চোখে পড়ে না। কেউ কাঁদছে না দেখে তার অসহ্য ঠেকে। কেন, আপনজন কি কেউ আসে নি যে ছেলেটার জন্য একটু কাঁদে, এমন বেঘোরে বেকায়দায় যে ছেলেটা মারা গেল? এসব বাবু বোঝে না সে, সজল চোখে পিসী জানায়। ইংরেজ-রাজ সবাইকে নিত্যি চোখের জলে ভাসায় বলে ইংরেজ মারতে খুনে হয়েছে, তাই বলে কি আপনার লোক মরলে পরেও চোখের জল ফেলা বারণ! বীরত্ব করে কেউ মরেছে বলে কাঁদতে পাবে না তার আপনজন!

মরে নি পিসী, এ ছেলেরা মরে না। মরলে পরে তুদিন কেঁদে ভুলে যেত, এ ছেলেকে কেউ কোন দিন ভুলবে না। এখানে তীর্থ হবে, দূর থেকে লোক ভিড় করে দেখতে আসবে।

শ্যামল বলে কথাটা। ভাবাবেগের সঙ্গেই বলে, কারণ জেলে জেলে আর আন্দামানে জীবনের সঙ্গে তার ভাবপ্রবণতাটাই সব চেয়ে বেশি ক্ষয় হয়ে গেছে। শক্তি থাকলে সে আকুল হয়ে কাঁদত, কারণ কান্নায় তার তুর্ব্বলতার লজ্জা নেই, হৃদয়কে দমন করার কঠোর সংযমের প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে।

তবে তার কথায় সবার রাঙাটে চোখগুলি জলে ভরে যায়, কালীনাথের চোখ পর্য্যন্ত। প্রতিমার গাল বেয়ে ধারা নামে। বোঝা যায় গেঁয়ো পিসীর মূল্যবিচার অভ্রান্ত, খুনে বিপ্লবীদেরও একটা দিক নরম থাকে, মানুষ থেকে গিয়ে যা কঠিন করা অসম্ভব।

এটা যেন পাকার জিদের জয়।—সে ভাবে, হুঁঃ, নইলে তোমাদের এত কড়াকড়ি কি জন্যে শুনি কালীদা? আমার তোমরা নাম কেটে দাও। আমার মনের জোর নেই।

এখনও পাকা জানে না কালীনাথ তাকে আর একটা সুযোগ দেবার কথা ভাবছে।

কেষ্ট বলে, ক্যামেরাটা আনতে যদি তোর খেয়াল হত পাকা!

পাকা বলে, এখানে জোগাড় করা যায়।

সে কালীনাথের দিকে তাকায়। কালীনাথ মাথা নেড়ে বলে, না, ক্যামেরা দরকার নেই।

সাইকেলে গিয়েও আনতে পারি আমারটা।

না। সোজা টাউনে ফিরে যাবে, এদিকে আর আসবার দরকার নেই।

বেলা বাড়লে কালীনাথ শান্ত শক্ত স্বরে বলে, পিতু, এবার যেতে হবে। পাকা, তুমিও পিতুর সঙ্গে যাও। হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় এগারটার বাস ধরবে। সাইকেল থাক্।

প্রতিমা বলে, যাই মামা, কিন্তু—

কিন্তু কেন আবার?

পলকহীন চোখে তাকিয়ে অমিতাভের দেহটা দেখিয়ে বলে—কি করবে?

যদ্দিন পারা যায় গোপন রাখতে হবে পিতু। অমিত কলকাতায় ফিরে গেছে।

বুঝলাম। কি করবে বল না?

বনে লুকিয়ে ফেলা হবে, মাটির নীচে।

ঘড়ি দেখে কালীনাথ আবার বলে, দেরি কোরো না, বাস চলে যাবে।

পিসী বলে, রোসো, ওরা খেয়ে যাবে।

বাস পাবে না।

পাবে পাবে, দুকুরের বাস পাবে। ছিষ্টি উল্টে যাবে না ওরা দুকুরের বাসে গেলে। অত তুমি হুকুম ঝেড়ো না বাপু!

শাড়ীটা মাথায় পাগড়ী করে এনেছিল, প্রতিমা বেশ বদলায়। পিসীর রাঁধা ডাল-তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে দুপুরবেলা বনের একটু ঘুর পথে বড় রাস্তার দিকে চলতে চলতে পাকা হঠাৎ বলে বসে, তোমায় সুন্দর দেখাচ্ছিল পিতুদি, অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

প্রতিমা ছিল আনমনা।—কি বললে?

না, কিছু বলি নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে আবার বলে, বলছিলাম কি, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না পিতুদি। এতে কি হবে? এসব করে?

কিসে ? ও! এখন ওসব তর্ক থাক্ পাকা।

তর্ক নয়, কালীদা যে বলে জেনে শুনে দশজনে জাগবে, পথ পাবে। সবাই বিদ্রোহ করবে কিন্তু লোকে তো কিছু জানতেই পারছে না। অমিতদা প্রাণ দিল, সেটাও গোপন রাখতে হবে।

এসব কথা থাক্ পাকা। গোপন কিছু থাকবে না, গোপন কি থাকে ?

তার এই কথাকে প্রমাণ করার জন্যই যেন পুলিস তাদের ঠেকাল। স্টেশনে বাস থেকে নেমে দুজনে তারা একটা ছ্যাকড়া গাড়ী ভাড়া করে উঠে বসেছে, হাড়-বের-করা রুগ্ন ঘোড়া দুটো চাবুক খেয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় গাড়ীটা টানতে শুরু করেছে, একসঙ্গে দুদিকের পাদানিতে উঠে দাঁড়াল দুজন লোক, রিভলবার বাগিয়ে। সঙ্গে তাদের আট-দশ জন পুলিস, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা ঘিরে ফেলেছে।

এরকম জবরদস্ত বাহিনী ছাড়া একটা ছেলে আর মেয়েকে ওরা ধরতে পারে না, এমনি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে ওদের কাছে টেররিস্টরা।

শুধু পাকাকে ওরা চাইছিল, পাকার সঙ্গে থাকায় প্রতিমাকে ধরেছে। পাকাকে পুলিসের দরকার হয়েছিল বিশেষ কারণে, ফাঁসিতে লটকাবার জন্য নয়। পাকা দলের ভেতরে নেই, হাতে নাতে কার্য্যকলাপে যোগও দেয় না, অথচ সে অনেক খবর রাখে—এটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল পুলিসের। পাকার মত খামখেয়ালী ছেলের কাছ্ থেকে সহজে খবর আদায় করা যাবে এ রকম একটা ধারণাও তাদের হয়েছে। এটা হয়েছে রায় বাহাদুর এন, এন, ঘোষাল গত বার কলকাতা ফেরার সময়। পাকার ওপর একটু নজর রাখতে বলে যাবার ফলে। পাকার এলোমেলো খাপছাড়া চাল চলন তাদের নজরে পড়েছে।

এটা যে পাকার নিজস্ব ব্যক্তিগত দিক, গঙ্গা কামারের কামারশালায় দু-চার ঘণ্টা বসে থাকা, টো টো শহরে পাক দেওয়া, দুপুর রাতে চামার বস্তিতে আড্ডা দেওয়া বা নির্জ্জন প্রান্তরে ঝরনার ধারে বসে কাব্য করার সঙ্গে স্বদেশী দলের ভেতরের খবর জানার কোন সম্পর্ক নেই, এটা জানা ছিল না পুলিসের। সত্য কথা বলতে কি, স্বদেশী দলের বোমা তৈরি-টৈরির মত দু-একটা কাজ ছাড়া সব কিছু যে কত দূর সাধারণ আর স্বাভাবিক ভাবে চলে, সে ধারণাই তাদের

ছিল না। স্বদেশীদের গভীর গোপন মারাত্মক ষড়যন্ত্র ঘিরে ঘিরে তাদের কল্পনায় গড়ে উঠেছিল উদ্ভট রোমাঞ্চকর নাটকীয়তা। স্বদেশী দমনে সে-ই বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছে এ কল্পনা যার ভোঁতা ছিল, অনুর্বর ছিল মায়ামমতার মত ; যে জানত গোপনীয়তা যত বেশি মিশ খেয়ে যাবে চারিপাশের প্রকাশ্যের সঙ্গে সে যে তত দুর্ভেদ্য, প্রকাশ্যে চা খেতে খেতে বা তাস পিটোতে যে খোস-গল্পই করতে হবে, লাট মারার পরামর্শ চলবে না এমন কোন কথা নেই, দৈনিক হাজার হাজার লোকের মধ্যে হাজারটা সাধারণ জিনিসের হাত-বদলের মত তুচ্ছ সাদামাটা ভাবে পিস্তলের মত মারাত্মক জিনিসেরও হাতবদল অনায়াসে হতে পারে, স্বদেশীর ভয়ও সে করত তত বেশি। কারণ, স্বদেশীরা যে তাকে এতটুকু ভালবাসবে না এই বাস্তব সত্যবোধের মধ্যেও তার কল্পনার এতটুকু ভেজাল মেশাবার উপায় ছিল না।

ছ্যাকড়া গাড়ী চলছে। পাদানির দুজন ভেতরে বসেছে, সামনাসামনি।

কোথা থেকে এলে ?

তুমি বলছ কাকে ? পাকা ফোঁস করে ওঠে।

আহা চটেন কেন ! কোথায় গিয়েছিলেন জিগ্যেস করছি।

প্রতিমা জবাব দেয়, জোড়াগড়ের রাজবাড়ী দেখতে গিয়েছিলাম।

পাকা ভাবে, প্রতিমার সত্যি বুদ্ধি আছে। বাসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্রেন এসেছে বটে স্টেশনে। বাসের কথা বললে ড্রাইভার কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যেত তারা কোথায় উঠেছিল। জোড়াগড় স্টেশনের কাছে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের জঙ্গল ঢাকা ধ্বংসস্তূপ আছে।

শেষে দুজনকেই নিয়ে যাওয়া হল রায়বাহাদুর এন, এন, ঘোষালের দরবারে।

ঘোষাল উঠে দাঁড়ায়, প্রতিমাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলে, আসুন।

পাকাকে বলে, আরে, তুমিই প্রকাশ না কি ? কি আশ্চর্য্য, আমি তোমার ভাল নামটা ভুলেই গেছলাম। তাই তো, এ কি রকম হ'ল !

৩

গভীর মনোযোগের সঙ্গে দু-চার মিনিট এ-ও ফাইল দেখার বিরাম দিয়ে দিয়ে ঘোষাল তাদের সঙ্গে সাময়িক ভাবে আলাপ চালিয়ে যায়, ভৈরবের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করে, প্রতিমার কাছে জোড়াগড়ের ভগ্নস্তূপের বিবরণ ও ইতিহাস শোনে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে নিজের মত শোনায়, কাজের কথায় আসে না। কার্লটন একবার ঘরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট তার সঙ্গে কথা বলে যায়, একনজরের বেশি তাকায় না পাকাদের দিকে। এমনি তার আশ্চর্য্য সংযম! অথবা? পাকা ভাবে। ঘোষাল তাদের চা খাওয়ায়, চায়ের সঙ্গে লোচন ময়রার বিখ্যাত সন্দেশ। চায়ের সঙ্গে সন্দেশ ছাড়া মানাবে কেন?

দেওয়ালের নীচের দিকটা আলকাতরা রঙ, মাথার ওপরে নিশ্চল পাখা, মেঝের মাঝখানে ভারি মোটা সরকারী টেবিল চেয়ার ছাড়া এতবড় ঘরটাতে শুধু রুক্ষ শূন্যতার গাম্ভীর্য্য—দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার পর্য্যন্ত ঝোলানো নেই। জানালা দিয়ে চোখে পড়ে কম্পাউণ্ডের সদর গেটে পাহারায় ও সশস্ত্র সিপাহীর কোমর থেকে ওপরের অংশটা, রাস্তার ওপারে উঁচু দেয়াল ঘেরা মেটে লাল রঙের জেলের বাড়ীর ওপরের দিকটা। কি রকম চেহারা জেলের ভেতরটার? সাইকেলে, পায়ে হেঁটে কত শত বার জেলটার সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে কিন্তু ভেতরে কি আছে দেখবার সাধ তো কখনো পাকার হয় নি!

নলিনী চুপচাপ বসিয়ে রেখেছিল দু'ঘণ্টা, এখানেও ঘণ্টাখানেক কাটল। কি বিশ্রী শান্ত শিষ্ট ভদ্রভাবে এরকম প্রতীক্ষা করা! জেলটার পেছনে সূর্য্য আড়ালে পড়েছে।

আমাদের ধরেছেন কেন?

আমি ঠিক জানি না। আমি আজ মোটে এসেছি।

পাকা জানে এটা মিছে কথা। ঘোষাল এবং আরও অনেককে নিয়ে কলকাতা থেকে কাল ভোরে স্পেশাল ট্রেনের আবির্ভাব তাদের অজানা নয়।

প্রতিমা সবিনয়ে বলে, আমি একটু ইয়েতে যাব।

বেশ তো, বেশ তো।

ঘোষাল আরদালী ডেকে হুকুম দেয়। আরদালীর শুধু উর্দি সম্বল, অস্ত্রশস্ত্রের বালাই নেই। দরজার কাছ থেকে তাই আরও একজন প্রতিমার সঙ্গে যায়। সে অস্ত্রধারী।

তুমি একটু বসো পাকা।

ঘোষালও উঠে যায়। যায় নলিনী দারোগার ঘরে। নলিনী তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়।

মেয়েটাকে ছেড়ে দিন। জেরা করে নেবেন, যদি কিছু বলে ফেলে। তবে ছুঁড়িটুঁড়িকে ওরা আসল কারবারে টানে না।

ইয়েস সার।

ছেলেটাকেও ছাড়তে হবে।

নলিনী শূন্য দৃষ্টিতে তাকায়।

আজ নয়, কাল। যদি না কনফেস করে। ভৈরব চাপ দেবে, ওপরে গিয়ে চাপ দেবে, তালুতে। বুঝলেন? আসল কাউকে পেলেন না, ওই রেকর্ডে এইটুকু একটা বাচ্চাকে আটকেছেন জানলে ওপর থেকে জুতো আসবে, আস্ত জুতো। বুঝেছেন?

ছোঁড়াটা জানে সার, অনেক খবর জানে।

বার করুন খবর। আমি দেখছি চেষ্টা করে। আমায় কিছু না বললে আজ রাতটা পাবেন, আপনারা চেষ্টা করে দেখুন। কাল ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।

ঘোষালকে এক মুহূর্ত্ত আনমনা দেখায়। মনে হয় কাব্যচিন্তা করছে।— কিন্তু মরে যেন না যায়। বাইরে যেন জখম না হয়। বুঝলেন?

ইয়েস সার।

প্রতিমার ডাক পড়ে নলিনীর কাছে। আর সে ফেরে না।

ঘোষাল কথা বলে পাকার সঙ্গে, তার ছেলেবেলার কথা, তার মার কথা। সেই পুরনো কথা, আরও বিস্তারিত, রঙ ছড়ানো—কত নিবিড় স্নেহভরা

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল পাকার মার সঙ্গে ঘোষালের, কত যত্নে কতরকম আচার করে, খাবার করে সে খাওয়াত ঘোষালকে। পাকা জানে তার মাকে টেনে আনবার মানে। মার কথায় সে ছেলেমানুষ বনে যায় এটা ঘোষাল টের পেয়েছিল গতবার ভৈরবের বাড়ীতে যখন দেখা হয়। ফাঁপর ফাঁপর লাগে, অসহ্য ঠেকে। কিন্তু এটা ভৈরবের বৈঠকখানা নয়। হিসেবী সতর্ক হয়ে গেছে পাকার মন। সেও খানিকটা অভিনয় করে। একটু অভিভূত হবার ভাব দেখায়।

তারপর এক সময় নলিনী ঘরে আসে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে চুপি চুপি কথা হয় ঘোষালের। কথার শেষে চিন্তিত গম্ভীর দেখায় ঘোষালের মুখ।

বড় মুশকিলে ফেললে পাকা তুমি। মেয়েটিকে এরা ছেড়ে দিচ্ছে। প্রতিমা নাম নয় মেয়েটির? প্রতিমা সব কথা খুলে বলেছে।

কিসের কথা?

এতক্ষণে তবে কাজের কথা উঠল, আক্রমণ শুরু হল! ভেতরটা শক্ত হয়ে যায় পাকার। ভয় করে। অসাবধানে কিছু বলে ফেলার ভয়, বোকামি করে সন্দেহ জাগাবার ভয়। প্রতিমাকে ছেড়ে দিয়েছে, কি দেয় নি—কে জানে! তাকে তফাৎ করা হয়েছে। একা করা হয়েছে। এবার একা তাকে সামলাতে হবে সব।

ঘনিষ্ঠ, আপন হয় ঘোষাল। বলে যে পাকাকে সে বাঁচাবে যে করে হোক। সে ক্ষমতা তার আছে। পাকার বাবা ঘোষালের আপন বড় ভাইয়ের মত—ছেলেবেলা থেকে পরিচয়। স্নেহ দিয়ে পাকার মা ঘোষালকে চিরদিনের জন্য বেঁধে রেখে দিয়ে গেছে। কিন্তু খুলে বলতে হবে সব কথা পাকাকে। না বলার কোন মানে নেই। প্রতিমা সব বলে দিয়েছে। পুলিসও জানে। পাকা সব জানাক ঘোষালকে, নিজের দায়িত্বে সে তাকে ছেড়ে দেবে। নয় তো কি যে বিপদে পড়বে পাকা, সে যদি বুঝত—

কি বলব বলুন না? খালি বলছেন বলতে হবে। আমি কিছু করি নি, মিছিমিছি আমায় ধরে এনে—

পাকা নিজেই বোঝে তার অভিনয় ভাল হচ্ছে না, একটু কেঁদে ফেলতে পারলে হত। কিন্তু কান্না না এলে উপায় কি! তা ছাড়া এরা যদি বুঝতেও পারে সে না জানার ভাণ করেছে তাতেও বেশি কি এসে যাবে! তাকে বেশ সন্দেহ করেই ধরেছে, মিছিমিছি নয়। হয়তো অনেক কিছু জেনে শুনেই ধরেছে। সে কিছু বলবে না এটুকু অন্তত বুঝুক।

বাইরে আলো ম্লান হয়ে আসছে। আরদালী ঘরে একটা আলো ঝুঝিয়ে দিয়ে যায়, টেবিলেও একটা আলো দেয়।

ছেলেবেলা আমায় একজন গাঁজা খেতে শিখিয়েছিল পাকা। তাকে কাকা বলতাম—কাকাই বটে! কি ভক্তিই যে করতাম! তোমার মতই বয়স হবে। বাবা একদিন টের পেয়ে বললেন: তুমি ছেলেমানুষ, তোমার দোষ নেই, তোমায় কিছু বলব না। কে তোমায় শিখিয়েছে তার নামটা বল। কি বোকাই তখন ছিলাম! বাবাও ছাড়বেন না, আমিও কিছুতে বলব না। শেষে দড়ি দিয়ে আমায় বেঁধে—মাথা হেলিয়ে হেলিয়ে ঘোষাল তার বাবার অতীত কর্ত্তব্য পালনে সায় দেয়।—বাবা সত্যি আমায় বাঁচিয়েছিলেন। নয়তো গাঁজা খেয়ে কি হতাম কে জানে! যে মুহূর্ত্তে নাম বললাম, বাবা আমায় ছেড়ে দিলেন।

গাঁজা খেতেন? ছি ছি! আমি হলে বাবা জিজ্ঞেস করা মাত্রে বলে দিতাম কে খেতে শিখিয়েছে।

সে সময়কার ঘোষালের মুখ পরবর্ত্তী জীবনে অনেক বার মনে পড়েছে পাকার। বিশেষভাবে মনে পড়েছে যখন হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বা আনমনে শক্ত কিছুতে কামড় দিয়ে জোড়া লাগানো ভাঙা চোয়ালের হাড় টন টন করে উঠেছে। তিনটি আঙুলের একেবারে কদাকার নখ চোখে পড়েছে।

পরবর্ত্তী জীবন, সে রাত্রির পরের।

যন্ত্রণার এক অজানা নতুন জগতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের রাত্রি। কতটুকু আঙুল মানুষের, দেহের কতটুকু অংশ! সেই আঙুলের নখের নীচে একটা

ছুঁচ ঢুকতে থাকলে জগৎটা বিদীর্ণ হয়ে যেতে চায়, কিন্তু যায় না। ক্ষুদ্র গোপন অঙ্গটি পিষ্ট হলেও তাই। চেতনার সীমায় তোলা যাতনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সেই অনুভূতির জগতে সর্ব্বাঙ্গ একাকার। এই অসহ্য অদ্ভুত জগতের সঙ্গে সে রাত্রির ঘনিষ্ঠতা ছাড়া, শুধু ওরকম নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছাড়া যে জগতের কোন মানে মানুষের কাছে থাকে না, চেতনাকে কোন দিন পাকা এমন অন্তরঙ্গভাবে চিনতে পেত না। মনে হয়ত কাব্য আর কল্পনা হয়েই থাকত চিরদিন, মনের জোরে মানুষের যন্ত্রণা জয় করাকে একটা দুটো মানুষের খেলো নাটুকে বাহাদুরি বলেই জেনে রাখত। মনের জোর যেন দু-চারজন মানুষের একার সম্পত্তি, কোটি কোটি দুর্বল মনের ব্যতিক্রম, যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধে মানুষ হার মানবে এই নিয়মের অনিয়ম। যন্ত্রণাকে জয় করাই স্বভাব মানুষের, তার চেতনাটাই যন্ত্রণার সঙ্গে পাল্লা দেবার মত ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে চেতনাও, আয়ত্তে রেখে রেখে ব্যথাতেই কেন্দ্রীভূত হতে থাকে ছড়ানো জগৎ থেকে সরে এসে এসে, যন্ত্রণাহীন অকাতর বলে জগৎ থাকে না, জীবন থাকে না, কিছুই থাকে না। যন্ত্রণাই অস্তিত্ব, যন্ত্রণাই সব। যন্ত্রণার যত উন্মত্ত আক্রমণ, সেই আক্রমণেই তত ভোঁতা হয়ে যায় যন্ত্রণাবোধ। একটা সীমার পর চেতনা নিজেকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়। মানে হারিয়ে মিথ্যে হয়ে যায় যন্ত্রণা।

ভয়ানক বলে কোন ব্যথা নেই, যন্ত্রণা নেই। কোন মানুষ কোন দিন ভীষণ কষ্ট পায় নি, পাবে না। ভয়ানক শুধু ভয়টা। যন্ত্রণা পাবার আগে মিথ্যা কল্পনার মিথ্যা যন্ত্রণা। যন্ত্রণার শেষ কথা মরণ। শুধু ভয়ের ফাঁকিতে যন্ত্রণা আর মরণ মানুষকে কাবু করে রেখেছে।

ভয় মানুষের তৈরি, স্বার্থপর মানুষের। ঘুমোতে না চাইলে পাকার মা পর্য্যন্ত পাকাকে ভয় দেখাত। মার কি ভয় ছিল না যে ঘুমিয়ে অসুখ করে পাকা মরে গেলে আদর করার সোহাগ করার বুকে করে মেতে থাকার কেউ থাকবে না? পুতুল হারানোর ভয়ে মাও যদি ছেলের জন্য ভয় সৃষ্টি করে, কানাকড়ি হারানোর ভয়ে মানুষ কেন পরের জন্য ভয় সৃষ্টি করবে না?

হঠাৎ একদিন চরম দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করে পাকা বীরত্বের মর্ম্ম বুঝেছে,

জেনেছে যে যন্ত্রণা আর মৃত্যুকে জয় করা মানুষেরই বাস্তব জীবনের সাধারণ বাস্তব ধর্ম্ম।

যাই হোক, নির্য্যাতনের ফলে একটা উপকার হয়েছে। মনের গতিটা ঘুরেছে পাকার। দ্রুত অনিবার্য্য বেগে অন্তর্জ্জগতে একটা বিপ্লব ঘটার মত। জ্ঞান ফেরার পর তৃতীয় কি চতুর্থ দিনে, প্রতিমা খানিকটা উদ্বেগের সঙ্গেই শুধিয়েছিল, কিছু বলেছ কি-না মনে আছে?

বলি নি।

তখনি একটা অস্পষ্ট স্বস্তি অনুভব করেছিল। না বলাটা তার বাহাদুরি হয় নি, একটা বিচ্ছিন্ন বিশেষ ঘটনা ঘটে নি তার জীবনে, মানুষের একটা রীতি, সাধারণ নীতি পালিত হয়েছে মাত্র—অনির্দ্দিষ্ট মানুষের মধ্যে নিজের ছড়িয়ে-যাওয়া এই অনির্দ্দিষ্ট অনুভূতিতে যেন মোটামুটি একটা মীমাংসা হয়ে গেছে তার মর্ম্মান্তিক বিরোধের, সারা জগতের সঙ্গে একা ঝগড়া করার। এসব অনুভূতি নিজে বুঝবার মত পুষ্ট হতে দানা বাঁধতে বহুকাল লেগেছিল, কিন্তু অভিশপ্ত শত্রু-জগতের সঙ্গে আত্মীয়তা তার শুরু হল জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে। পচা আবদ্ধ ভদ্র জীবনের ওপর রাগ করে বেচারী মরিয়া হয়ে রীতি-নীতি নিয়ম-কানুন বাধা-নিষেধের দেয়াল শুধু ভেঙেই চলেছিল, নিজের ঘৃণা আর জ্বালার চাবুকে পাগল হয়ে বাড়িয়েই চলেছিল দিশেহারার মত ছুটে বেড়াবার জন্যে আরো বড়ো—আরো বড় জগৎ: জগৎ যত বড় হয়েছে, চলা-ফেরা মেলা-মেশার জগৎ, দিবারাত্রির জগৎ, নিয়মহীনতার জগৎ, তত তাকে গুটিয়ে আসতে হয়েছে নিজের মধ্যে। ভদ্র স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে কি হবে, কি হবে মিষ্টি হাসি গান গল্প গন্ধ শোভা ভরা সাজানো ঘর ছেড়ে পথে পথে ধুলোয় হেঁটে, নরম বিছানায় স্বপ্নালু ঘুমের বদলে চামার বস্তিতে হৈ চৈ করে, সাপ জঙ্গলের ঝরনার ধারে একার ভাবরাজ্য গড়ে তুলে, সাইকেলে দূর গাঁয়ে পাড়ি দিয়ে, বিপদজনক মরণব্রতে অংশ নিয়ে, কাউকে যদি সে আপন না করে, কাউকে ভাল না বাসে! নিজেকে না দিলে কে তাকে আপন করবে, কার সাধ্য আছে: কিসে তার সাধ মিটবে, শুধু তারই জন্য জগতে কে আছে!

ভীরু আত্মীয়-বন্ধুরা পাকার খবরও নেয় না, দেখতেও আসে না। সে বিপজ্জনক হয়ে গেছে। গবর্নমেণ্ট তাকে শত্রু মনে করে, ইংরেজের নিষ্ঠুর একরোখা সর্ব্বজ্ঞ গবর্নমেণ্ট। ভদ্রতা বা আত্মীয়তা রাখতে গিয়ে কিসে কি হবে কে জানে, যখন খুশি যাকে খুশি যে কারণে খুশি ধরে নিয়ে যতদিন খুশি আটক রাখার যা খুশি করার আইন পর্য্যন্ত আছে। শত্রু হলেও অহিংস কংগ্রেস সম্পর্কে গবর্নমেণ্ট বরং অনেকটা উদার। পাকার মত মারাত্মক জীবদের যারা ছায়া মাড়ায় তাদেরও গবর্নমেণ্ট ক্ষমা করে না।

তা হোক, জগতে সবাই ভীরু নয়, ভীরুই জগতে সব চেয়ে কম। পাকা কাউকে ভাল না বাসুক, তাকে অনেকে ভালবাসে। শুধু তার অশান্ত অবাধ্য উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণটুকু, তেজী প্রাণটুকু কত প্রাণে টান জন্মিয়েছে সে হিসাবও পাকা কখনও রাখে নি, পাকাকে যাদের আপন ভাবার অধিকার তারাও ভাবে নি। ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ এত লোক তাকে দেখতে আর খবর নিতে আসে, জাত-বেজাতের লোক, যেন খাপছাড়া ঠেকে ব্যাপারটা সবার কাছে। সংখ্যায় তুলনায় কম হোক, ভদ্র জাতও অনেকে আসে। সংখ্যার স্বল্পতাটা ফাঁপিয়ে দেয় স্কুল-কলেজের ছাত্ররা—স্কুলের ছেলে পাকার যে এত কলেজীয় বন্ধু আছে কে তা জানত! দোকানী মিস্ত্রী ফিরিওয়ালা আসে—গঙ্গা কামার সপরিবারে, বাচ্চাকে পর্য্যন্ত কাঁধে চাপিয়ে। খবর পেয়ে চামার-বস্তি ফাঁকা হয়ে এসে নিঃশব্দে জমা হয় ভৈরবের বাড়ীর সম্মুখে, বেড়ি জেনে নেয় পাকা বেঁচে আছে এবং অবশ্য অবশ্য বেঁচেই থাকবে, চুপচাপ সকলে আবার বস্তিতে ফিরে যায়। আটুলিগাঁর মত আরও কতকগুলি গ্রাম পাকার কুশল চায়। এত তাড়াতাড়ি কি করে চারিদিকে খবর ছড়ালো কেউ ভেবে পায় না।

অমিয়া প্রতিমাকে বলে, দেখেছ কাণ্ড?

চোখের নীচে কালি পড়েছে নতুন মামীর। পাকার মাথায় আইসব্যাগ চেপে ধরে সে থাকে প্রতিবাদের হতাশার প্রতিমূর্ত্তির মত, পাকার গরম মাথা বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করার ভরসা যেন তার চিরতরে মুছে গেছে, এ শুধু নিয়ম পালন।

প্রতিমাও কম আশ্চর্য্য হয় নি। পাকাকে সে ছেলেমানুষ বলেই জানত।

কোন্ ফাঁকে সে এত বড় হয়ে গেছে টেরও পাওয়া যায় নি। আজ এ ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে তারও প্রথম খেয়াল হয়েছে অমিতাভের চেয়েও পাকা বেশি ঢ্যাঙা।

দশ

১

পরের বছর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় বসন্ত কাল এল। দখিনা আর কোকিলের কলরব তো বটেই, গুটি বসন্তের একটু উগ্রতর মহামারী নিয়েও। পরীক্ষা দিয়ে পাঁচু ফিরেছে আটুলিগাঁ। পাকা গিয়েছে দেশ-ভ্রমণে, অনন্ত আর নতুন মামীর সঙ্গে। ভ্রমণে নতুন মামীর শ্রান্তি এলেই পাকার কেটে পড়ার ইচ্ছা। একা খুশিমত বেড়াবে। ভারতের এদিক ওদিক।

এতকাল পরে পাকার বাবা আর একটা বিয়ে করেছে। ছেলের স্বদেশী-ওলাদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে তার চাকরির দারুণ অবনতি ঘটেছে। ভবিষ্যতে কি আছে কে জানে! অবাধ্য বিপথগামী ছেলে মন ভেঙে দিয়েছে। বিয়ের কারণ অবশ্য সেটা নয়।

পাকা বলেছিল পাঁচুকে, বয়ে গেল। সৎমা তো আর মা নয়। বাবার শখ হয়েছে বিয়ে করেছে, আমার কি?

কিন্তু পাঁচুর কাছে পাকা প্রায় স্বচ্ছ। তার আঘাত আর অপমান পাঁচুর কাছে গোপন থাকে নি।

লেখাপড়ার লম্বা ছুটি, পাঁচুর কাজের অভাব নেই। ভাবনা চিন্তা মানস-কল্পনার অভাবও ঘটে না। গেরস্ত চাষীর বড় সংসার, জমিজমা গরু-বাছুরের সম্পদ কম। কম বলেই ছোট-বড় খুঁটিনাটি সব কাজ নিজেদের করতে হয়, লোক রাখার সাধ্য নাই। ঘরের কাজ, মাঠের কাজ, বাজারের কাজ, হাট-বাজারের কাজ—সব কিছুরই অংশ পাঁচুর জুটে যায় পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে পা

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। চিঠি আর দরখাস্ত লেখবার জন্য অনেকে আসে, বাড়ীতে ডাকে। পাঁচুর হাতের লেখা মুক্তার মত সুন্দর, চিঠি লিখতে এক পয়সা ও দরখাস্ত লিখতে দু'পয়সা মজুরি নেয় পাঁচু। লেখাপড়া শিখতে অনেক খরচ, বড় কষ্টের পয়সা খরচ।

পরীক্ষার খরচ যোগাতে পাঁচুর মার একটি গয়না গেছে। রূপোর গয়না, ওইটিই তার শেষ সম্বল ছিল।

পরীক্ষা দিয়েই যেমন তেমন সাময়িক একটা চাকরি করার সাধ ছিল পাঁচুর, ধনদাস রাজী হয় নি। তাছাড়া, চাকরিই বা কোথায়! তার চেয়ে ঢের বেশি পাস করা ঢের ছেলে বেকার বসে আছে। দেশের হালচাল বড় খারাপ। অনেককাল চাকরি করছে এমন অনেকের চাকরি পর্য্যন্ত খসে যাচ্ছে।

আর কি লেখাপড়া হবে? মাঝে মাঝে এ ভাবনাটা পাঁচুর মনে আসে, তেমন জোরালো আকাঙ্ক্ষার রূপে নয়। লেখাপড়া শিখে বড় হবার উগ্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার জন্য নয়, ওসব কামনার শিকড় তার জীবনেও গভীর স্তরে পশে না, রস পেয়ে পুষ্ট হয় না। জজ ম্যাজিস্টর অন্য জগতের জীব, অন্য জগতের জীবনের সার্থকতা, তার জগতের নয়। লেখাপড়া শিখে জজ ম্যাজিস্টর হওয়ার সাধ বা স্বপ্ন তার জগতে এত কৃত্রিম যে রাজা হওয়ার আশীর্ব্বাদটা বরং ঢের বেশি বাস্তব আর স্বাভাবিক শোনায়।

তবে কলেজে পড়ার ইচ্ছা পাঁচুর হয়। পাস করে পাকা নিশ্চয় কলেজে ভরতি হবে। পাকার সঙ্গে পড়তে পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাতেও ওই জগতান্তরিত হবার দরকার থাকার অসুবিধা। কলেজে পড়তে এদিকে বাপখুড়োকে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। যেমন আশা করেছিল, পরীক্ষা তত ভাল হয় নি, পাঁচ-দশ টাকা বৃত্তি যদি পাওয়াও যায়, বাড়ীর অবস্থা কাহিল হওয়া তাতে ঠেকবে না। তার চেয়ে বড় কথা, ওরকম সর্ব্বস্ব পণ করে লেখাপড়া শিখতে গেলে শুধু আর একটা পাস করে থেমে যাওয়ার মানে হয় না। ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়ে শেষ করা যায়, চাকা এক পাক ঘুরল, তার সমাজ সংসারে গণ্য হওয়ার মত মূল্য বাড়ল। চাকা আবার ঘোরালে অন্তত বি-এ

পাস পর্য্যন্ত আর একটা পুরো পাক ঘুরতে দেওয়া চাই। চার বছর পড়া, চার বছর পড়ে অন্য সমাজ সংসারের মানুষ হয়ে যাওয়া, কারণ ওখানে ছাড়া তার আর তখন নিজের জগতে মূল্য নেই, সে সীমা পার হয়ে গেছে।

ভদ্রলোকের জগৎ সম্পর্কে পাঁচুর যথেষ্ট মোহ আছে। কিন্তু চাষাভূষোর জগৎ তার এমন আপন, এত প্রিয় যে তাকে বিগড়ে দেওয়া সামান্য মোহের কাজ নয়।

যেটুকু ঘষামাজা পেয়েছে তাতেই তার চোখে তার জগৎ বেশ খানিকটা নিঃস্ব অর্থহীন কুৎসিত হয়ে গেছে তবু। কি যে তার অবস্থা হত কে জানে, হয় তো গাঁয়ের চাষীর জীবন আর চাষী আত্মীয় বন্ধুর প্রতি ভালবাসা অশ্রদ্ধায় বিষিয়ে যেত, পাকা তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ভদ্রজীবনে পাকার বিদ্বেষ, অমার্জ্জিত চাষাড়ে জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য তার ব্যাকুলতা এ খড়ের বাড়ীতে এসে তার মূর্খ নোংরা গরীব বাপখুড়ো পিসীমাসী ভাইবোনদের মধ্যে বিনা সমালোচনায় সহজ শ্রদ্ধা সহজ আনন্দে বাস করা, পাঁচুর নজরকে নতুন ভঙ্গি দিয়েছে। তার কাকা একগুঁয়ে জ্ঞানদাসের গেঁয়ো উগ্রতাকে বিদ্রোহের মর্য্যাদা দিয়ে চিরদিনের জন্য পাঁচুকে পাকা আত্মমর্য্যাদার ভিত্তি দিয়ে গেছে।

মনে মনে সে কাকার পরম ভক্ত, মাঝখানে শুধু কিছুদিনের জন্য একটা খটকা লেগেছিল। কাকা বুঝি তার শুধু মাথা গরম গোঁয়ার, দেশও বোঝে না, স্বাধীনতাও বোঝে না, ষাঁড়ের মত শিং নেড়ে শুধু গুঁতোতে জানে। পাকা জ্ঞানদাসকে খাঁটি বীরের সম্মান দিয়ে তার মনের সংশয়ের মেঘ কাটিয়ে দিয়ে গেছে।

দেশ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিখ্যাত কত ভদ্র নেতার সম্পর্কে পাকার সাংঘাতিক অভক্তি আর কটূক্তি পাঁচুকে চমকে চমকে দিত। সেই পাকা জ্ঞানদাসকে—তার গোঁয়ার-গোবিন্দ কাকাকে—শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে গেছে। পাঁচুর কি আর সংশয় থাকে!

ঝাড় থেকে বাড়তি বাঁশ কাটা হয়েছে গোটা দশ-বারো। কাল হাটবার, গাড়ীতে হাটে বেচতে পাঠাতে হবে। পাঁচুও হাত লাগিয়েছে। ধারালো দা

দিয়ে কাটা বাঁশের কঞ্চি সাফ করতে করতে তার মনে হল একটা কথা। হাটে না পাঠিয়ে—

আঁ?

হাট দু'কোশ তো? সদর সাত কোশ। হাট থে' বাঁশ লেবে লোচন রশিক না তো খলিমুদ্দীরা। ফের সদরে চালান দেবে, লাভ করবে। তার চেয়ে মোরা যদি—

হাঁ?

বসন্তের কাছারি-বাড়ী সংস্কারের জন্য দুটি বাঁশ দিতে হবে, ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

ধনদাস ঠেক্না বাঁশের লাঠি কাটছিল। ডগার সরু দিক থেকে বা শাখা থেকে লাঠির মত একরকম ঠেক্না নিতে হয়, মাথায় বাঁশ বইতে হলে, দম ফুরিয়ে গেলে একটু থেমে জিরোবার সময় মাথার বদলে এই ঠেক্না লাঠিতে দিতে হয় বাঁশের ভার। দু'টি বাড়্তি সবুজ বাঁশের ওজন কত সে-ই জানে যে বাঁশের জোড়া মাথায় চাপিয়ে বয়। পুষ্ট মোটা তিনটি বাঁশ বইবার সাধ্য যোয়ান মদ্দেরও হয় না। দম ফেটে যাবে, ঘাড় বেঁকে যাবে। হাট-বাজারে মাথায় যারা বাঁশ বয়ে নেয়, দুটির বেশি বাঁশ বড় দেখা যায় না।

সদরে দরটা কেমন?

তা কে জানে! পাঁচুকে মানতে হয়, তবে কি-না হাট থে' কিনে সদরে তো চালান দেয়। মোরা যদি সদরে যাই—

মুখ চাওয়াচাওয়ি করে না ধনদাস আর জ্ঞানদাস। একজন বাঁশ-ঝাড়টার দিকে, আর একজন বাতাবি লেবু গাছের বাড়্তি রংলাগা ফলটার দিকে দু-চারক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারাই খরচ করে পাঁচুকে সদর স্কুলে পড়িয়েছে, তারাই যদি এখন পাঁচুর মতামতকে যথেষ্ট পরিমাণ মর্য্যাদা না দেয় তা হলে চলবে কেন!

কথাটা মন্দ নয়।

জ্ঞানদাস প্রথম সায় দেয়। কী মৃদু তার কথা, স্নেহ-শ্রদ্ধা, মায়া-মমতায় কী স্নিগ্ধ সুমিষ্ট তার উচ্চারণ! এই জ্ঞানদাস নাকি জমিদার বসন্তের প্রাপ্য খাতির

দেয় না, বেকার খাটতে ডাকলে কর্কশ জবাব দেয়, বসন্তের লেঠেলের মাথা ফাটিয়ে রক্তপাত করে।

ধনদাস শুধু বলে, তা দেখি একবার। তোমরা বলছ।

সেদিন তারা সপরিবারে এই নতুন প্রচেষ্টার রোমাঞ্চ ভোগ করে। বড় একটা শোল মাছ ধরে ঝাল রান্না হয়। মাছটা ধরে আনে পিসী সুভদ্রা। পরের পুকুরে দু'বছর ধরে পোষা মাছ, এমনি দরকারের জন্যই বুঝি সুভদ্রা এঁটোকাঁটা ভাতের কণা কুড়িয়ে দু'বছর প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার পর ডোবার ঘাটে গিয়ে বাঁ হাতে জলে ছল্‌ছল্‌ শব্দ করে ডান হাত জলে ডুবিয়েছে—হাত ঠুকরে ঠুকরে শোল মাছটা খাবার খেয়ে গেছে। আজ খপ করে কান্‌কোর নীচে চেপে ধরে তাকেই অনায়াসে ধরে এনে সুভদ্রা মাছের ঝাল রান্না করল।

ভোর রাত্রে যাত্রা। অন্ধকার থাকতে। ছাখো, আটুলিগাঁর আকাশেও আজ চাঁদ অস্ত যাচ্ছে। চাঁদের অস্ত যাওয়ার মহিমায় ভোর রাত্রির প্রবাদ-বাক্যের অন্ধকার আজ আম, জাম, বকুল, পলাশের দীর্ঘ ছায়ায় ঠাঁই পেয়েছে। গাছ যেন রোদেই ছায়া দেয়, দিনের বেলায়। সবাই যখন সজাগ। ভোর রাত্রের ঘুম-কাতর চোখকে যেন গাছের ছায়া আশ্রয় আর বিশ্রাম দেয় না।

গরুর গাড়ীতে সদর বাজারে বাঁশ বিক্রী করতে গেল খুড়ো-ভাইপো। মন্থর, দীর্ঘ পথ, সাইকেলেও সদর এত দূর নয়। পৌছতেই দুপুর হয়ে গেল, বাজার তখন ভেঙ্গে গেছে। এদিকে রাত দুপুরে রওনা দেওয়া উচিত ছিল। অতুলের বাঁশকাঠের আড়ত পাঁচুর জানা ছিল। দর সুবিধে পাওয়া গেল না। সে বেলার মত বাজার ভেঙ্গে গেছে বলে নয়। মাছ-তরকারির মত বাঁশের বাজারের এবেলা ওবেলা নেই, দরটাই পড়ে গেছে এসব জিনিসের, মাটিতে যা জন্মায়। গাঁয়ের হাটে আট ন' আনা পেত, সদরে এসে গড়ে এগার আনা। তারই জন্য দুটো মানুষ দুটো গরুর দিন ভোর খাটুনি।

না, বাণিজ্য তাদের পোষাবে না। গাড়ীটা পুরো বোঝাই বাঁশ এনে বেচলে কিছু হত, দশটা-বারোটা বাঁশ এনে ব্যবসা হয় না।

ফেরার আগে বিকালের দিকে পাঁচু ভৈরবের বাড়ীতে পাকার খবর আনতে যায়। এ বাড়ীতে সে অচেনা নয়, কিন্তু পাকা নেই, কে আদর করে বসাবে! পাকা? পাকা নেই। কোথায় আছে? কে জানে, ক'দিন আগে শ্রীনগর থেকে একটা চিঠি এসেছে।

সাইকেলের দোকানে কানাই কেরোসিন তেলে ফ্রি-হুইল সাফ করছিল। পরীক্ষা দিয়ে সেও দোকানের কাজে বেশি মন দিয়েছে। তারও লেখাপড়া সম্ভবত এই ম্যাট্রিকুলেশনেই সমাপ্তি। নলিনী দারোগার বৌয়ের গয়না-ডাকাতির ব্যাপারে মারধোর খেয়ে কানাই-এর জ্বর এসেছিল, ডাকাতির ধাক্কাও গেছে তার ওপর দিয়ে। মার খেয়েছে, মাস দুই আটক থেকেছে, এখন আছে নজরে নজরে, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাক পড়ে। শুধু সন্দেহ, সন্দেহজনক গতিবিধি আর মেলামেশা ছাড়া তার রেকর্ড নির্দোষ, নিষ্পাপ। তার চেয়ে বরং পাকার রেকর্ড খারাপ ছিল। অথচ পাকাকে শুধু দলের বন্ধু বলা যায়, দলের ঘনিষ্ঠ সক্রিয় কর্মী। কানাই শান্ত শক্ত, চাপা ছেলে। যেটুকু তার ছেলেমানুষী ছলকে বেড়ানো, সে শুধু বন্ধুদের সঙ্গে মেলা-মেশার জন্য, তার দলের খাতিরেই। দলের জন্য উপযুক্ত ছেলের প্রাথমিক খোঁজ আর বাছাই তার কাজ। এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও এজন্য পাকা তাকে কখনো বুঝতে পারে নি, একসঙ্গে বিড়ি তামাক টেনে আড্ডা মারার মধ্যেও তার চরিত্রের একটা গোপন কঠোরতা তাকে পীড়ন করেছে, তাকে ত্যাগ করে দূরে সরে যাওয়ার জ্বালায় জ্বালায় কাবু হয়েছে। কোন্ গুণে কানাইকে কালীনাথ তার চেয়ে বিশ্বাস করেছে, বেশি মূল্য দিয়েছে পাকা কখনো ভেবে পায় নি।

কিন্তু পাঁচু খানিকটা অনুমান করতে পারে। ভাবপ্রবণতায় তার বিচার-বুদ্ধি ঝাপসা নয়। তা থেকেই এসেছে সংসারে সাধারণ চালচলনের রীতিনীতি-বোধ। কানাইয়ের গোপন বিপ্লবী জীবন একটা আছে আন্দাজ করেও কোন দিন সে তাকে কোন প্রশ্ন করে নি।

আজ বিচার বিবেচনা করে সে শুধায়: কালীদা ধরা পড়ে নি, না?

না।

অন্য নতুন কেউ ?

না।

আর কিছুই সে জিজ্ঞাসা করে না এ বিষয়ে। তার এ স্বাভাবিক সংযম জানে বলেই কানাইও এমন জবাব দিয়েছে যার স্পষ্ট মানে এই যে কালীনাথদের খবর সে রাখে। নয়তো সে শুধু বলত : আমি কি জানি ?

কানাই-এর ন'বছরের নোলকপরা বোন রাধি দুটো কাঁসার বাটিতে তাদের মোয়া দিয়ে যায়। হাত না ধুয়ে দু'পরল কাগজ দিয়ে ধরে কানাই মোয়া খায়, বলে, শ্যামলবাবু আছে কেমন ?

তেমনি আছে।

শ্যামলের খবরটা তার নিজে থেকে দেওয়া উচিত ছিল, পাঁচু ভাবে। এদের জগতের লোক সে। কবে শেষ হয়ে গেছে শ্যামলের বিপ্লবী জীবন, ক্ষীণ অশক্ত শরীর নিয়ে কোনমতে সে টিকে আছে একটা গাঁয়ের একপ্রান্তে, তবু তার কুশলটাই কানাইদের কাছে মূল্যবান, সে তাদের আপন জন, একদিন সে বিপ্লব করেছে। কাঞ্চনপুর থেকে কেউ আটুলিগাঁয়ে তাদের বাড়ী এলে সে যেমন জিজ্ঞাসা করত তার মামার খবর, আটুলিগাঁ থেকে সে এসেছে বলে তেমনিভাবে কানাই জিজ্ঞেস করছে শ্যামলের কথা। কানাইয়ের কাছে আটুলিগাঁয়ে একজন মানুষ থাকে, পুরানো বিপ্লবী শ্যামল।

তাই বটে। আত্মীয়তার মানেই তাই।

এই রাধি লো ! জল দিবি নে ?

মুখচোখ কুঁচকে ফোকলা দাঁত বার করা একরাশি হাসি দিয়ে এই ত্রুটি ঢেকে রাধি জল আনে। ধনদাস সম্প্রতি পাঁচুর বিয়ের কথা বলছে, এই বয়সী এই রকম একটি মেয়ের সঙ্গে, হয়তো দুধে দাঁত খসে এমনি ফোকলাও হবে। ভাবলে পাঁচুর গা ঘিন ঘিন করে না। আত্মীয়-কুটুম-স্বজাতির ঘরে ঘরে এই বয়সের কেন, এর চেয়ে কচি কচি বৌ দেখাই তার অভ্যাস, সংস্কার। তবে কি-না বিয়ের সাধ তার নেই। জ্ঞানদাসেরও অমত। বিয়ে কি পালায় বেটাছেলের ? যাক না কিছুকাল, সাত-তাড়াতাড়ি বাঁধনের কি দরকার !

আজকেই ফিরে যাবি ? কানাই বলে।

নইলে থাকব কোথা ?

এখানে থাক্ না আজ।

কথাটা বড় ভাল লাগে পাঁচুর। পাকার মধ্যস্থতায় তার কানাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব। পাকা না থাকায় আজ সে দূরত্ব বোধ করছিল, বন্ধুর কাছে এসেও বন্ধুকে না পাওয়ায় কষ্ট বোধ করছিল। এক মুহূর্তে সে খুশি হয়ে উঠল।

দাঁড়া তবে বিদেয় করে আসি কাকাকে।

বন্ধুর বাড়ি একটা দিন কাটাবার লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় পাঁচুর। পাঁচ ঘণ্টা থানায় কাটিয়ে আটুলিগাঁ ফিরতে হয়। হয়রানির একশেষ।

২

থমথমে মুখে জলজ্বলে চাউনি, তাতে আবার ঘন ঘন নিশ্বাস। দেখেই ধনদাসের টের পেতে বাকি রইল না ছেলেটার বেজায় জ্বর এসে গেছে— ম্যালেরি। জ্ঞানদাস আন্দাজ করল, জ্বরজারি সাধারণ ব্যাপার নয়, কিছু একটা ঘটেছে, ঘা খেয়ে জখম হয়েছে পাঁচু। দেহমন দু'য়েই জখম হয়েছে, নয়তো এমন হতো না। দাঁতে দাঁতে ঠুকে যায় জ্ঞানদাসের, দু'চোখ জ্বলে ওঠে। রও রও তোমার সাথে বোঝা পড়া হবে জ্ঞানদাসের, যে তুমি এমন করে ঘা দিয়েছ তাদের পাঁচুকে। তা হও গে' সে তুমি দারোগা জমিদার লাটসায়েব ! আগে একবার শুনতে দাও ব্যাপারটা।

কিন্তু না, এক খাবলা গুড় আর কলসীর ঠাণ্ডা জল না খাইয়ে পাঁচুকে সে মুখ খুলতে দেয় না। তেতে পুড়ে খিদে তেষ্টায় এমনিই কাতর ছেলেটা, মনের জ্বালা মুখে প্রকাশ করতে গিয়ে আরও তো তাতবে।

বলিস কেনে জিরিয়ে নিয়ে ? মিঠে আর জলটুকু খেয়ে নে আগে। দুকুর গড়িয়ে গেছে বেলা, গরম কত !

ঠাণ্ডা হয়ে বাড়িয়ে ফেনিয়ে রোমাঞ্চকর বিবরণ দেয় পাঁচু, কথা আর অঙ্গভঙ্গি মিলে কি যে জমজমাট প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তার বর্ণনা! তার প্রাণ থেকে যে তীব্র ঝাঁজ আর উগ্র ক্ষোভ উথলে উথলে বেরিয়ে আসতে থাকে সোজা স্পষ্ট গেঁয়ো ভাষায় শুনলে নলিনী দারোগারও চমক লেগে যেত। পাকার কথা ধরাই চলে না, কানাই-এর তুলনায়ও তার পাঁচ ঘণ্টার নির্য্যাতন এক রকম কিছুই নয় বলা চলে। কিন্তু ওদের চেয়ে তার যেন শতগুণ বেশি রাগ। চাষার ছেলে ভীরু নরম হয়, পাঁচুর রকম দেখে এ ধারণা আর টিকিয়ে রাখা যায় না। পাঁচ ঘণ্টা সে কেন তবে মুখ বুজে সব সয়ে গিয়েছিল, একবারও ফোঁস করে ওঠে নি! ওটাও রীতি চাষার ছেলের, অত তার ফাঁকা ভাবোচ্ছ্বাস থাকে না, আলগা হয়েও থাকে না হৃদয় মনের ছিপি যে মিছামিছি বেহিসেবী ফুঁসে উঠবে। মাটি তাকে ধৈর্য্য শেখায়।

ঘরের দাওয়ায় এখানে বিপদ নেই বলে যে প্রাণ খুলে ছাঁকা মিথ্যে আওড়াচ্ছে তাও সত্য নয়। যতটা সে বলতে পারছে তার চেয়ে অনেক বেশিই বরং তার অন্তরের বিক্ষোভ, খাঁটি জ্বালা। কারণ, এ তো শুধু তার উপর নির্য্যাতনের কথা নয়। এক রাত্রির অত্যাচারে মরতে মরতে বেঁচে উঠে পাকা না হয় একা সে অত্যাচারের জ্বালা নিজের বুকে পুষে সামলে উঠতে দেশভ্রমণে গেছে, সে ভদ্রঘরের ছেলে, তার দরাজ বুক। এর আগে সরকারী দাপটের টোকাটিও পাঁচুর গায়ে কখনো সরাসরি লাগে নি, তার জীবনে থানায় গিয়ে নলিনী ও তার সাঙ্গোপাঙ্গের কানমলা চড়-চাপড় গালাগালি গায়ে মাখা এই প্রথম। তাই বলে দেশজুড়ে অন্যায়ের জগদ্দল চাপ কি জন্ম থেকে তার বুকে চাপ দেয় নি? গাঁয়ে তার আপন কাকা জ্ঞানদাস আর শহরে তার আপন বন্ধু পাকা ও কানাই কি শুধু তাকে জ্বালা জুগিয়েছে? জ্ঞান হয়ে থেকে হৃদয় মন জ্বালা করার অসংখ্য কারণ দেখে আসছে, শুনে আসছে—বইয়ে অনাচার অত্যাচারের বিবরণ পড়ে রক্তে আগুন ধরে গেছে। রাগ তাই পাঁচু কম সঞ্চয় করে নি এই বয়সে। স্কুলে পড়লেও মনের চাষাড়ে ভোঁতা গুণটা রয়ে গেছে বলে, যা নিছক সহনশীলতা—সয়ে সয়ে সব কিছু সয়ে যাবার বংশগত অভ্যাস, নিজে ঘা খাওয়ার আগে রাগটা তাই এমন ভাবে ফেটে পড়ে নি।

ও শালাকে তুমি ঘায়েল কর কাকা, এস মোরা মারি ওটাকে।

পাঁচু এমনভাবে কাঁদে যেন ফুসফুসে তপ্ত বাষ্প ছাড়ছে, এমনভাবে থর থর করে কাঁপে যেন আঘাত হানার উদ্দাম কামনাই দেহটা নাড়ছে। বাঁশের টেক্ক লাগান শালের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেছিল প্রথমে, কথা শুরু করে সিধেই উঠেছিল, এখন একেবারে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার উগ্রমূর্ত্তি দেখলে ভয় করে।

ভয় করে এই জন্য যে, এ তো বাপখুড়োর সামনে হাম্বিতাম্বি করা নয় যে ঘরের দাওয়ায় রাগ ঝেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ফোঁসফোঁসিয়ে জ্বালা উপে যায় না তাদের, বুকেই থাকে,—ভাষার সঙ্গে সারা দেহটা লাগিয়ে প্রকাশ করার এমনি ব্যাকুল চেষ্টায় না কমে বেড়েই যায়।

সুভদ্রা ডুকরে কেঁদে ওঠে: ও কথা বলিস নে বাপ! মোদের পাঁচুকে তোমরা সামলাও না গো, ঠাণ্ডা কর।

পাঁচু চোখ পাকিয়ে ধমকায়: চুপ মার্ পিসী, চুপ মেরে যা। মেয়েলোক তুই কথা কইতে আসিস নে মোদের ব্যাটাছেলের কথায়!

না সোনা, এ সব্বেনেশে কথা মুয়ে আনিস নে তুই!

রা কাড়িস নে পিসী, মেরে মুখ থেঁতলে দেব।

মারের ভয় কি পিসী মানে, পাঁচু তার মারমূর্ত্তি হয়ে দারোগাকে মারতে চলেছে—চলেই বুঝি গেল!

কি যন্তনা, কথার কথা কইছে বই তো না? বুড়িয়ে গেলি তোর জ্ঞানগম্মি হল না সুভদ্রা মোটে!

সুভদ্রাকে থামিয়ে ধনদাস ছেলেকে শান্ত করার একমাত্র অস্ত্র খাটায়, জ্ঞানদাসের বেলাতেও সে এ অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকে, টিটকারি দিয়ে বলে, বীরপুরুষ! কেরদানি দেখাচ্ছে! সে রইল সে সদর থানায়, দাওয়ায় এর লম্ফঝম্প! একদম মেরে টেরে কম্মো সেরে এলেই হত? 'হাটে চাটে সেপাই-এর জুতো, ঘরে মারে মাগকে গুঁতো'। বীরপুরুষ!

তুমি তো কেঁচো, কি জানবে? বাবুরা অমন কত দারোগা ম্যাজিস্ট্রেট মারছে!

ক্রুদ্ধ অপমানিত পাঁচু কটমটিয়ে চেয়ে থাকে, বাপ না হলে মেরে বসত

ধনদাসকে। দু'চোখ ভরা স্নেহ আর শ্রদ্ধামর্য্যাদা ধনদাস ছেলের সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিতে থাকে, মুখে কিন্তু তেমনি টিটকারির সুরেই বলে, অ্যাং যায়, ব্যাং যায়, খল্‌সে বলে মুইও চলি! বাবুরা বোমা পিস্তল দে সাহেব মারে, তুই দা' নিয়ে ছোট্, দারোগা মেরে আয়।

এ তো শুধু টিটকারি নয়, বাস্তব জ্ঞানবুদ্ধির কথাও বটে। যে এভাবে লাঞ্ছনা করেছে তার পাঁচুকে, তাকে যদি উচিত শিক্ষা দেওয়া যায় ধনদাস খুশিই হবে, কিন্তু শিক্ষা দেওয়া যায় কি-না সেটা তো দেখতে হবে! একজন অকারণে ছ্যাঁচা দিয়েছে বলেই তো রাগের মাথায় দিক্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে পাথরে মাথা ঠুকে মরা যায় না, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া যায় না। সাধ হলেই তো প্রতিশোধ নেওয়া যায় না সদর থানার প্রবল প্রতাপ দারোগার ওপর শুধু তাই নয়, আরও হিসাব আছে। অসম্ভব সাধকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে পাগল হওয়া, প্রতিকারহীন জ্বালায় নিজে জ্বলে পুড়ে খাক হওয়া, স্রেফ বোকামি। রাগের জ্বালায় এরকম পাগলের মত যে করছে পাঁচু, গায়ে কি আঁচড়টি লাগছে নলিনী দারোগার, কোন দিন লাগবার সম্ভাবনা আছে? এসব কথা মুখ ফুটে বলতে হয় না ধনদাসকে, পাঁচুরও ভাল করেই এসব জানা আছে, ধনদাসের টিটকারি শুধু মনে পড়িয়ে দেওয়া বৈ তো নয়। পাঁচুর উগ্র প্রচণ্ড রূপ ঝিমিয়ে আসে, সে গুম খেয়ে থাকে, কিন্তু ক্ষোভ তার কমে না, তার উতলা ভাব যায় না। সে শান্ত হবে, তার রাগ জুড়িয়ে যাবে, এ আশা অবশ্য ধনদাসও করে নি!

মোর যা হবার হবে। নয় মরব। মরলে কি হয়?

কি হয়। কচু হয়। জ্ঞানদাস ভারি গলায় নিবিড় সহানুভূতির সঙ্গে বলে, মরা কিছু লয় বাপ্! মরণকে সবাই ডরায়, আঁধারকে ডরায় না? দরকার পড়লে ঘোর আঁধারে বনবাদাড়ে যায় মানুষ, মরণকেও বরণ করে। ফল যদি হয় তো মর্ না কেনে তুই, হাজার বার মরগে' যা, কে বারণ করেছে? আর কিছু হোক বা না-হোক উয়ার গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে তো মরবি, না কি? বোকার মত মরাই সার হবে, সেটা কাজের কথা লয়।

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়েছে ধনদাস, গভীর দুশ্চিন্তা ঘনিয়ে এসেছে। কে জানে

বাবুদের বিদ্যা সংসারের সহজ সরল হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে কি-না পাঁচুর ! জ্ঞানদাসকেও চিন্তিত দেখায়। ভাই তার যাই ভাবুক, ফাঁকা নিষ্ফল গোঁয়ারতুমির পক্ষপাতী সেও নয়, নিছক ঝোঁকের বশে আত্মনাশের মানে সেও বোঝে না। কড়ায়-গণ্ডায় মরণের মূল্য আদায় না করে ভাবের বশে প্রাণ দিতে তার সায় নেই। তার ছেলেমানুষ পাঁচু শহরের স্কুলে পড়ে হয়তো অঙ্ক হিসাব শিখেছে। নলিনী দারোগাকে শুধু তেড়ে মারতে গিয়ে বিপদে পড়াটা হয়তো যথেষ্ট প্রতিশোধ, উচিত কাজ ভেবে নেবে ? অনেক বিষয়ে অনেক কথা পাঁচু বলে যার উদ্দেশ্য এমনি শূন্য, মানে এমনি ফাঁকা !

৩

চাষী সমাজ বর্ষার পথ চেয়ে আছে, বৃষ্টি শুরু না হওয়ায় ইতিমধ্যে উদ্বেগ বোধ করছে। প্রতিদিন তা শঙ্কায় পরিণত হবার দিকে বেড়ে চলে। অবস্থা এমন যে মারাত্মক অনাবৃষ্টির কথা ভাবাই যায় না, প্রকৃতির সাধারণ সামান্য অনিয়ম ব্যতিক্রমের ফলে খুব কম অনিষ্ট হলে তাই মারাত্মক হয়ে ওঠে অনেকের পক্ষে। একটা বছর আংশিক অজন্মার ধাক্কা সামলানো পর্য্যন্ত অসাধ্য হয়ে গেছে। বনের জন্য স্থানীয়ভাবে আগে একটা বিশেষ বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হত, বনের সঙ্গে সে বর্ষণও কমে গেছে। বর্ষা নামতে দেরি হলে বিপদ অনিবার্য্য ; হয় খরা নয় বন্যা। সময়ের নিয়ম একবার লঙ্ঘন করা হয়ে গেলে এই দুটি চরম ছাড়া আকাশ আর সামঞ্জস্য জানে না।

কিছুদিন মাঠে হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে, জল নামার অপেক্ষায় থাকা ছাড়া এখন আর কাজ নেই, সাময়িক আলস্যে পাঁচুর ক্ষোভ আর অসন্তোষ তাকে অস্থির করে রাখে। ধনদাস ও জ্ঞানদাস দুজনেই সেটা লক্ষ্য করে, মেয়েদের কিছু না জানিয়ে শুধু তারা দু'ভাই পাঁচুর বিয়ের কথাটা নিজেদের মধ্যে নাড়াচাড়া করে। কালটির বৃন্দাবনের মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, ঘরের দিক থেকেও অসমান নয়, শুধু পাঁচুর হিসাবে বয়সটা বেমানান, এগার

হবে। আটের বেশি বয়সের মেয়ে, পাঁচুর সঙ্গে মানায় না, বড় মেয়ে আনলে পাঁচু যখন হবে বাইশ চব্বিশ বছরের হাল্কা যোয়ান, পরিবার তার হয়ে দাঁড়াবে রসঘন হয়ে আসা থমথমে সোমথ ভারিক্কি যুবতী। সে বড় মারাত্মক যোগসাজস, ভাগ্যক্রমে উৎরে যদি যায় তো ভাল, নয় তো সব বিগড়ে যায়। তবে যেজন্য তারা তাড়াতাড়ি পাঁচুর বিয়ে দেবার কথা ভাবছে তাতে বাড়ন্ত তৈরি মেয়ে হলেই ভাল।

পাঁচুর বিয়ে দেওয়া সম্পর্কেই জ্ঞানদাসের একটা খটকা আছে, সে খেদের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, ওতে মন জুড়ায় না গো, সে আশা মিছে। তবে হাঁ, বাঁধন পড়ে একটা, নিরুপায় করে দেয় খানিকটা। মনের জ্বালা মনেই পুষে রাখতে হয়, হঠাৎ যে ঝাঁপ দেবে তার যো রয় না। ফের ইদিকে কিন্তু—

এসব কথার মর্ম্ম ভাসা ভাসা বোঝে ধনদাস, পাঁচুর অনেক কথার মত বস্তুহীন হাওয়া নিয়ে কারবারের মত ঠেকে। বৌ এনে যদি ঠেকানোই যায় পাঁচুর হঠাৎ সাংঘাতিক কোন কাণ্ড করে বসার বিপদ, গরম যদি নরম হয় পাঁচুর, তবে তো সার্থক হয়েই গেল এখন বিয়েটা দিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য। এর মধ্যে আবার মনের হিসাব আসে কিসে?

এটা ছাড়া জ্ঞানদাসের আরও খটকা আছে শুনে ধনদাসের আরও অসহায় মনে হয় নিজেকে।

ফের ইদিকে কিন্তু তোমার আমার মত নয় পাঁচু, ওর ধারা ভিন্ন। আটক বাঁধন মানবে কি-না কে জানে বল?

তবে? তাই যদি না মানে পাঁচু তবে আর তার বিয়ের কথা ভেবে লাভটা কিসের? মাঝে মাঝে যে কথা অনেক বার অনেক কারণে মনে হয়েছে ধনদাসের আজ আরও জোরের সঙ্গে সেই কথা মনে হয়,—ছেলেকে শহরে পড়তে দেওয়া বুঝি ঝকমারি হয়েছে! জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে ধরা ছোঁয়া যায় না, তার ঘরে নইলে কি এমন সমস্যা সৃষ্টি হয়! প্রায় এমনি অবস্থায় সে জ্ঞানদাসের বিয়ে দিয়েছিল, পাঁচুর মতই তার ছটফটানি এসেছিল। স্বভাব যায় নি জ্ঞানদাসের, গোঁয়ারই সে রয়ে গেছে! তা থাক্ না। তার স্বভাব তো আর বদলাতে চায় নি ধনদাস বিয়ে দিয়ে, বিয়ে করে নাকি কারো স্বভাব পাল্টায়!

সাময়িক যে উন্মত্ততা এসেছিল, পুরুষ মানুষ কেন, তার শান্তশিষ্ট গাইটা পর্যন্ত যে স্বাভাবিক অবস্থায় দড়ি ছিঁড়ে চার পা তুলে উধ্বর্শ্বাসে ছুটোছুটি করে, সেটা তো কেটেছিল জ্ঞানদাসের। যাই বলুক আর যাই করুক, ভাল থেকে সুখে দুঃখে ঘরকন্না সে করছে না? সাত বছরের মেয়ে সে এনেছিল জ্ঞানদাসের বেলা। পাঁচুর বেলা বৃন্দাবনের ওই বাড়ন্ত মেয়েটা এনেও ফল হবে না? এ কোন্ দেশী রীতিনীতি হিসাবনিকাশ কে জানে, মাথায় ঢোকে না ধনদাসের।

মাঝে হঠাৎ পাঁচু একবার সদরে গিয়েছিল, শ্যামলের একটা দরকারী ওষুধ আনতে। সদরে যাওয়া কি আর এমন ব্যাপার, মাসে দশবার খুশি হলে ঘুরে আসা যায় অনায়াসে। এবার শহরের ওপর দারুণ একটা বিরাগ জন্মেছে, সদরে নলিনী দারোগা থাকে। সদরে যে তার জানাচেনা বন্ধুও শত শত থাকে, কানাই আর নোলক-পরা ফোকলামুখ রাধি থাকে, এক নলিনী দারোগার সদরে বাস করাটা তাদের সবার উপস্থিতিকে ছাপিয়ে উঠেছে। ঘৃণার কি আগুনটাই জলেছে পাঁচুর মনে! নলিনী ইতিমধ্যে আবার এ আগুনে নতুন ইন্ধন যোগাবার ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। কালীনাথের ওপর আর এক চোট নির্য্যাতন বর্ষণ হয়ে গেছে, সরকারী হুকুমে সে এখন ঘরবন্দী। কালীনাথের মত চাঁইদের এত চেষ্টাতেও ধরতে না পেরে ইংরেজ সরকার ক্ষেপে গেছে, কার্লটনকে মারার একটা চেষ্টা প্রায় শেষ মুহূর্ত্তে ঠেকানো গেছে কিন্তু নিছক ষড়যন্ত্রটা ছাড়া ষড়যন্ত্র-কারীদের একজনকেও ধরা যায় নি। সাগর পারের শিখর থেকে গাঁয়ের থানার শেকড় পর্য্যন্ত সরকারী দপ্তরে তুমুল ঝড় বয়ে গেছে নিস্ফল আক্রোশের, এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা এমন বিরাট আয়োজন সব কিছুকে তুড়ি দিয়ে যদি স্বদেশী ছোকরারা এ ভাবে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে পারে, কদিন টিকবে ইংরেজ রাজত্ব? যে ভাবে পার ধ্বংস কর বিদ্রোহ।

কানাই-এর যোগাযোগ আছে এটা পুলিসের জানা ছিল কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও বার করা যায় নি যোগসূত্রটা কি। কোন মতেই কানাই-এর চব্বিশ ঘণ্টার গতিবিধির হদিস রাখা যায় নি, এক্সপার্ট নজরও হার মেনেছে। তিন দিন হয়তো সে সাইকেল দোকানে ঠুকঠুক মেরামতি কাজ করে বাজারে গিয়ে মাছতরকারী, দোকানে গিয়ে সওদা আনছে, আর কোথাও যায় না,

কিছুই করে না। পরদিনও তেমনি বাজারে গিয়ে সে হারিয়ে গেল, ঘণ্টা চারেক পাত্তা নেই। এমনি জেরা করা যায় না, টের পাবে কড়া নজর আছে, সাবধান হয়ে যাবে, হয়তো যোগাযোগ ঘুচিয়েই দেবে ভয় পেয়ে। চেনা লোককে দিয়ে সাধারণ কথাবার্তার মারফতে জানার চেষ্টা করতে হয়।

মাধব ধীরে ধীরে তার সঙ্গে পরিচয় গড়ে তুলছে। পিছনের চাকার ভাল্‌ভটা নিজেই খুলে ফেলে সাইকেল নিয়ে দোকানে গিয়ে ভাল্‌ভ লাগিয়ে দিতে বলে মাধবকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করতে হয়, কোথা গিয়েছিলে কানাই ?

বেলতলায় কীর্ত্তন শুনে এলাম। আঃ, ফাইন কার্ত্তন দিয়েছে !

শয়তান ছেলে! যেখানে ভিড়, যেখানে যাচাই করা যাবে না সে সত্যই গিয়েছিল কি-না এমনি সব জায়গা ছাড়া সে কোথাও যায় না! একবার সুনিশ্চিত জানা গেল দু'টি পিস্তল কানাই-এর হাতে পৌঁচেছে, হানা দিলে মেরামতি দোকানেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এ সুসংবাদ, পিস্তল কানাই যথাস্থানে পৌঁছে দেবে। তাড়াতাড়ি দেবে, তাকে সন্দেহ করা হয় জানে, নিজের কাছে বেশি সময় রাখতে সাহস পাবে না। অবিলম্বে আঁটঘাট বাঁধা হয়ে গেল, সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা হল কানাই আর তাদের দোকানবাড়ীর ওপর, এবার আর ফসকালে চলবে না। সামনে সাইকেল মেরামতের দোকান, পিছনে কানাইদের বসবাস। বাড়ীটার পিছনে একটা পুকুর, ওপারে কুমোরপাড়া—পিছনেও কড়া নজর রইল।

যথাসময়ে কানাই দোকান বন্ধ করল, ভেতরে গিয়ে নাওয়া-খাওয়া সারল। তারপর গরমের দুপুরে বাড়ীর লোকের একটু তন্দ্রার ভাব এলে অন্দরের যে জানালাটা পাশের বাড়ীর অন্দরে খোলে এবং যে জানালা মারফতে দুই অন্দরের মেয়েরা কোন্ বাড়ীতে কি রান্না হয়েছে থেকে জগৎ-সংসারের সব বিষয় নিয়ে আলাপ করে, সেই জানালাটি খুলে শিস দিয়ে ধরে দিল বেসুরো গানের সুর।

ঠিক যেন ডিটেক্‌টিভ গল্প উপন্যাসের নাটকীয় ঘটনা, খানিক পরে সত্যি সত্যি একটি কিশোরী মেয়ে এসে দাঁড়াল জানালার ওপারে। কানাই তাকে জন্মাতে না দেখলেও আঁতুড় ঘরে ট্যাঁ ট্যাঁ করতে দেখেছে, কানাই-এর নিজের বয়সও অবশ্য তখন ছিল বছর চারেক।

ভাগ্যিস তুই ঘুমোস নি ঘেঁটু!

আহা, আমি যেন দুকুরে কত ঘুমোই!

নিষিদ্ধ দ্রব্যের প্যাকেটটি কানাই তার হাতে দেয়। পাংশু মুখে কড়া চোখে তাকায় ঘেঁটু।

ফের তুমি এসব করছ? এত তোমার পয়সার খাঁকতি!

নে নে হয়েছে। নিজের ভাগটি তো ঠিক বুঝে নাও!

আচ্ছা, সত্যি এতে কি আছে কানাইদা? চুপি চুপি একদিন খুলে দেখতে হবে।

ঘেঁটু ফিক করে হাসে।

কানাই উদাসভাবে বলে, দেখিস্। একটি সুতোর গিঁট দু'বার লাগানো হলে ওরা টের পেয়ে যায়। লুকিয়ে এসব ব্যবসা যারা করে এমনি তারা ভালমানুষ, পিছনে লাগতে গেলে মজা টের পাইয়ে দেবে। এখান থেকে জিনিসটা একটু ওখানে পৌছে দেবার জন্যে এমনি কেউ অতগুলি টাকা দেয়?

আপিম-টাপিম হবে বোধ হয়, এ্যাঁ? তুমি নিশ্চয় আমায় ঠকাও কানাইদা, কম টাকা দাও।

যা পাই তার আদ্দেক দি'। আমি দশ টাকা পেলে তোকে পাঁচ টাকা দি'। যা এখন, লুকিয়ে ফেলবি যা।

ভোরে স্কুলে যাবার পথে ঘেঁটুর কাছ থেকে প্রতিমা জিনিসটা নেয়।

আপনি কত পান?

তোমায় বলব কেন?

যথাসময়ে তন্নতন্ন করে সার্চ্চ করা হয় কানাই-এর দোকান আর ঘর-বাড়ী। তারপরেই ঘরবন্দীর হুকুম জারি হয়। তবে কানাই-এর সঙ্গে যে-কেউ দেখা করতে আসতে পারে, তাতে কোন নিষেধ নেই। কানাই বাইরে যাদের সঙ্গে যোগ রাখত, তারা কেউ যদি কানাই-এর সঙ্গে যোগ রাখতে আসে কখনো, এই আশা।

একবারে বুঝি শিক্ষা হয় নি?—কানাই বলে পাঁচুকে, বন্ধুকে পেয়ে সে খুশি হয়েছে বোঝা যায়। ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে থাকতে দম আটকে

আসছিল। কেউ বড় একটা আসে না এ বাড়ীতে, আত্মীয়স্বজনও একরকম বর্জ্জন করেছে। দোকানে কাজকর্ম্ম নেই, ভয়ে কেউ সাইকেল সারাতে আসে না, রসিক একলাটি চুপচাপ দোকানে বসে থাকে। পাঁচুর সঙ্গে এবার কানাই আশ্চর্য্যরকম খোলাখুলি ভাবে কথা বলে। ঘেঁটুর মারফৎ পিস্তল দুটি সরানোর গল্পও সে-ই নিজে থেকে পাঁচুকে শোনায়। গতবার তাকে যে থানা হয়ে গাঁয়ে ফিরতে হয়েছিল এ খবর কানাইকে কে দিল পাঁচু প্রথমে ভেবে পায় নি, দেখা যায় শ্যামলের কাছে তার ঘনঘন যাতায়াতের খবরও কানাই জানে। বন্ধুর প্রতি তার ভালবাসার সঙ্গে একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর শ্রদ্ধাভক্তির ভাব এসে মেশে। বিপ্লবীদের মধ্যে বন্ধুর যে তার এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে তাতে পাঁচুর বিশেষ গর্ব্ব খর্ব্ব হয়। কানাই-এর আত্মবিশ্বাস, সাহস, শক্তি আর শান্তভাব তাকে মুগ্ধ অভিভূত করে রাখে।

কানাই ভণিতা করে না, সোজাসুজিই বলে, শ্যামলদা তোর খুব প্রশংসা করেছে। তুই যদি ইচ্ছা করিস পাঁচু, আমাদের সঙ্গে ভিড়তে পারিস।

কদিন ভেবে দেখে বলব।

নিশ্চয়, এ তো ছেলেখেলা নয়। সব সুখের আশা ছেড়ে জেল ফাঁসি সব কিছুর জন্যে তৈরি হয়ে আসতে হবে। বরং না আসা ভাল, এসে ভড়কে গেলে চলবে না।

এ বয়সে মনের এমন ভারিকি গড়ন কানাই কোথায় পেল কে জানে! এমনিভাবেই কি শিখিয়ে পড়িয়ে ছেলেদের গড়ে নেয় বিপ্লবীরা? কাজের মধ্যে নিজের যে পরিচয় সে দিয়েছে কথাগুলি তারই প্রতিরূপ বলে বেমানান শোনায় না, মনে হয় বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষের মত কথা বলার অধিকার তার আছে।

বোধ হয় এখানে থাকব না ভাই।

কেন?

মিছামিছি বাড়ীর সবাই জুলুম সইছে। দোকানের রোজগার একদম বন্ধ। এমনি আটকে থেকেও লাভ নেই।

পালাবি?

তাই ভাবছি।

এগারো

১

পাঁচুও ভাবে।

কানাই আর এক পথের সন্ধান দিয়েছে। মরিয়া হয়ে শুধু নলিনীকে ঘা মারার চেয়েও চরম পথ, ইংরেজ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়া। পাঁচু জোরালো আকর্ষণ অনুভব করে, এমন বিরাট আয়োজন যাদের—সৈন্য পুলিস কামান বন্দুক তাদের—বিরুদ্ধে মরণপণ লড়ায়ে নেমে কানাই-এর মত বিপজ্জনক জীবন গড়ে তোলা, দাসত্বের মধ্যে মুক্তির স্বাদ পাওয়া।

কিন্তু মনের মধ্যে কিসে যেন বাধা দেয়।

নলিনীকে খুন করে ফাঁসি যাবার মানে সে স্পষ্ট বুঝতে পারে, ওটা তার নিজের ব্যক্তিগত অসহ্য জ্বালার ব্যাপার। ওই বিদ্বেষ আর ওই আঘাতটা সৈন্য-পুলিস জজ-ম্যাজিস্ট্রেট লাট-বড়লাটের প্রকাশ্য গবর্নমেণ্ট-এর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার কল্পনা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, ব্যাপারটা মনের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারে না। কত তফাৎ শক্তির—এক দিকে কত বড় গবর্নমেণ্ট, অন্য দিকে কতটুকু কানাইয়ের দল! ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মাইনে করা লাখ লাখ সৈন্যরাও তো যুদ্ধে প্রাণ দেয়, এদিকে কত চেষ্টায় কত খুঁজে পেতে কত বাছ বিচার বাছাই করে কানাইদের এক একটি ছেলে যোগাড় করতে হয়। কানাই-এর মত বিশেষ গুণ না থাকলে কাজেও লাগে না।

কি করে কি হবে? সে যে বুঝতে পারে না সেটা নিশ্চয় তার দোষ। নলিনীর কথা ভাবলে পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত তার জ্বলে যায়। ওটাকে সাবাড় করে এখুনি সে হাসিমুখে ফাঁসি যেতে পারে, কিন্তু সারা গবর্নমেণ্টের কথা ভাবলে তো এরকম নাড়া লাগে না। একটা গভীর অতল অসন্তোষ মনটা ভারি করে দেয়, ক্ষোভের জ্বালা ধিক ধিকি জ্বলে।

ইংরেজ গবর্নমেণ্টের চেয়ে বরং বসন্তবাবুদের উচ্ছেদ করে মেরে দেশছাড়া করার কল্পনায়ই উৎসাহ জাগে বেশি।

কেউ যদি প্রাঁচুকে বলে দিত।

শ্যামল বলে, বলে দেবার লোকের অভাব নেই ভাই। আমিও এককালে সবাইকে বলতাম, আমার কথা শোন, মঙ্গল হবে। আজ আমি বলি, যেটুকু বুঝেছ সেইটুকু নিয়ে কাজে নামো। কাজ কর আর সেই সঙ্গে আরও বোঝবার চেষ্টা কর। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিজে তুমি যা বুঝবে কারো বাবার সাধ্য নেই মুখের কথায় তোমাকে তার চেয়ে বেশি বুঝিয়ে দেয়।

পাঁচু সংশয় ভরে বলে, কিন্তু মোটামুটি একটা আদর্শ না ধরে, একটা পথ ঠিক না করে—

শ্যামল বলে, কর্ম্ম আর চেতনার সমন্বয়ের কথা ভাবছিলাম কদিন থেকে। আদর্শ আর কর্ম্মের সমন্বয় ছাড়া পথ নেই। বসে বসে আদর্শ নিয়ে শুধু ভাবলে আদর্শ গুলিয়ে যায়, ঝোঁকের মাথায় শুধু কাজ করে গেলে কাজ পণ্ড হয়।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু আদর্শ তো থাকা চাই একটা যাতে বিশ্বাস করি? নইলে কাজে নামব কি নিয়ে?

শ্যামল একটু চুপ করে থাকে।

গীতার কর্ম্মযোগ নিয়ে সারা জীবন মারামারি করেছি—গীতা পড়েছ তো? সারা জীবনের কর্ম্মফল যোগ করে আজ ভাবছি, অত মারামারি নাই-বা করতাম! ভার ভাবনার কথা নিয়ে মারামারি করতে হয়, নইলে মন ঠিক হয় না, ঠিকমত কাজ করা যায় না। কিন্তু শুধু ভাবনা নিয়ে মেতে থাকলে চলে? ভাবনার তাতে পুষ্টি হয়? চিন্তারও তো খোরাক চাই, কাজ হল সেই খোরাক। যখন সমস্যা আসে কি করব, এটা করব না ওটা করব, তখন দু'দিন চারদিন দু'মাস চারমাস ভাবা উচিত। কিন্তু এ্যাদ্দিন তুমি কি করেছ সেটা স্রেফ বাদ দিলে কি চলে ভাবনা থেকে? আজ কি করব এই যে চিন্তা সেটা আসলে এসেছে এ্যাদ্দিন কি করেছি তাই থেকে—

পাঁচু বোকার মত হাসে, বলে, শরীরটা আজ ভাল আছে, না শ্যামলদা?

বাইরে রোয়াকে পাটি পেতে বসি আসুন। আসুন না? শুয়ে শুয়ে শুধু বই পড়বেন, মাথা ঘামাবেন, তাতে কি শরীর টেঁকে?

শ্যামল ক্রুদ্ধ চোখে তাকায়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। গ্রামপ্রান্তের কুঁড়ে ঘরে রোগশয্যায় জীবনকে শুধু ধরে রাখার সংগ্রাম চালাতে চালাতে সে আর সকলের জীবনে কিছু অনুপ্রেরণা আনার চেষ্টা করছে, তাকে এমন রূঢ়ভাবে বাইরের রোয়াকে বসে সূর্য্যের আলো খোলা হাওয়া সবুজ শোভা থেকে বাঁচার প্রেরণা সংগ্রহ করতে বলা!

পরের জন্যই শ্যামল বহুকাল বেঁচেছে, আন্দামানেও সে পরের জন্য ভাবত, ভারতবর্ষের কোটি কোটি পর। উনিশ শ' পাঁচ সালে বাংলা দেশটা ভাগ হওয়ার ব্যাপার নিয়ে সারা ভারতের পরকে যে সে আপন করেছিল তার জের টেনে টেনে।

অথচ পাঁচুর কথায় সে ঘা খায়। একটা অদ্ভুত বিরোধ আছে তাদের মধ্যে, থাকে থাকে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। কিসে কে ঠোক্কর খেল টের পায় না কিন্তু বেশ একটু লাগে, পথ চলতে হোঁচট খেয়ে আঙুল ছড়ে যাওয়ার মত —মনের অমিল, হাওয়ার বিরোধ নয় মোটেই। সম্পর্ক তাদের জমে উঠেছে পরীক্ষা দিয়ে পাঁচু গাঁয়ে আসার পর থেকে, শেষজীবনে শ্যামল যেন শিষ্য পেয়েছে মানসপুত্রের মত প্রিয়, এমন তারা মশগুল হয়ে যায় কথায় যে দেখে মনের সুখেই পিসীর চোখে জল আসে। তফাতে উবু হয়ে বসে সে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে দু'টির মিল।

শিষ্য বটে, অনেক গুরু তপস্যা করে জীবনে এমন একটি শিষ্য পেলে যমের মত ধন্য হয়ে যায়। তা যম এসে শিয়রে বসেছে শ্যামলের কিছুকাল হল, নতুন যুগের বামুন-ঋষি চাষী জাত থেকেই উঠে এসেছে কিশোর নচিকেতা পাঁচু। হাটে-বিকানো একখানি যেন টিনে-মোড়া আধাস্বচ্ছ ছোট আয়না, দামী দর্পণের মত প্রতিফলনে স্তবস্তুতির মত সব ফিরিয়ে দেয় না। নিজের মনে যা স্পষ্ট নয় পাঁচুকে তা সাড়ম্বরে শোনাবার সাধ্য শ্যামলের নেই, পাঁচুর মধ্যে অবোধ জিজ্ঞাসু নিজেকে শ্যামল নিজেরই লজ্জার মত দেখতে পায়: ফাঁকি দিচ্ছ?

কারণ, মুখ দিয়ে যখন তার খই ফোটার মত অনর্গল বার হতে থাকে

নিজের জীবনের মূল্যে যাচাই করা স্বচ্ছ স্পষ্ট সত্য, মেরুদণ্ড সিধে হয়ে যায় পাঁচুর, আলগা তারের মত তার ঢিলে শিথিল দৃষ্টি মোচড়-কষা সঙ্গতিতে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে; দুটি প্রাণে যেন বৈদ্যুতিক ছোঁয়াছোঁয়ি চলতে থাকে, অনবরত চমক দিতে থাকে বোঝানো আর বোঝার চেষ্টার মিল, গুরু-শিষ্যের আত্মীয়তা!

সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়। প্রণয়লীলার মত তা আনন্দঘন।

পাঁচুই আবার কথা তোলে। বলে, আদর্শের জন্য মরতে পারি।

মরা কিছু নয় পাঁচু। বেঁচে আছি তাই না মরার দাম? বাঁচাই যখন মরার বাড়া হয়, অন্যের হজম করা ফাঁকা বাতিল জীবনের মত, মানে মলের মত তুচ্ছ হল বাঁচাটা, মরাকে তখন কেয়ার করে কে? আমি আর কটা দেখেছি, অমন কত আছে, কত ছিল, কত হবে। শুধু এদেশে? সারা জগতে এরা গণ্ডা গণ্ডা জন্মাচ্ছে। একটা আদর্শ সামনে ধরে দাও, কিসের জীবন কিসের কী, চলো মরি, মরে বাঁচি, মরে বাঁচাই! তবে ওটা হওয়া চাই, জীবনের দাম কষাটা। বাঁচার মত বাঁচা কাকে বলে আর সে তুলনায় কি বাঁচাটা বাঁচছি! ওটা ছাড়া হয় না, আগে নালিশ চাই, বুকফাটা নালিশ। নইলে শূয়োরের মত পাঁকে ময়লায় বেশ কেটে যায়, যেমন আছি সেটুকু বাঁচি বাবা, বেশি চেয়ে এটুকু খুইয়ে লাভ কি! কর্ম্মযোগ মানে লড়াই, কুরুক্ষেত্রে তাই গীতার জন্ম। আত্মরক্ষা কি মানুষের জীবন? পশু আত্মরক্ষা করে বাঁচে, কৃমিকীট আত্মরক্ষা করে বাঁচে, মানুষ নয়। মানুষ যুদ্ধ করে, বাঁচার জন্যে মরে। বাঁচার দফা নিকেশ করেছে বলেই না তুই আমি সায়েব মেরে ফাঁসি যাই। কেন যাই? আমরা টের পেয়েছি, আমরা ফাঁসি গেলে অন্য সবাই টের পাবে, ওদের ফাঁসি দেবে। এমনি হয়, জানিস, এই দুনিয়ার রীতি। আগে একটা কবি ওঠে, একটা পাগল ওঠে, দশটাকে পাগল করে, তারা দেশটাকে ক্ষেপিয়ে দেয়। কিসে? আগুন ছড়িয়েই থাকে ভাগে ভাগে, কম কম, ঠাহর হয় না কি ব্যাপার, জ্বালা কিসের! একজনের বুকে আগুন জ্বলে, দাউ দাউ জ্বলে, সে ঠাহর পাইয়ে দেয় জ্বালা কিসের! না কি বলিস তুই?

বলে, ওদেশের কথা বলছিলাম, রাশিয়ার কথা। ঠিক কি হ'ল ব্যাপারটা ভালমত জানা যায় নি, খবর আসে কম। যা বলে মোটামুটি বুঝি, ওই বাঁচার

কথা। মজুর গরীবের বাঁচার কিছু নেই, শুধু খাটুনি, সবার চেয়ে মরতে ওদের ভয়ডর কম। ওরা ক্ষেপলে কারো সাধ্য নেই ঠেকায়। এটা সোজা ব্যাপার, পরিষ্কার বুঝি। আমার ঠেকছে কোথায় জানিস? ওদের ক্ষেপাবে কে, কিসে ক্ষেপবে?

বলে, কালীনাথ আমায় পাগল বলে, মাথা নাকি খারাপ হয়েছে তাই এসব বলি। সব কথার জবাব দিতে পারি না এই হয়েছে মুশকিল। বুঝি যে জবাব আছে। ওদের দেশে যখন এমনি ভাবেই সত্যি সত্যি ঘটেছে ব্যাপারটা, কেন ঘটল কি করে ঘটল জবাব আছে নিশ্চয়।

ওদেশের গরীব-মজুর হয়তো এদেশের মতো নয়।

কালীনাথও তাই বলে।

পিসি মাঝে মাঝে লাগ-সই সুযোগ পেলে এদের কথার মধ্যে ছড়া কাটে, বলে, ও ছাই বলে। খেতে পায় না গরীবদুখী, তার আবার এদেশ ওদেশ! গতর সবার গতর বাবু, পেটের খিদে খিদে, তার এদেশ ওদেশ কি?

কালীনাথরা কয়েকজন একদিন গোপনে শ্যামলের এখানে জড়ো হয়, সঙ্গে প্রতিমাও আছে। সন্ধ্যার পর আচমকা হাজির হয়ে টের পেয়ে পাঁচু উঠোন থেকে ফিরে আসছিল, প্রতিমাই তাকে ডাকল। সেদিন কানাই-এর খোলাখুলি কথা বলার চেয়েও আজ বিনা ভূমিকায় তার সঙ্গে এদের সহজ কথা ও ব্যবহার পাঁচুকে আশ্চর্য্য করে দেয়। বিনা আড়ম্বরে আজ তাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয়। পাঁচু পারবে কি রাত জেগে বড় রাস্তার কাছে পাহারা দিতে, কোন মোটর গাড়ী যদি আসতে দেখে টুক করে সিধু ঘোষের আমবাগানের পেছন দিকে কয়েক আঁটি খড়ে আগুন দিয়ে সরে যেতে? খড়ে কিছু কেরোসিন ঢেলে রাখলে ভাল হয়।

ঘুম পেলে চলবে না কিন্তু।

ঘুম পাবে, ঘুমোব কেন?

পাঁচু তখনি উঠে আসতে যায়, কালীনাথ বলে, বোস, অত তাড়াহুড়ো নেই।

খেয়ে দেয়ে গাঁ একটু নিঝুম হলে পাহারা দিতে যেও। পাকার সঙ্গে তোমার ভাব ছিল, না?

এ রোমাঞ্চকর স্বপ্নাতীত ঘটনা পাঁচুর জীবনে। মনের রহস্যলোকের অংশে ভক্তিশ্রদ্ধার আবেগ যে একজন মানুষকে কোন আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে কাছা-কাছি এসে আজ এটা সে ভাল করে টের পায়। এদের তুলনায় কত তুচ্ছ জ্ঞানদাস, তার সরল সহজ বিদ্রোহপনা। একটু ব্যথা পায় পাঁচু। সপরিবারে নিজেকে ছোট মনে হয়।

পাকার কথা আরও জিজ্ঞাসা করে কালীনাথ, প্রশ্ন করার সুরে মন্তব্য করে, চরিত্র ভাল ছিল না পাকার, খারাপ পাড়ায় যেত?

পাকার চরিত্র? এদের সান্নিধ্যে অভিভূত হয়েছে পাঁচু মনে মনে, জিভে নয়—পাকার চরিত্র আপনারা কি বুঝবেন? তেজের চোটে ছটফটিয়ে বেড়ায়, সব জায়গায় যায়। কারো হয়তো বিপদ হয়েছিল, উপকার করতে যেত, নয় তো অন্য কোন খেয়ালে যেত। কোন কিছু মানে না, কাউকে কেয়ার করে না, তাই বলে খারাপ হবে কেন?

তাই নাকি!

পাঁচুর মুখ কঠিন হয়ে আসে, আপনারা খেদিয়ে দিলেন, আপনাদের জন্য মরতে বসে নি? বলে দিতে পারত সব কথা। আপনারা অন্যায় করছেন পাকার ওপরে—

সবাই চুপ করে থাকে, কারো মুখে এতটুকু ভাবান্তর নেই। এ কাঠিন্য ধাত ফিরিয়ে আনে পাঁচুর। তাই বটে, এদের কাছে তুচ্ছ মান-অভিমানের মানে নেই, এরা ভয়ঙ্করের সাধক। বাইরে অন্ধকার গাঁয়ের পথে ঘরের দিকে চলতে চলতে পাঁচুর মন কানায় কানায় ভরে থাকে গর্ব্বে আর সার্থকতাবোধে। এদের বিশ্বাসের পাত্র বলে কানাই সম্প্রতি কত বড় হয়ে উঠেছে তার কাছে, সেই বিশ্বাস আজ সেও পেল। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ।

কালীনাথ আর প্রতিমা ছাড়া অন্য তিনজনকে সে চেনে না। শুধু একজনকে সদরে দু-চার বার চোখে দেখেছে। কে জানে ওরা কারা?

পরদিন আরও কথা হয়, গীতার কথা, কর্ম্মযোগের কথা, বিপ্লবী বই পড়ার

কথা। কাল বিনা শর্তে পাঁচুকে রাত জেগে গ্রামপ্রান্তে পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, আজ গীতা স্পর্শ করিয়ে তাকে প্রতিজ্ঞা করানো হয় যে, যে-টুকু সে জেনেছে ও শুনেছে বা জানবে ও শুনবে, দেহে প্রাণ থাকতে কখনও প্রকাশ করবে না। দলে ভরতি হোক বা না হোক দলের প্রতি পাকার মত এ বিশ্বাস সে রক্ষা করবে। পাকার নামোল্লেখ পাঁচুর কাছে চমকপ্রদ লাগে।

সে নিজে থেকেই জানায়, পাকার একটি চিঠি পেয়েছে দু'দিন আগে। ঢাকায় বাবার কাছে আছে পাকা। তাকে একবার বেড়াতে যেতে লিখেছে।

প্রতিমা সাগ্রহে বলে, যাও না ?

পাঁচু বলে, ভাবছি একবার ঘুরে আসব। গতর খাটিয়ে খরচটা তুলতে হবে, দেরি হবে কটা দিন।

কালীনাথ বলে, গেলে একটা কাজও করতে পার। পাকার বাবার দুটো রিভলবার আছে, চুপি চুপি অন্তত একটা পাকা সরাতে পারে। কি ভাবে কি করবে পরামর্শ করে ঠিকঠাক করে আসতে পার, আনাবার ব্যবস্থা করব। যাতায়াতের খরচ পাবে।

পাঁচু আশ্চর্য্যই হয়ে যায়। একেবারে মশগুল হয়ে আছে এরা, এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্য কোন চিন্তা নেই। কালীনাথ যেন ওৎ পেতে ছিল পাকার বাবার একটা রিভলভার বাগাতে, সুযোগ টের পাওয়া মাত্র ব্যবস্থা করছে। যোগসাধনা ছাড়া কি এ রকম একাগ্রতা হয় ?

২

পাকা লিখেছে : বুড়ো মানুষটা ঝোঁকের মাথায় একটা বিয়ে করে পস্তাচ্ছেন, বাবার কথা বলছি। কিছু বলেন না কিন্তু বেশ টের পাই। নতুন বৌকে নিয়ে হঠাৎ সেকেন্দ্রাবাদে গিয়ে হাজির, আমি গটগট করে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, নতুন মামী কান ধরে আটকে দিল। বলল কি জানিস, বাপ কি তোর চাকর, না তুই তোর বাপের চাকর ? তুই চলিস তোর বাপের হুকুমে যে বাপ তোর মন জুগিয়ে চলবে ? আমি ভেবে দেখলাম যে সত্যি, আমার কি এসে গেল ? দু'দিন

কথাটথা বলি নি মোটে, যতই হোক বিচ্ছিরি লাগে না মানুষের? পরদিন সে কি কাণ্ড, সকালে বেড়াতে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে খেয়াল থাকে নি, বাড়ী ফিরতে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। ফিরে দেখি বাবার নতুন বৌ হাউমাউ করে কাঁদছে, পাগলীর মত চেহারা, বাবা টেবিলে মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছেন চুপচাপ। নতুন মামী সেদিন যা আমায় একচোট নিলে, যেন ঠিক পাগল হয়ে গেছে, বন্দুক এনে বললে আমায় গুলি করে মারবে। বাবার পায়ে ধরিয়ে আমায় ক্ষমা চাওয়াল তবে ছাড়ল। আমার কি দোষ বল দিকি? এসব পাগল মানুষকে বোঝার সাধ্য কারো নেই। পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইছি, বাবা পর্য্যন্ত কেঁদে ফেললেন। বাবা চিরকাল এমন গম্ভীর মানুষ, আবোল-তাবোল কি যে সব বলতে লাগলেন ছেলেমানুষের মতো! আমার অবস্থাটা বুঝে ভাখ। নতুন মামী ধরে বেঁধে এখানে এনেছে, এক মাস থাকতেই হবে, মরি বাঁচি। আমি যেন কচি খোকা মাঝে মাঝে এমনি আদর যত্ন করতে চায়, নইলে বাবার নতুন বৌ লোক বেশ ভাল—

একবার যাওয়ার জন্য তাগিদটা করুণ, ফাঁদে পড়ে পাকা যে কত বিপন্ন সেটা খুবই স্পষ্ট। চিঠির সঙ্গে গাঁথা দশ টাকার নোট দুটি পাঁচু তাই প্রসন্ন মনে সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। গিয়ে এই নোট দুটিই পাকাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। পাকা এমন ব্যাকুলভাবে যাবার জন্য আবেদন জানায়, এমনভাবে চিঠি লেখে, তাকে!

ধনদাস বলে, না গিয়ে বরং চিঠি লেখ্ একটা, জবাব এলে যাস।

জ্ঞানদাস বলে, না, তুই যা পাঁচু, আজকালের মস্তি যা। কেনে না, ব্যাপার সুবিধে নয়। বড়ঘরের বন্ধু যেচে এমন পত্তর লেখে কখন্? যখন তার মনের বিষম দায়। না তো জগতে তার কত বন্ধু, কত আপনজন, সবার বদলি খেয়াল হল তোকে? নীচু হবার কথা না, না গেলে নীচু হবি তুই, বিশ্বাসঘাতক হবি।

সুভদ্রার উৎসাহ দেখে মনে হয় পাঁচু এই দণ্ডে ঢাকা রওনা হলে সে হরির লুট দেয়। পাঁচু তার দারোগা মারার পণ করেছে, এই বুঝি মারতে গেল, তার চেয়ে ঘুরে আসুক ঢাকা থেকে, ঠাণ্ডা হয়ে আসুক।

সদরে কলকাতার ট্রেন রাত দশটায় ছাড়ে, ভোরে পাঁচু রওনা দেয়। বাড়ীর

মানুষ, বিশেষ করে সুভদ্রা, টুকিটাকি অনেক জিনিস সঙ্গে দিতে চেয়েছিল, পাঁচু সব বাদ দিয়েছে। বিশেষ একটি বিলাসের কাঁথা সেলাই করছিল সারদা, তিন-চার বছরের ছেঁড়া শাড়ির পাড় জমিয়ে, তাতে তার সম্বল একটি বাড়তি শার্ট, পুরনো একটি সুতির কোট আর দু'খানা ধুতি, কিছু চিঁড়ে আর এক টুকরো পাটালি বেঁধে ছোটখাট পোঁটলাটি বগলে করে সে রওনা দেয়। রাধা-নগরের হাটের কাছে সাতটায় সদরের বাস মেলে।

কানাই-এর বাড়ীতে দিনটা কাটিয়ে রাত দশটায় ট্রেন ধরবে, এই উদ্দেশ্য। কানাই এবারও খুশি হল। পালিয়ে যাবার সাধ সে দমন করেছে, কালীনাথের বারণ। দু'দিন আগে হঠাৎ ঘরবন্দীর হুকুম তুলে নেওয়া হয়েছে, সকাল-বিকেল থানায় শুধু হাজির দিতে হবে। কাজটা নাকি পাকার। নতুন মামীর যোগাযোগে সে অনন্তের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে, তার বন্ধুর ওপর মিছেমিছি জুলুম হচ্ছে। ভেতরে ভেতরে খবর নিয়ে অনন্ত কোথায় কি কল টিপেছে সে-ই জানে, শিথিল হয়ে গেছে বিনা বিচারে মানুষের জন্মগত অধিকার খর্ব্ব করার নির্লজ্জ বাঁধন।

দেখলি তো? পাঁচু খুশি হয়ে বলে, পাকার সত্যি টান আছে।

কানাই কিন্তু খুশি নয়, তাকে স্বাধীনভাবে শহরে চলাফেরা করতে দেখে সাইকেলের দোকানে খদ্দের আসতে আরম্ভ করছে, তবু কানাই এতটুকু কৃতজ্ঞ নয়। বলে, সব ব্যাপারে ন্যাকামি, সেন্‌টিমেণ্টাল ভূত! কে বাবা তোকে মাথা ঘামাতে বলেছে আমার জন্যে?

পাকা আর জাতে উঠল না কানাই-এর কাছে। মুখ বুজে থাকার জন্যে মার খেয়ে হাড় গুঁড়ো হয়ে গিয়েও নয়, ওটা যেন কানাই-এর কাছে সাধারণ স্বাভাবিক কাজ। মুখ খুললে অমানুষ পশু হয়ে যেত পাকা, সে তা হয় নি, শুধু এইটুকু! পাঁচুর কাছে পাকার বিচার অন্য মাপকাঠিতে, কানাই-এর কঠোরতা তাই তাকে আহত করে না, মুশকিলেও ফেলে না। দুরন্ত অবাধ্য বেপরোয়া পাকার কাছে কঠিন সংযম চাইতে পারে কানাই, পাঁচু চায় না। ভাবপ্রবণ! হৃদয় থাকলেই মানুষ ভাবপ্রবণ হয়। তাকে ন্যাকামি বলে না। পাকার সম্পর্কে কালীনাথ-কানাইদের বিচার পাঁচু সোজাসুজি অগ্রাহ্য করে, পাকাকে

এরা জানে না বোঝে না, বিচার করবে কি! তবে পাকার মত স্বাধীন একগুঁয়ে ছেলে নিয়ে এদের যে কাজ চালানো মুশকিল, এটা পাঁচু মানে। তাই পাকার দিকে টানলেও তার পক্ষ নিয়ে ঝগড়াও সে করে না।

পাশের বাড়ীর সেই ঘেঁটু এসেছিল। পাঁচুর সে একেবারে অজানা নয়, আগেও সে কয়েক বার তাকে এ বাড়ীতে আসতে যেতে দেখেছে। কানাই-এর মা আর দিদির সঙ্গে খানিক আড্ডা দিয়ে ঘেঁটু একখানা বই চাইতে আসে।

একটা বই দেবে কানাইদা?

বই নেই।

ঘেঁটুকে দেখেই কানাই-এর মুখভঙ্গি ক্রুদ্ধ কঠোর হয়েছিল, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সে প্রায় ধমকের মত জবাব দেয়। পাঁচু অবাক হয়ে ভাবে, ব্যাপার কি!

বই নেই তো নেই, কদিন ধরে এমন করছ কেন? কথা কইলে ঝেঁজে ওঠ!

কথা না কইলে হয়। যে মেয়ে বিশ্বাস রাখে না তার সঙ্গে কথা কওয়া পাপ। প্যাকেট খুলেছিলি জানি না ভাবছিস আমি? আমি সব জানি।

পাঁচুর দিকে চেয়ে ঘেঁটু সভয়ে বলে, আঃ, কানাইদা! মুখ তার সাদাটে হয়ে গেছে।

ন্যাকামি করিস নে ঘেঁটু। যা, পুলিসকে বলবি যা, অনেক টাকা দেবে।

বলেছি পুলিসকে আমি?

বিশ্বাস কি? সামান্য বিশ্বাস যে রাখে না, সে সব পারে।

ছেলেমানুষ মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে। রাগে ভেতরে ভেতরে জলতে থাকে পাঁচু। কানাই হঠাৎ তার চোখে ছোট হয়ে যায়, বুদ্ধিহীন বর্ব্বর হয়ে যায়। ঘেঁটু চলে যাবার পরে সে খানিকক্ষণ বিচলিতভাবে ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলে। ভাল করে সব কথা না জেনে না বুঝেও তার ধারণা জন্মে গেছে কানাই কাণ্ডজ্ঞানহীন, তার মাথা বিগড়ে গেছে অনেকখানি। সেদিন বিপ্লবী দলের বিশ্বাস, তেজ, একাগ্রতা আর আত্মবিশ্বাসের জন্য ক্লাসক্রেণ্ড কানাইকে

মনের মধ্যের মহাপুরুষের আসনে বসিয়েছিল। দু-চার মিনিটে ঘেঁটু আসনটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ভাল কি মন্দ জানে না পাঁচু, কানাই-এর মন স্বাভাবিক নেই। পাঁচু যে জগৎকে আর জীবনকে জানে, তার গাঁয়ের মানুষ, শহরের মানুষ, দেশের মানুষ—সবাইকার মোটমাট মনটা যেমন, কানাই-এর মন তেমন নয়। একটা উগ্র সুরে বাঁধা হয়েছে কানাই-এর মন, সে শুধু তার নিজের মনের মত করতে চায় সবাইকে, সে নিজের মস্ত বড় চাওয়ায় নিজেই একা সার্থক হতে চায়।

ওসব বোলচাল না দিয়ে, পাঁচু তীক্ষ্ণ চাপা গলায় বলে, খুলে সব বললেই হত ঘেঁটুকে। নাই বা করতিস নাটক। তুই ভাবিস কানাই, তুই একাই শুধু দেশকে ভালবাসিস, আর কেউ ভালবাসে না।

বুঝিস নে কিছু, চুপ করে থাক্।—কানাই গম্ভীর কিন্তু অমায়িক মাস্টার মশায়ের মত বলে, মিছেমিছে রাগ দেখালাম। কাল ফের আসবে, খানিকটা বুঝিয়ে দেব। অ্যাদ্দিন না বুঝে কাজ করছিল, এবার বুঝে করবে।

গোড়া থেকে বুঝিয়ে করালেই হত।

তাই কি সবাই বোঝে?

পাঁচু আরও রেগে বলে, কেউ কিছু বোঝে না, তুই একা সব বুঝিস? বোঝাটা তোর একচেটিয়া, না? কেউ যদি কিছু না বোঝে তোর কাজ নেই কিছু বুঝে, নিজের চরখায় তেল দে। আমরা সবাই ঘাস কাটব, একা তুই দেশোদ্ধার করবি!

রাগে পাঁচুর মেটে তেলা রং বাদামী হয়ে গেছে, ঠোঁট কাঁপছে দেখে কানাই যেন আমোদ পায়, বলে, তোরও একটু ন্যাকামি আছে, কি বুঝবি! জগতে কত মজা আছে, খবর রাখিস? বড়সড় মেয়ে দেখেই চোখ কপালে উঠেছে। ওর কি রকম টাকার খাঁকতি ছিল জানিস? এইটুকু বয়েস থেকে ওর মা এবাড়ী ওবাড়ী চার আনা আট আনা ধার চাইতে পাঠাত। এমন স্বভাব বিগড়ে ছিল, সুযোগ পেলেই চুরি করত। আমায় একটু ইয়ে করে, চুরির স্বভাবটা শুধরেছি, টাকার লোভ যায় নি। নইলে ওরকম গাঁজাখুরি গল্প বানিয়ে টাকা দিয়ে ওর হাতে মাল সরাই?

পাঁচু জল হয়ে যায়, লজ্জা পায়। বলে, ও বাবা, এমন মেয়ে !

ওই তো, কানাই বলে, ফের উল্টো বুঝলি। এমনি মেয়ে খারাপ নয়, বাড়ীর দোষে একটা দোষ পেয়েছে। তাও শুধরে আসছে আস্তে আস্তে।

সারা পথ মনটা তরফাতে থাকে পাঁচুর, রেলে ঘুমিয়ে কাটে, ষ্টিমারে দিনের বেলা নিজের ওপর বিরাগ নিয়ে কাটে। স্কুলে যেমন এখনো তেমন, বার বার তার কাছে স্পষ্ট হয় পাকাদের কানাইদের সঙ্গে কাপে কাপে খাপ খায় না, সে অযোগ্য। ষ্টিমার যেমন বিশাল নদীতে ভেসে চলে, অজানা আশ্চর্য্য নদী, মন তার তেমনি ভেসে চলেছে চিন্তা-সাগরে। সাগর কি-না কে জানে, হয়তো পুকুর হবে কিংবা ডোবা, মুখ্যু চাষার মুখ্যু ছেলে সে। নিজের দীনতায় হীনতায় পাঁচু কাতর হয়ে থাকে। শুধু শ্যামল যেন সেই আটুলিগাঁর বনের ধারের মাটির ঘর থেকে মানুষ-বোঝাই নদীর জাহাজে তাকে অনুসরণ করে। কাজ বল, পড়াশোনা বল, শ্যামলকে তো কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারবে না, কালীনাথ বা কানাই। রোজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই শ্যামল তাকে বুঝতে শিখিয়েছে, কি আগ্রহে শিখিয়েছে ! কেন সে তবে কিছুই বুঝবে না ?

আসলে এটা তার পাকার কাছে শেখা, আত্মগত এই প্রক্রিয়াটা, মনগড়া আত্মচিন্তার এই ব্যাকুলতা যে তার ওদেরই কাছ থেকে ধার করা, যাদের কাছে সে তুচ্ছ বলে ভাবছে নিজেকে, তাও পাঁচু জানে না। পাকার এরকম সর্ব্বদাই ঘটছে। পাঁচুর মাঝে মাঝে হয়। কানাই উগ্র বিদ্রোহ নিয়ে মরিয়া হয়ে কেটে বেরিয়ে গেছে, সে বলে, আমার বয়ে গেল। বলে, যা করব ঠিক করেছি, যা শুরু করেছি, তাই করে যাব—চুলোয় যাক দ্বিধা সংকোচ ভাবনা চিন্তার দোদুল দোলা !

স্কুল-জীবনের নিত্যকার সমীকরণের মধ্যেও তিন বন্ধু এই রকমই ছিল, তাদের বন্ধুত্বের জমাট করা মোট রূপটা ছিল এই দিয়েই গড়া। স্কুলের বাঁধন আর প্রতিদিনের মেলামেশা শেষ করে নিজের নিজের কেন্দ্রে কিছুটা তফাৎ হওয়া মাত্র তারা পরস্পরের পরিচয় প্রতিফলিত করছে। তাদের যোগসূত্র অবশ্য দেশজোড়া সন্ত্রাসী আন্দোলন, তাদের ঘনিষ্ঠতাও ওই অসহ্য ক্ষোভের চরম প্রকাশেরই আর একটা রূপ। তা না হলে, কে পাকা, কে

কানাই, কে পাঁচু, কিসেই বা তাদের বেঁধে রাখত, কোথায় ছিটকে চলে যেত তারা জীবনের বিভিন্ন গতির টানে! তিনু যেমন গেছে, ধনেশ মুদীর ছেলে তিনু। সেও আছে এই শহরেই, অত তার বন্ধুপ্রেম, তিন বন্ধুকে দোকানের লজেন্স বিস্কুট তামাক খাওয়াতে অত তার ব্যাকুলতা, কিছুই তো তাকে ধরে রাখতে পারল না বন্ধুচক্রে। তিনজনেই ভালবাসত তিনুকে। অথচ পাকাকে এত অপছন্দ করলেও, পাকাকে বর্জ্জন করলেও পাকার সঙ্গে নিবিড় যোগ কানাই-এর রয়েই গেছে: তিনজনের কারো আজ মনে পড়ে না এই সেদিনও তাদের যে আর একজন প্রাণের বন্ধু ছিল, সেই তিনু গেল কোথায়?

সাধারণ বন্ধুত্ব সুযোগ সুবিধার ব্যাপার। বিপ্লব বন্ধুত্ব গড়ে অন্যরকম। নতুবা জগতে বিপ্লবী হত কে?

৩

পাকার সংমার নাম সরমা। সতর বছর বয়স, গরীবের মেয়ে। এখানকারই গরীব স্কুলের গরীব মাস্টার সারদাচরণ তার বাপ। সৌন্দর্য্য চলনসই, স্বাস্থ্যটা সুন্দর। স্কুল-মাস্টার বাপ, তার ভাতে এমন শরীর এদেশে গড়ে ওঠে না। বাড়তি খাদ্য সংগ্রহের একটা আশ্চর্য্য প্রতিভা ছিল সরমার, পেয়ারা পাঁপর ছোলা চানাচুর বাদামভাজা তো বটেই, স্বভাবগুণে কয়েকটা বাড়ীকে বশ করে মেয়ের মত হয়ে ভাল খাদ্যও সে পেত। পাড়ার পাতানো মাসী পিসী খুড়ী জেঠী দিদি বৌদিরা তাকে দেখেই খুশি হত, শান্ত নরম স্বভাব, হাসিমুখে কথা বলে, দুঃখে কষ্টে দরদ দেখায়, সুখে সৌভাগ্যে আনন্দ পায়,—সবচেয়ে বড় কথা, বাড়ীতে এসে যেটুকু সময় সে থাকে, বাড়ীর মেয়ের মত না-বলতে সংসারের ঝঞ্চাট লাঘবে হাত লাগায়। ছেলেটা ধরা থেকে ভাতের হাঁড়িটা নামানো, ঘরটা ঝাঁট দেওয়া থেকে চট্ করে দুটো বাসন মেজে ফেলা, কোন কাজ করতেই তার অহংকার নেই তাই শুধু নয়, নিজে বুঝে নিজে এগিয়ে নিজে থেকে করে দেয়। মাছ মাংস দই মিষ্টির ভাগ তাকে না দিয়ে খেতে কয়েকটা পরিবারের রীতিমত মন খুঁত খুঁত করত।

বিশেষ কিছু রান্না হলে সে হাজির না থাকলেও ছোট ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনা হত: ও সরমা, আমি ডাল রেঁধেছি, ছাখ্ তো খেয়ে হয়েছে কেমন?

বাড়ীর কাজে ফাঁকি পড়ত, বাড়ীর মানুষ খাপ্পা হত, কিন্তু কোন শাসন মানত না সরমা। তার দারুণ খিদে, পেট ভরে না, বড় বড় কথা বললে চলবে কেন! যতটুকু খেতে দেবে ততটুকু খেটে দেব, ঘর-পর নেই।

না জেনে বুঝে ভদ্র সমাজের সব নিয়ম রীতি স্নেহ প্রীতির বাঁধন বজায় রেখে তারই মধ্যে এই নীতি গড়ে তুলে মানিয়ে চলা একটি মেয়ের পক্ষে সহজ প্রতিভার কথা নয়।

অরবিন্দের বয়স নিয়ে দারুণ ক্ষোভ হয়েছিল অবশ্যই। শত গরীবের মেয়ে হোক, বুড়োর কাছে বলি দেওয়াটা সব মেয়েই বোঝে, হোক সে বড় সরকারী চাকুরে, মস্ত পয়সাওলা লোক। এ বাড়ীতে মাছ দুধ খাবার-দাবারের অঢেল ব্যবস্থায় সরমা গোড়ার দিকে মরমে মরে গিয়েছিল। চিরদিন তার খিদে বেশি, তাই যেন সে প্রচুর খাদ্য পেল বরের বদলে। কিছুদিন কোন জিনিস তার মুখে রোচে নি, খেতে বসে ঠেলে ঠেলে দিয়েছে সব। তাতে একদিকে ভালই হয়েছে। নতুন বৌয়ের পক্ষে মানানসই ব্যবহার হয়েছে। খিদে ক'দিন বিগড়ে না গেলে প্রথম থেকে সে যদি খিদে মিটিয়ে খেত, অন্যে তো হাসাহাসি করতই, অরবিন্দেরও লজ্জা হত। খিদে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে সরমার যথাসময়ে, কিন্তু সে তখন বাড়ীর গিন্নী, কি সে খায়, কত খায়, ক'বার খায় কে তা দেখতে যাচ্ছে ঝি-চাকর ছাড়া, বিশেষত যে বাড়ীতে খাদ্যের ছড়াছড়ি, এমনিই কত নষ্ট হয়, ফেলনা যায়!

অনায়াসে সুখী হত সরমা, পাকা যদি না ছেলে হিসাবে পাগল হত সবদিক দিয়ে আর অরবিন্দ যদি না পাগল হত ছেলের সম্পর্কে। এতবড় ছেলে থাকার অসুবিধা সরমা সামলে নিত যে ভাবেই হোক, ও বিদ্যা বাঙালী মেয়ের জানাই থাকে, কিন্তু কেউ তাকে সে সুযোগ দিলে তো! ছেলেকে সরমা চোখে দেখার আগেই পাকা পাকা করে, কি হবে কি হবে করে, বিয়ে করার জন্ত হাহুতাশ পর্যন্ত করে, অরবিন্দই সরমাকে ভয়ে দুশ্চিন্তায় পাগল করতে বসেছিল।

তারপর আচমকা তাকে নিয়ে সেকেন্দ্রাবাদ ছোটা, সারাপথ কত উপদেশ কত সাবধান করা, এবং তারপর সেকেন্দ্রাবাদে ওইসব খাপছাড়া কাণ্ড। এখানে অরবিন্দ এক ঘরে শোয় না, সহজে কাছে আসে না, কথা বলে না, প্রায় তাকে বর্জ্জন করেছে। পাকার সঙ্গে আপস না হলে, পাকা অনুমোদন না করলে, সে যেন গায়ের জোরেই বাতিল করে রাখবে বিয়ে করাটা যতদূর তার সাধ্য, বিয়ে করা জলজ্যান্ত বৌটা বাড়ীতে বর্ত্তমান থাকলেও।

সরমা অগত্যা পাকার দয়া মায়া বিবেচনাই জীবনের আশাভরসা করে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। তোমার বাবা বিয়ে করেছে, তোমার বাবার বৌ হয়েছি, মা হয়েছি সেই সম্পর্কে তোমার,—অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেছি, মারো কাটো যা খুশি তোমার কর।

নতুন মামী সামলে সামলে শুধরে শুধরে চলে, সে একরকম সত্যিই কান ধরে পাকাকে ঢাকায় এনেছে, তার আপসহীন বিরোধকে সংযত করেছে, অনেকখানি ভেঙেও ফেলেছে।

যতই হোক, মা তো? নতুন মামী বলত।

মা? ও তো বাবার ইয়ে!

আজ আর পাকা এ ধরনের কথা বলে না। তবে মা বলেও ডাকে না সরমাকে। সুধা ছিল বলে আর অতি সম্প্রতি সে হাড়গোড় ভাঙা মরমর ছেলেটাকে ছা'র মত বুকে রেখে সারিয়ে তুলে একেবারে বশ করে ফেলেছিল বলে, নয়তো এ জীবনে হয়তো অরবিন্দ আর নাগাল পেত না ছেলের। সুধার প্রভাব দেখে ঈর্ষায় সরমার বুক জলে যায়, জীবনে সে এই প্রথম জেনেছে চাপা হিংসার জ্বালা কাকে বলে, যে হিংসা আগুনের মত পুড়িয়ে দিয়ে চলে। সম্পর্কে ছেলে, সে অন্যের বশ, এ জন্য তার হিংসা নয়। হঠাৎ-পাওয়া এতবড় ধেড়ে ছেলের জন্য অত তার মাথাব্যথা নেই। তার জ্বালা এই জন্য যে স্বামী বল, সংসার বল, মানসম্মান সুখশান্তি বল, সব ওই ছেলেটার মর্জ্জি দাঁড়িয়েছে বলে।

পাঁচুকে সে আদর যত্ন করে, পাকার সে বন্ধু। শুধু সেইটুকুতেই একটা অঘটন ঘটে যায়। তার বন্ধুকে খাতির করায় পাকা এবার দয়া করে মোটামুটি

ক্ষমা করে বসে নতুন মাকে, এতদিনের চেষ্টায় নতুন মামীও যা ঘটাতে পারে নি।

সুধা সরমাকে দিয়ে পাকার সেবা করিয়ে এসেছে, পাকা চেয়েও দেখে নি। চা খাবার সামনে দিয়ে গেছে, পাকা মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে থেকেছে অন্য দিকে। চা খাবারটা খেয়ে শুধু ধন্য করেছে সরমাকে নতুন মামীর খাতিরে। পাঁচুর ওসব বাধা নেই, প্রথম দিন প্রথম বারেই সে সরমার সঙ্গে সম্মান করে কথা বলেছে, অত খেতে পারব না, কমিয়ে দিন। ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করে সরমা আলাপ গড়ে তুলেছে, জেনে নিয়েছে তার গাঁয়ের খবর, ঘরবাড়ী আত্মীয়স্বজনের বিবরণ। দারিদ্র্য সরমা ভাল করে চেনে, সাধারণ অবস্থায় অরবিন্দের ঘরে এলে দারিদ্র্যকে সে আরো বেশি ঘৃণাই করত, কিন্তু অরবিন্দের প্রশ্রয়ের অভাবে আর পাকার লাঞ্ছনায় অবস্থা তার শোচনীয়। পাঁচুর সেবা যত্নে, তার সঙ্গে ভাব করায়, তার তাই বাধো বাধো ভাব আসে না, বরং পাকার বন্ধু এবং চাষার ঘরের হলেও ছেলেটি যে ভাল এটা জানা মাত্র তার উৎসাহ যায় বেড়ে।

দুদিন এটা দেখে পাকা একেবারে বদলে যায়। যেচে সে প্রথম কথা বলে সরমার সঙ্গে, সন্ধিঘোষণা করে বলে, নতুন মা, তুমি পিঠে বানাতে পার?

পারি। কি পিঠে? গলা কেঁপে যায় সরমার।

পাঁচু পিঠে ভালবাসে। নতুন মা বলে ডেকে সরমাকে পাকা পাঁচুর জন্য পিঠে করতে বলে, এও নাকি সংসারের অঘটন হয়ে ওঠে বিশেষ অবস্থায়! পাঁচু সেটা টের পাচ্ছিল। বাড়ীতে পারিবারিক জীবনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পাকাকে সে আগে কখনো দেখে নি। কানাই-এর কথা তার মনে পড়ে। পাকার সত্যি পাগলামি আছে। খাপছাড়া পাগলামি।

সরমা অরবিন্দকে জানায়, পাকা আমায় মা বলে ডেকেছে, হাসিমুখে কথা কয়েছে।

রাজা করেছে! বাড়ী থেকে ওকে দূর করে দেওয়া উচিত ছিল।

হঠাৎ অরবিন্দকেও সেদিন প্রফুল্ল প্রাণবন্ত দেখায়, অনেক দিন পরে অন্দরে তার এদিক ওদিক চলাচল ঘটে, এর সঙ্গে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। বৌ আর

ছেলে দু'জনকেই তার চাই, তাই এত অনায়াসে তার এমন বেহায়াপনা, দু'জনের একটু মিল হয়েছে শুনেই ঘোষণা করে যে সে খুশি হয়েছে।

সুধার পছন্দ হয় নি পাঁচুকে। তাকে না জানিয়ে পাকা বন্ধুকে আসতে লিখেছে এতেই প্রাণে আঘাত লেগেছে সুধার। কত ছোট ব্যাপারে কত বড় সত্যের ইঙ্গিত পায় একাগ্র উচ্চকিত প্রাণ! এখনো শরীর ভাল সারে নি পাকার, সুধার মতে মোটেই সারে নি, এরই মধ্যে একান্ত সুধার হয়ে বেঁচে থাকতে তার হাঁপ ধরেছে, সে অন্য সঙ্গী চায়, বাইরের বেপরোয়া উচ্ছৃঙ্খল জীবন চায়! এত তাড়াতাড়ি? চপল দুরন্ত পাগল ছেলে, কারো আঁচল ধরে সে থাকবে না, সে যেই হোক, সুধা তা জানে। একা সে পাকাকে বেঁধে রাগতে চাইবে কেন? কিন্তু এ তো নিয়ম নয়, এখনো তো সময় হয় নি! সে তবে কি? সে কি হাসপাতালের নার্স যে এত সস্তায় পাকা তার পাওনা মিটিয়ে দেবে? রাত নটা বাজতে না বাজতে সুধা পাঁচুকে বলে, ওকে আর রাত জাগিয়ো না। ওর শরীর ভাল নয়।

বেশ কড়া সুরেই বলে।

পাকা বলে, আমার ঘুম পায় নি।

শুলেই ঘুম পাবে।

পাকাকে শুইয়ে দিয়ে একদৃষ্টে তার মুখখানা দেখে। চোয়াল ভেঙে বাঁকা হয়ে গিয়েছিল পাকার মুখ, ডাক্তার যতখানি পারে সোজা করে দিয়েছে। কোমল হাতে ম্যাসেজ করে করে বাকিটুকু যদি সুধা ঠিক করতে পারে, নইলে কোন উপায় নেই। দিনে চার বার সুধা আধ ঘণ্টা করে ম্যাসেজ করে। প্রতি রাত্রে পাকাকে শুইয়ে এমনি আগ্রহে চেয়ে দেখে, কতটা উপকার হল।

পাকার দু'গাল হাতের তালুতে আস্তে চেপে ধরে সুধা বলে, সামান্য একটু এদিক ওদিক হলে কি হয়? আগের চেয়ে বরং সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার মুখ।

বিশ্রী দেখালে বয়ে গেল।

তোমার তো বয়েই যাবে। নিজের মুখ নিজে তো দেখতে পাও না! একটা চিঠি এসেছে তোকে দেখাই।

অনন্তের চিঠি। সে কড়া ভাষায় সুধাকে যেতে লিখেছে, জানতে চেয়েছে

সারা জীবনটা সে কি এখানে ওখানে ঘুরে ঘুরেই কাটাবে? বোঝা যায় কাজের ফাঁকে তাড়াতাড়িতে লেখা চিঠি, তবু রসালো করে কিছু ভালবাসার কথা লেখার চেষ্টা অনন্ত করেছে, একটা মন্ত্রীত্বের জন্য তার প্রাণপাত চেষ্টার মধ্যে। বিনা দ্বিধায় নির্বিচারে সুধা চিঠিটা আগাগোড়া পাকাকে পড়ে শোনায়, অনন্তের প্রেমপত্র যেন তার দাম বাড়াবে।

যাবে নাকি?

যাব না? আজ কতকাল হয়ে গেল কলকাতা ছেড়েছি!

পাকার কাছে আরো দাম বাড়াতে চায় সুধা। বাড়াতে বাড়াতে কোথায় গিয়ে ঠেকাবে তা সে জানে না, কিন্তু অন্য উপায়ও তার নেই। শুধু দাম বাড়ানো, নিজেকে দামী করা। সুদে আসলে সব উসুল করে নেবার সাধ্য তার আছে, কিন্তু সাধে বোধ হয় কুলিয়ে উঠবে না আর কোন দিন। আজকাল কত বার কত বিহ্বলতা আসে পাকার, কত বার হাত ধরে শাড়ি ধরে টানে, আচমকা গলা জড়িয়ে ধরে। সেটা সুধাকেই পরিণত করতে হয় ছোটছেলের মায়ের হাত ধরে টানায়, মায়ের গলা জড়ানোয়। কি রকম থমথমে মুখে স্নেহার্ত্ত গাঢ় চোখে শান্তভাবে চেয়ে ধীরে ধীরে পাকার কপালে হাত বুলিয়ে দিলে, ছোট একটি চুমু খেলে পাকা শিশুর মতই ঝিমিয়ে যায়, তার চেয়ে কে ভাল করে জানে?

মাঝে মাঝে তাই অসহ্য জ্বালায় অদম্য আক্রোশে সুধা জ্বলে পুড়ে ফেটে যেতে চায়। কেন শান্ত হয় পাকা? সব দিকে দুরন্ত অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল, কোন শাসন, কোন বাঁধন মানে না, বয়সের সীমা পার হয়ে অভিজ্ঞতার দূর দূরান্তরে রহস্য আবিষ্কার করতে ছটফট করে, এক দিনও কি সে অবাধ্য হতে পারে না তার স্নেহের, অমান্য করতে পারে না তাকে?

আমি তবে কাল-পরশু চলে যাই?

ইস্!

তেমনি পরিচিত বিহ্বল দৃষ্টি, কামনার অতল স্বপ্ন। সুধার স্পষ্ট মনে হয়, এ সময় পাকা যেন একেবারে ভুলে যায় সে কে এবং সুধাই বা কে! দু'হাত ধরে এত জোরে তাকে টানার মত স্পষ্ট বাস্তব চাওয়াও তার তাই এত অসুগ্র,

তার ব্যাকুলতা এত নিস্তেজ। এর মানে সুধা জানে না, বোঝে না। তার বুক ফেটে কান্না আসে।

ইস্, যেতে দিলে তো?

কে যাচ্ছে? তোকে ছেড়ে যেতে পারি পাগল? সুধা নত হয়ে তার কপালে গাল রাখে, মাথা তুলে বলে, ঘুমোবি না? কপালে চুমু খেয়ে বলে, এবার ঘুমো?

মশারি ফেলে আলো নিভিয়ে সুধা চলে যায়, পনের মিনিট পরে এসে দেখে পাকা ঘুমিয়েছে। পাঁচুর সঙ্গে সারা দিন ঘুরে বেড়িয়েছে এই শরীরে, ঘুম তো আসবেই।

সে এখন করে কি, তার তো ঘুম আসবে না অর্দ্ধেক রাত, হয়তো সমস্ত রাত! কাল সে করবে কি, পরশু, তার পরের দিন? আলো জ্বেলে মশারি তুলে পাকার সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলায় সুধা, কপাল থেকে এলোমেলো চুল সরিয়ে দেয়, সন্তর্পণে স্পর্শ করে দেখে বাঁ চোয়ালের যেখানটা আজও একটু ফুলে আছে। উঠছে পড়ছে ঘুমন্ত পাকার বুক। কি হবে তবে, কি করা যাবে? সে বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে, সুধা ভাবে। কিন্তু পাগল যদি হয়েই থাকে, ভুলতে কেন পারে না যে এই তার পাকা, তার এই পাকার সারা জীবনটা সামনে পড়ে আছে। কেন শুধু মনে থাকে যে বিপ্লব করতে গিয়েছিল বলে পুলিস থেঁতলে দিয়েছিল বলে পাকাকে বুকের মধ্যে পাওয়া গেছে, নইলে ওকে ধরার সাধ তার স্বপ্ন থেকে যেত। সংসারে কত রকম মেয়েপুরুষের কতরকম ভালোবাসা হয়, কে না জানে বয়সের হিসাব সম্পর্কের হিসাব কত শত বার সংসারে ভেসে গেছে, কত শত বার ভেসে যাবে। তারও ভেসে গেছে ওসব তুচ্ছ হিসাব, কি গ্লানি কত অনুতাপ কোন্ যাতনায় সারা জীবন দগ্ধে দগ্ধে মরবে সে জানতেও চায় না। কত নরকের কীট জন্মেছে সংসারে, সেও নয় আর একজন হল। সব সে মেনে নিতে রাজী, শত শত বার রাজী। জগৎ সংসার চুলোয় যাক। পাকার বাকি জীবনের হিসাব কেন তবে তাকে এমন ব্যাকুল করে, তার হৃদ্‌স্পন্দন থামিয়ে দিতে চায়? এ তো নিয়ম নয়, সঙ্গত নয়! তার মত যারা সংসারের অভিশাপ হতে চেয়েই পাগল হয়েছে, কেউ তারা এই বিপরীত হিসাব কষে নি। তার এ কি হল?

এই সেদিনও, পাকা মরণাপন্ন হবার আগে, বুঝি সম্ভব ছিল ভাবা যে কিছু হবে না পাকার, একদিন ভুলে যাবে সব, মনের তলায় চাপা পড়ে যাবে জীবনের একটা পুরনো অধ্যায়, মাঝে মাঝে শুধু নতুন মামীকে মনে পড়ে হয়তো একটু ব্যাকুল, একটু আনমনা হয়ে যাবে।

আজ ওই ভুলে যাওয়া অত সহজ নেই, ভুলে যাওয়ার ভয়ঙ্কর মানে তার আতঙ্ক এনে দেয়। খেলা আর উন্মাদনা দুদিনের বেশি টানা যাবে না, তারা ফুরিয়ে যাবে, তাদের ছাড়াছাড়ি হবে, এসব সবাই জানে, সবাই বাতিল করে উড়িয়ে দেয়। আজ এই তাৎপর্য্যটাই বড় হয়েছে, ভোলা যায় না, তুচ্ছ করা যায় না। পাকাকে নিয়ে সে যদি দেশ ছেড়ে পৃথিবীর অপর প্রান্তেও পালিয়ে যায়, দুদিন পরে তারা ফুরিয়ে যাবেই। তা যাক। কিন্তু তার পাকার তখন হবে কি!

কি হল তার, কেন এমন ভাবে সব গুলিয়ে যায়, সে তো এমন ছিল না! ছেলেবেলা থেকে মানুষের মন ভুলানো শিখে এসে এসে ছেলেখেলা হয়ে গিয়েছিল জীবন, একটি কিশোর তার মন ভুলিয়েছে জেনে জীবনে প্রথম কি বিস্ময় কি রোমাঞ্চ জেগেছিল, কি পুলকের স্বাদ পেয়েছিল! তারপর থেকে শুধু জয় করেছে, বশ করেছে ওই কিশোরটিকে, জগৎ সংসার সব ভুলে থেকেছে। তার এত রূপ এত মায়া তবু পাকা সাড়া দেয় না বলে তার বেঁচে থাকার রুচি ছিল না, কষ্টে পাগল হতে বসেছিল। আজ সেই পাকা বিহ্বল ব্যাকুল চোখে তাকায়, হাত ধরে আঁচল ধরে টানে, গলা জড়িয়ে ধরে। আর সে তাকে আজ শিশুর মত স্নেহে ভুলিয়ে শান্ত করে ঘুম পাড়ায়।

চলে যাবে? কাল সকালেই বিদায় হবে চিরদিনের মত, আর যাতে পাকার সঙ্গে দেখা না হয়? কিন্তু পাকা যদি মুষড়ে যায়, ওই অভিমানী পাগল ছেলে? স্নেহ মমতা যত্নের অভাবে যদি মরে যায় অন্য কাণ্ড করে?

মশারির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সুধা নিঃশব্দে কাঁদে। আলোটাও নেভায় না। তার রূপ তার শাড়ি ঝলমল করে আলোয়। মোটরে সোফায় পালঙ্কে ঘরকন্নার হাসি গান আনন্দে উজ্জ্বল যে ছিল আর যার জীবনটা মানুষের চোখ আর মনকে ঝলসে দিত।

৪

পাঁচু পিস্তলের কথা বলে। পাকা সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

দুটোই নিয়ে যাস্।

পাঁচু বুঝিয়ে বলে যে দুটো নিয়ে কাজ নেই, বিশেষভাবে একটার কথাই যখন বলা হয়েছে, নির্দ্দেশটা মেনে চলাই ভাল। তার নিয়ে যাওয়াও ঠিক হবে না। দুদিনের জন্যে বেড়াতে এসে সে চলে গেল আর এদিকে পিস্তল চুরি গেল—

সে আমি সামলে নেব। এক মাসের মধ্যে বাবা টের পাবে না।

একটা পিস্তল তোলা থাকে, সেটা পাকা অনায়াসেই দিতে পারবে। সহজে কারও খেয়াল হবে না ওটা চুরি গেছে। নেহাৎ যদি ধরাই পড়ে, পাঁচুর ওপরে যাতে সন্দেহ না হয় পাকা সে ব্যবস্থা করতে পারবে। এত ভাববে কেন পাঁচু এই সামান্য ব্যাপারে? কালীদা'দের কত দরকার পিস্তলের, পাকা দিতে চায় তবু পাঁচু নিয়ে যাবে না? কিসের ভয় এত? দিন দশেক পাঁচু এখানে থাকে। এ বাড়ির অনভ্যস্ত জীবন তাকে পীড়ন করছিল। পাকাকে অবলম্বন করে বেশির ভাগ সময় কেটেছে তার, নইলে দু'দিনও সহ্য হত না, যদিও এক নতুন মামী ছাড়া বাড়ীর লোকের ব্যবহার হয়েছে নিখুঁত। সুধাও তাকে অবজ্ঞা অপমান করে নি, শুধু অভাব ঘটেছে তার সদয় ব্যবহারের। তাকে যেটুকু দেখেছে শুনেছে পাঁচু তাতেই তার মনে এক রহস্যময় ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। রানীর মত এত জমকালো রূপ এমন মহারানীর মত চলনবলন, পাকার মশারির পাশে একা দাঁড়িয়ে সে কাঁদে!

গল্প করে রাত জাগবে বলে অসুখের অজুহাতে সুধা তাদের দু'বন্ধুকে এক ঘরে শুতে দেয় নি। পাকাকে একটা কথা বলতে গিয়ে পাঁচু সুধাকে পাকার বিছানায় মশারির নালে ঠায় দাঁড়িয়ে অদ্ভুত এক বিকৃত মুখভঙ্গি করে কাঁদতে দেখে ভড়কে গিয়ে পাকার ঘরের দরজার কাছ থেকে ফিরে এসেছিল।

পরে সে পাকাকে প্রশ্ন করেছে।

কাঁদছিল? সত্যি? আমি তো জানতে পারি নি!

আর কিছুই পাকা বলে নি।

দু'জনে ঘুরে বেড়িয়েছে শহরে মফস্বলে নদীতে নৌকায়, আগের মত উদ্দেশ্য-হীনভাবে পাক খেয়ে বেড়ানোর চূড়ান্ত করে কিন্তু নয়। পাকাকে এমন শান্ত, এত নিস্তেজ পাঁচু আর দেখে নি। যে অস্থিরতা আছে আগের তুলনায় তা কিছুই নয়। তবে শরীরটা তার সত্যই সারে নি, দুর্ব্বলতা রয়ে গেছে। মনটাও সামলে উঠতে পারে নি টের পাওয়া যায়। এ যেন সবার সেরা প্রমাণ যে শুধু প্রাণটুকু রেখে কি অমানুষিক নির্য্যাতনটাই করা হয়েছিল, পাকার মত ছেলে এতদিন পরেও গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারছে না। পাঁচুর ক্রোধ আর বিদ্বেষ নাড়া খেয়ে গুমরে গুমরে ওঠে। এই কারণেও মনটা তার আরও ছটফট করে ফিরে যেতে। নলিনীর কিছু করা হয় নি, দিন এদিকে চলে যাচ্ছে একে একে।

পাঁচু ভাবে, তাদের শহরে ফিরে গেলে হয়তো তাড়াতাড়ি পাকা সেরে উঠত।

পাকা বলে, যেতে দেবে না।

শুনে পাঁচু স্তম্ভিত হয়ে যায়। যেতে দেওয়া হবে না বলে পাকা কোন জায়গায় যাবে না, করতে দেওয়া হবে না বলে পাকা কোন কাজ করবে না, পাকার মুখে একরকম বশ্যতা বাধ্যতার কথা সে এই প্রথম শুনল।

পাঁচু একটি পিস্তল নিয়ে যায়। সঙ্গে নেবার নির্দ্দেশ তাকে দেওয়া হয় নি, পাকার উৎসাহে এটুকু নিয়ম সে ভঙ্গ করে। কিন্তু দুটি নিয়ে যেতে রাজী হয় না, পাকা ভীরু বলে গাল দেওয়া সত্ত্বেও।

বাক্সে তোলা পিস্তলটি নিয়ে পাঁচু চলে যাবার এক সপ্তাহের মধ্যে কালীনাথের কাছ থেকে আর একজন আসে পাকার কাছে। পাঁচুর কাছে শোনা গেছে পাকা দুটি পিস্তলই দিতে পারে বিশেষ হাঙ্গামা না করে। তা কি সম্ভব? বিনা দ্বিধায় পাকা অরবিন্দের ড্রয়ার খুলে দ্বিতীয় পিস্তলটি চুরি করে এনে দেয়।

কিছু টাকা এবং খানকয়েক গয়নাও দেয়।

পাকা সরমাকে বলে, নতুন মা, তুমি দেশকে ভালবাসো ?

ওমা, দেশকে কে না ভালবাসে !

মুখে তো সবাই ভালবাসে। সত্যিকারের ভালবাসা আছে ? ত্যাগ করতে পার দেশের জন্য ?

কেন পারব না ? বলো কী করতে হবে, করছি।

তোমার কয়েকটা গয়না দাও, স্বদেশীদের জন্যে পারবে দিতে ? ওরা প্রাণ দিচ্ছে, তুমি ক'টা গয়না দিতে পারবে ?

সরমার মুখ হাঁ হয়ে যায়, বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ পলক পড়ে না, কয়েকবার সে ঠোঁট চাটাচাটি করে। তারপর বলে, দিচ্ছি।

দু-একখানা গয়না নয়, ট্রাঙ্ক খুলে গয়নার বাক্সটা সরমা পাকাকে এনে দেয়। বলে, নাও, আমার যা ছিল সব দিলাম। তুমি আমায় যেমন ভাব, আমি তেমন নই পাকা। আমিও মানুষ। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে সরমার।

পাকা অভিভূত হয়ে বলে, বাক্সো শুদ্ধু যে দিলে, বাবা টের পেলে কি হবে ?

সে হবে'খন। গয়না কি কারো চুরি যায় না ?

সরমা জলভরা চোখে মুচকে হাসে। পাকার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে যায়।

পরদিন সকালেই অরবিন্দ পিস্তলের অন্তর্ধান টের পায়। ড্রয়ারে ছিল সরকারী রিভলবার, ওটা অরবিন্দের সঙ্গেই থাকে, সেটাই নিয়ম। অন্য ড্রয়ারগুলি খুলে, আলমারি হাতবাক্স খাটের তোশকের তলাটা একবার খুঁজে দেখে খোলা ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়েই গম্ভীর কালো মুখে সে ভাবে। অনেকক্ষণ ভাবে। মাঝখানে শোবার ঘরে গিয়ে বাক্স খুলে দেখে আসে, অন্য পিস্তলটিও সেখানে নেই। ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে বিরাগে তার গা কাঁপে, দাঁড়াতে না পেরে চেয়ারে বসে সে ভাবে।

সফল সার্থক তার জীবন, কত বড় চাকরি করে, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব, আগের এক স্ত্রী, তার ছেলে, নতুন দ্বিতীয় স্ত্রী, কত কিছু নিয়ে তার জীবন।

আজ একদিনে একমুহূর্তে তাসের ঘরের মত সব ভেঙ্গে পড়েছে। পাকা তার ছেলে। একমাত্র ছেলে। ছেলে যার শত্রু হয় সে কেমন করে সামঞ্জস্য বিধান করে জীবনে?

চুপ করে বসে থাকে অরবিন্দ। সারাজীবন সে নিয়ম মেনেছে, আইন মেনেছে। সরমাকে সে ঘরে এনেছে আত্মীয় বন্ধু সমাজ ধর্মের রীতিনীতি নিয়ম সমর্থনে। বিরোধ করেছে শুধু পাকা।

নেয়ে খেয়ে নেওয়ার তাগিদ এলে অরবিন্দ বলে, আপিস যাব না। শরীর খারাপ।

ড্রাইভার গাড়ী বার করেছিল, যথাসময়ে গ্যারেজে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তকমা-আঁটা চাপরাসী এসে সেলাম করে ধমক খেয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় নেমে বলে, শালার মর্জ্জি নাই আপিস যাবার, আগে বললেই হত।

নেয়ে খেয়ে শোয় অরবিন্দ। ছুটির দিনে স্বামীকে দুপুরের সেবা দিতে গিয়ে সরমা ঝাঁজালো ধমক খায়। সমান ঝাঁজে জবাব দিয়ে সরমা মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ে।

বেলা চারটে নাগাদ অরবিন্দ পাকাকে ডেকে পাঠায়। গড়গড়ায় নল ধরে সে খাটে বসে ছিল, পাকা ঘরে এলে বলে, চেয়ারটা টেনে এনে বোসো।

পাকা নীরবে আজ্ঞা পালন করে। আজ সে ভাল ছেলে। অরবিন্দ বলে, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেসা করতে চাই। জবাব দিতে না চাও দিও না, কিন্তু মিথ্যে কথা বোলো না।

আমি মিথ্যে বলি না বাবা।

মিথ্যে বলে না! তার মানে যদি সে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি আমার পিস্তল চুরি করেছ? পাকা বলবে, হ্যাঁ চুরি করেছি!

তারপর কি হবে?

তারপর কি করবে অরবিন্দ?

গড়গড়ার নল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অরবিন্দ বলে তুমি অপদার্থ হয়ে গেছ, অধঃপাতে গেছ একেবারে। দুদিন পরে তুমি কলেজে ভরতি হবে, আজও ঠিক করলে না আমায় জানালে না, আর্টস পড়বে না সায়ান্স পড়বে?

কেন? সেদিন যে বললাম আমি সায়ান্স পড়ব?

বলেছিলে নাকি? মনে নেই।

পরদিন অরবিন্দ মফঃস্বলে যায়। কয়েকদিন পরে ফিরে এসে সে রিপোর্ট দাখিল করে যে সোনাগাঁর কাছে ডিঙি-নৌকায় নদী পার হবার সময় ডিঙি উল্টে সে নদীতে পড়ে যায়, অতি কষ্টে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছে বটে, কিন্তু সরকারী রিভলভারটি নদীতে খোয়া যায় অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে। সরকারের সে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে তাকে জানাতে হচ্ছে যে চলাচলের এমন অবস্থার মধ্যে তাকে কাজ করতে হয় যে শুধু স্বাস্থ্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে না, প্রাণ নিয়ে পর্য্যন্ত টানাটানি পড়ে।

অরবিন্দ বুঝতেও পারে নি যে চিন্তায় ভাবনায় দিশে হারিয়ে কি কড়া আর ঝাঁজালো রিপোর্ট সে পেশ করেছে ডিঙি উল্টিয়ে নদীতে পড়ে রিভলভার হারানোর গল্প ফেঁদে। দপ্তরে সাড়া পড়েছে। ওপরওয়ালাকে নাড়া দিয়েছে। একুশ বছরের ব্রিলিয়াণ্ট সার্ভিস, একুশ বছরের কর্ত্তব্যপরায়ণ দায়িত্বশীল নিখুঁত চাকর। কত ফাঁকিবাজ রায় বাহাদুর হয়ে গেছে, অরবিন্দ আজ পর্য্যন্ত কোন পুরস্কার পায় নি। রিপোর্টের জবাবে হঠাৎ এক মাসের মধ্যে অরবিন্দ উচ্চতর গ্রেডে উঠে গেল। নববর্ষের লিস্টে সে রায় বাহাদুর হয়ে গেল।

কিসে কি হয়!

বার

১

সত্য কথা বলতে কি, ঢাকার অভিজ্ঞতা সুখকর হয় নি পাঁচুর পক্ষে। ঢাকার জন্য তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। সে টের পেয়েছে পাকা অসুস্থ, তার শরীর মন এখনো ধাক্কা সামলে উঠতে পারে নি। শুধু তাই নয়। •একেবারে সেই চূর্ণবিচূর্ণ অচেতন অবস্থা থেকে সে আটকা পড়েছে ন্যাকামির ফাঁদে, যাতে আহ্লাদী ন্যাকা পুতুল তৈরি হয়। নমুনা দেখে এসেছে পাঁচু। আগেকার পাকাকে যা নাগাল পায় নি, যার ছোঁয়াচ পেলে পাকা হাঁসফাঁস করত, কাবু অবস্থায় পেয়ে পাকাকে তাই আচ্ছন্ন করেছে। এ ব্যাপার পাঁচু জানে, বড়লোকের ঘরে একচেটিয়া হলেও গরীবের ঘরে যে একেবারে হয় না তা নয়। যেমন কায়েতপিসীর ছেলে রতন। নিজে প্রাণপাত কষ্ট করে ছেলেটাকে হাবা করেছে। বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা, আজও পিসী তাকে চোখের পলকে হারায়। মায়ের আঁচল ছাড়া রতনেরও চলে না, বোকার মত কি ভোঁতা মিনমিনে তার কথা আর হাসি, আপিমের নেশায় যেন ঝিমিয়ে আছে সর্ব্বক্ষণ!

পাকাকে যদি এরা তাড়াতাড়ি দলে টেনে নিত, ছিনিয়ে আনত ওই নতুন মা নতুন মামীদের কবল থেকে!

শ্যামল হাসে। অত ভাবছ কেন? ডানপিটে ছেলে, দু'দিন আদর খেয়ে ও ছেলে কখনো বিগড়ে যায়? গায়ে জোর হলেই ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। দু'দিন থাক না ওষুধ।

মাঝখানে একটু ভাল হয়ে শ্যামলের শরীর আবার খারাপ হয়েছে। ভাঁটার অবস্থাই শরীরের, ওর মধ্যে একটু উনিশ-বিশ। মনের জোর? মনের জোর কি শরীরের জোরের ওপর নির্ভর করে? তেজের জন্য পালোয়ান হতে হয় না, পাঁচু তা জানে, সে কথা নয়। এই রোগজর্জ্জর দুর্ব্বল ভাঙা শরীরে জীবন ধীরে

ধীরে অন্ত যাচ্ছে শ্যামলের, তার তবে এত মানসিক শক্তি আসে কোথা থেকে? হয়তো শ্যামলের সঙ্গে পাকার তুলনা হয় না। সারাজীবন একটানা প্রতিরোধের মধ্যে শ্যামলের মনের জোর গড়ে উঠেছে, পাকা এখনও যে সুযোগ পায় নি। একদিকে একভাবে শক্ত কঠিন হয় নি তার মন, এখনো নড়বড়ে হয়ে আছে, কাদায় পোঁতা খুঁটির মত এদিক ওদিক উল্টেপাল্টে হেলে পড়ে চাপ লাগলে।

তা ছাড়া শ্যামলেরও দুর্ব্বলতা আছে। সেটা যে নিছক দৈহিক দুর্ব্বলতার জন্যই, পাঁচু ক্রমে ক্রমে তা টের পাচ্ছিল।

তার নিজের দুর্ব্বলতা?

এই একটা মজা হয়েছে পাঁচুর বেলা। চাষার ঘরে জন্ম, সেই ঘরেই বসবাস, চাষাদের সঙ্গেই নাড়ীর যোগ, এদিকে জীবনের পরিধি হয়েছে বিস্তৃত, একেবারে দেশের বিপ্লবী-জীবনের অগ্রগণ্য চেতনার প্রান্ত ছুঁয়ে। ডোবা হয়ে নালা বেয়ে সাগর ছুঁয়েছে, ওই অসীম অগাধ জীবনের জোয়ার-ভাঁটা তার জীবনেও বয়। শহরে পড়তে গিয়ে অন্য জাতের ক'জন লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বলে খুব বেশি আসে যায় না। চেনাজানা অভ্যস্ত পুরুষানুক্রমিক ছোট হেঁটো ডোবায় ডুবে থাকলে কোন হাঙ্গামা নেই। গাঁয়ের আরও দু-চারটি চাষীর ছেলে খানিক লেখাপড়া শিখেছে, পাঁচু একা নয়। একটু অন্যরকম, একটু খাপছাড়া হলেও তারা মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে, লেখাপড়া ভুলেটুলে গেছে, বেনো জল ঝেড়ে ফেলেছে। পাঁচুর হয়েছে এই মুশকিল যে চুঁইয়ে গড়িয়ে আসা জল যেন নয়, জীবন-সমুদ্রের তরঙ্গ এসে হানা দিয়েছে তার ডোবায়—বেচারী ছেলে-মানুষ, জমি-চষা চাষীর ছেলে। স্রেফ সে ভুলে গেছে নিজের কথা। নইলে এত বৈচিত্র্য, এত রোমাঞ্চ, এত অর্থকরী সম্ভাবনার ইঙ্গিতগুলির সঙ্গে সে এঁটে উঠতে পারত না। সে সবল কি দুর্ব্বল, বাহাদুর কিংবা সামান্য, বিচার বিবেচনার অধিকারী অথবা বেয়াদপ, সব ভাববারও তার সময় নেই, দ্বিধা সংশয় প্রতিক্রিয়াও নেই। কদাচিৎ তার যে আত্মবোধ জাগে বিষাদ বেদনার গ্লানির রসে টইটম্বুর হয়ে পাকার আহ্বানে ঢাকা যাবার সময় স্টিমারে এবং ঘুমন্ত পাকার খাটের মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে নতুন মামীর আলুথালু বেশে কান্না দেখার রাত্রে, তাও আসলে পাঁচুর নিজের কথা ভেবে

নিজে বিচলিত হওয়া নয়। তার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নেই, সে কেন ওরকম নিদারুণ মনোকষ্ট পাবে পরের জীবনের বিরোধ আর জটিলতায়! জীবনে যত নতুনত্ব এসেছে ওটা তার সে সব আয়ত্ত করারই প্রক্রিয়া। কালীনাথ বল, শ্যামল বল, পাকা বল, কানাই বল—আত্মচিন্তা ওদের পাগল করেছে, আমিত্বের পরাধীনতা ওদের বেঁচে থাকাই ব্যর্থ বিশ্রী বেদনাদায়ক করে স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য ফাঁসিকাঠে ঝুলে ঝুলে মরাকেও বড় করেছে। ওদের সংস্পর্শে এসে এই জ্বালার ভাগও পাঁচুকে নিতে হয়—বিরোধী জগৎকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে ফেলার যে আকাশ-ছোঁয়া স্পর্দ্ধা পাকার, সে স্পর্দ্ধার সামান্য অংশটুকু পেতে হলেও জগৎকে বিরোধী করায় যে দারুণ মনোকষ্ট তারও একটু ভাগ না নিয়ে উপায় কি!

গাঁয়ের সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে পাঁচুর ঘনিষ্ঠতার প্রবল জোয়ার-ভাঁটা ঘটে থাকে। শহরে থাকার সময় দূরত্ব আসে, লম্বা ছুটিতে গাঁয়ে এলে প্রথম কিছুদিন অসুবিধার পর ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। তবে শেষ পর্য্যন্ত খানিকটা ব্যবধান থেকেই যায়। একেবারে কেঁচে গণ্ডূষ করার সাধ্য পাঁচুর আর নেই। তাদের সমাজের আরও দু-চারটি ছেলে স্কুলে পড়েছে, দু'বছর আগে রাধানাথ ম্যাট্রিকও পাস করেছে। স্কুলের বিদ্যার যে মানে নেই, নিছক ফাঁকি, ওরা তার প্রমাণ। গাঁয়ে সমাজে পরিবারে নিজেদের ঠাঁই করে নিতে সব বিদ্যা স্রেফ ভুলে মেরে দিয়ে বসে আছে, কোন কাজেই লাগে না। একটা অকাজে লাগে, সেটা অহমিকা,—আমার পেটে বিদ্যা আছে, আমি স্কুলে পড়েছি! চিঠিপত্র লেখার কাজ পর্য্যন্ত হয় না ওদের দিয়ে, চর্চ্চা নেই, ভয় পায়, ভুল হবে, ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে! রাজেন ক্লাস সেভেন পর্য্যন্ত পড়েছিল, তার বাবা চিঠি লেখাতে আসে পাঁচুকে পয়সা দিয়ে।

পাঁচুও হয়তো ওদের মত হত। কিন্তু তার অন্য জগতের ছোঁয়াচ লেগেছে। শুধুই সে বিদ্যা লাভ করে নি।

এবার পাঁচুর বিদ্যালাভের কাজ থেকে ছুটিটা সুদীর্ঘ, হয়তো বা চিরদিনের জন্যই। নিজের অজান্তে নিজেকে কেন্দ্র করে আটুলিগাঁর চাষা-ভুষো ছেলেদের একটা দল পাঁচু গড়ে তুলছিল। এরকম একটা সংগঠন গড়ার কথা সে ভাবে নি,

সংগঠন যে গড়ে উঠেছে নিজে সে এটা টেরও পায় নি, মন তার ছিল অন্য দিকে। হাটে ঘাটে মাঠে এই সব ছেলেদের এর ওর তার সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা হয়, ইয়ার্কি ফাজলামি চলে, হাসাহাসি ঝগড়াঝাটি রাগারাগি হয়,—দেশের কথা ওঠে।

দেশের কথাটা উঠবেই।

যেমন, রাজেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে গোয়ালপাড়ায়। রাজেন এসেছে বাছুর নিতে, তাদের গরুটার বাছুর গেছে মরে, দুধ দুইতে বাছুর লাগে। নিজের বাছুর পরের বাছুর সোনা বোঝে না, যে কোন বাছুর সামনে পেলে তার গা চেটে সে বাঁটের দুধ খুলে দেয়—বাছুর ছাড়া বাঁটে হাত দিতে গেলে শিং নেড়ে পা ছুঁড়ে লাফিয়ে সোনা হুলুস্থুলু বাধিয়ে দেয়।

পাঁচু এসেছে ষাঁড় খুঁজতে, দেশী ছোট ষাঁড়। মেজবাবুদের খেয়ালের ষাঁড়ের মিশেল বাছুরটা বিয়োতে আর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে লক্ষ্মীর প্রাণান্ত হয়েছে—তাকে পোষাটাই দাঁড়িয়েছে লোকসানে। গাই-বলদকে লোকসানে পুষতে হলেই হয়েছে চাষীর নিজের বেঁচে থাকা! লক্ষ্মীর এবার ছোটখাট দেশী বাছুর হোক, আর মিশেলে কাজ নেই।

এই ভাবে দেখা। কি উদ্দেশ্যে দুজনের গোয়ালপাড়ায় আসা প্রথমে সেটা জানাজানি হল। চাষাড়ে টিপ্পনি হল গরু বাছুর মানুষ মিশিয়ে : মেজোবাবুর সেজোবৌ নিজের বাচ্চা হারিয়ে গরীব চাষীর বাচ্চাদের জন্য গাঁয়ে শিশু-নিকেতন খুলছে, ছোট একটা আটচালায়। এবং শিকারের ছুতায় যে বিলাতী সায়েবটা ঘন ঘন আসে তার কল্যাণে মেজোবাবুর নিরুদ্দেশ মেজো ছেলের বৌ মিশেল বাচ্চা বিয়োতে গেছে হাসপাতালে। এই সব রসালো আলোচনা।

কলকাতায় কি করে জানিস? পাঁচু রহস্যের সুরে শুধায়।

কি করে?

বাছুর মরে গেলে চামড়াটা খড়ে জড়ায়। তাই সামনে ধরে গরু দোয়।

কলকাতায় সব ফাঁকিবাজি, চোরের আড্ডা। কাকার সেবার গাঁট কাটলে, পুলিস একটা টাকা নিলে কাকার ঠেঁয়ে। চোর ধরলে খবর দেবে।

হবে না? ইংরেজ আছে মোদের গাঁট কাটতে, যেমন কত্তা তেমনি চাকর।

যে কথাতেই শুরু হোক, দুই কিশোরের আলাপে ইংরেজ আসবেই, ইংরেজ এলেই আসবে আনুষঙ্গিক শোষণ পেষণ দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ মহামারীর কথা এবং তারপর সহজে সস্তায় পরাধীনতার অভিশাপ যে ঘুচবে না এই সিদ্ধান্ত।

এই সাতাশ-আঠাশ সালের দেশ-জোড়া দুর্দ্দিনে এদেশের কোন ছেলেবুড়োর আলাপে এসব কথা না উঠে পারে? আঁতুড়ের শিশুও টের পায় তার সর্ব্বাঙ্গীণ অভিশাপের কারণ কি। কিন্তু পাঁচুর আলাপটা ঠিক তেমন নয়। একুশ সালের উদগত আশা স্বপ্ন হয়ে গেছে, বোমারুদের অদ্ভুত দুঃসাহস ছাড়া চারিদিকে নিষ্ক্রিয় ক্ষোভ, কলকারখানায় ধর্ম্মঘটের শ্রীবৃদ্ধিতে স্বাধীনতার ইঙ্গিত সবার চোখে পড়ছে না, বিদেশীর শাসন আর নিজের দেশ নিয়ে সাধারণ মানুষের নিষ্ক্রিয় অবসাদের অফুরন্ত আলোচনা শেষ হচ্ছে হতাশায়। নাঃ, এদেশের স্বাধীনতা সহজে নয়, সস্তায় নয়। তার মানে কিন্তু মানুষ এই বুঝছে না যে মুক্তি সহজে যখন হবে না তখন সেজন্য কঠোর লড়াই করি, সস্তায় যখন হবে না তখন চরম মূল্য দিই—সবার ভাবখানা এই যে কি আর করা যাবে, আমাদের মন্দ কপাল! কে জানে কবে কি ভাবে দেশের ভাগ্য ফিরবে? অন্য অঞ্চলের অন্য জেলায় গ্রাম আরও ঝিমিয়ে গেছে। পাঁচুদের এগুলি লড়ায়ে গ্রাম, খাজনা বন্ধের তুমুল সংগ্রাম হয়ে গেছে এদিকে, আজও ক্ষতচিহ্ন চোখে পড়ে। এদিকের হতাশায় রীতিমত বুক পুড়ে যায়, খুচখাচ আন্দোলনের নামে দারুণ অবজ্ঞা জন্মায়—তার চেয়ে কিছু হবে না ধরে নিয়ে দাওয়ায় বসে গুড়ুক টানাই ভাল।

পাঁচু কিনা সংস্পর্শে এসেছে, একটু ছোঁয়াচ পেয়েছে তাদের, একুশের জোয়ারাস্তিক ভাঁটার আদর্শের এই চরম টানের দিনে একমাত্র যারা প্রাণের নাওকে স্রোতের বিপরীতে টেনে নিতে প্রাণপণ করেছে, পাঁচুর কথাবার্ত্তা তাই আশা ভরসা বিশ্বাস উদ্দীপনা জাগায়। গাঁয়ের শিথিল মন্থর নিঃস্ব জীবন চাষী কিশোরের, বাঁশঝাড় শালবন আম কাঁঠালের আদিম রহস্য ঘেরা ডোবাপুকুর, গোয়াল কুঁড়ে, হপ্তা হাট, জমিদারের দীঘি-দালান, দিনের

দেবতা, রাতের অপদেবতা নিয়ে দিনরাত্রি। তবু পাঁচুর আলগা ছাড়া ছাড়া আলাপ শুনলে কালীনাথেরও মনে হত পাঁচু বুঝি দলের প্রচার চালাচ্ছে!

চাষী কিশোর গা চুলকে খড়ি তুলে বলে, বাস্ রে, ইংরেজের সৈন্য কত!

পাঁচু বলে: বাঃ, বেশ বলছিস তুই হাঁদার মত! সৈন্য আছে তো হয়েছে কি? কামান বন্দুক আছে তো আছে, তাতে কি? এদেশে লোক যে কোটি কোটি! সেটা মনে আছে? এদেশে কত গাঁ কত শহর তার হিসাব রাখিস! সবাই ক্ষেপে গেলে সৈন্য দিয়ে কামান বন্দুক দিয়ে করবে কি? ধর্ না কেন আমাদের এই গাঁ-টা। ধর্ একশো সৈন্য এল, দু-চারটে কামান আনলো, তিন চারশো বন্দুক আনলো। আমরা বললাম, বটে? আচ্ছা রোসো, মজা দেখাচ্ছি। কানাই মনাই যত কামার আছে সবাই রাত জেগে দিশি বন্দুক বানালো, আমরা সবাই কোলোরাপটাস মোমঝাল দিয়ে দিশি বোমা বানালাম, বর্শা শড়কি লাঠি দা কুড়োল সব বানালাম। তিন-চার হাজার মেয়েপুরুষ একসাথে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম। ওই একশোটা সৈন্যের দামী দামী বন্দুক কামান কবার গর্জ্জাবে, কতক্ষণ গর্জ্জাবে? মোদের দু'-একশো মারতে মারতে মোরা ওদের কচুকাটা করে—

হায় রে কিশোরের কল্পনা! গান্ধীর সেই পুরানো স্বপ্নবৎ জনগণ-আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসীর আন্দোলনকে মিলিয়ে গড়ে তুলেছে প্রাকৃতিক অভ্যুত্থান! ভুলে গেছে যে ইংরেজের পাঁচটা রাইফেল গর্জ্জিয়ে হাজার লোকের অহিংস সভা ছত্রখান করে দিয়েছে। কিন্তু তাতেই বা কি এসে যায়! পাঁচু তো আর ঘোষণা করছে না যে কাল এরকম সর্ব্বভারতীয় বিরাট অখণ্ড অভ্যুত্থান বৃটিশ রাজের সৈন্যসামন্ত কামান বন্দুক উড়িয়ে দিয়ে দেশকে স্বাধীন করবে। পিসী কি পাঁচুকে রূপকথা বলত এই জন্যে যে ঘুম ভেঙে উঠেই সে কাল্লু মিয়ার খোঁড়া বুড়ো দেশী ঘোড়াটায় চেপে ইংলণ্ডে মেম বিয়ে করতে পাড়ি দেবে! কি ভাবে কোন্ কথাটা বলা হল সেটা ধরা চাষী ছেলে বুড়ো মেয়ে মরদের স্বভাব নয়, কথার তারা মর্ম্মটা নেয়। সে হিসাবে কি আর এমন খাপছাড়া অদ্ভুত কথাটা পাঁচু তাদের বলেছে? দীনহীন নরম অহিংস গোবেচারী সেজে কিছু হবে না, বাপ-পিতেমোর আমল

থেকে বিদেশীর যত লাথি ঝাঁটা জমা হয়েছে সব সুদে আসলে ফিরিয়ে দিতে হবে, এ ছাড়া কোন উপায় নেই—এ তো সহজ সরল বাস্তব কথা।

চাষী ছেলেরা এ সব কথা শুনতে চায় পাঁচুর কাছে। তারা পাঁচুকে ঘিরে নিজেদের গঠিত করে। একটা বিশেষ ঘটনায় জন পনেরো ছেলে এক সঙ্গে তার পরামর্শ চাইতে এলে পাঁচু আশ্চর্য্য হয়ে প্রথম টের পায় যে দলটা গড়ে উঠছে এবং এখন নেতৃত্ব দিতে হবে তাকে।

২

ঘটনা সেই চিরকেলে অনাচার।

গরীব চাষীর মেয়ে দেখে বড়লোক জমিদার বা তার ছেলের লোভ। এ ক্ষেত্রে মেয়েটি গণেশ সাঁতরার, ছেলেটি মেজকর্ত্তার। কলকাতায় উঁচু পরীক্ষা দিয়ে হেমন্ত দেশে এসেছে। গোবরে যত পদ্মই ফুটুক, তুকলি তেমন সুন্দরী নয়। তবে লোভ থাকে পুরুষের চোখে এবং মনের মধ্যে মেয়ের জন্য কত চেষ্টা চরিত্র আর হাঙ্গামা ঝঞ্ঝাটের বালাই দরকার হিসাব থাকে তার। সায়া ব্লাউজ ঢাকা যাদের দেখা অভ্যাস হেমন্তের, তারা কেউ এমনি শুধু একফেরতা একটি শাড়ী পরে সামনে এলে তুকলি কোথায় উড়ে যায়, কিন্তু তাদের রুচি আলাদা। বাপ হলে চর পাঠাত, হেমন্ত একেলে ছেলে, নিজেই গেল সাঁতরাদের বাড়ী। উদার ভাবে সাঁতরাদের কৃতার্থ করার জন্য গায়ের জোরে ঢোকার বদলে একটা ছুতো করে অন্দরে ঢুকে জাঁকিয়ে বসে বলল, ক'বিঘে জমিতে নতুন ধরনে চাষের পরীক্ষা করব গণেশ, আমার অনেক দিনের সখ। তুমি খেটেখুটে দেবে, দেখাশোনা করবে। তোমার ঘরদোরের অবস্থা তো—

আজ্ঞে এ বর্ষায় গলে যাবে।

সেদিন হাত ধরা পর্য্যন্ত। তুকলি হাঁ না জোর করে বলতে ভরসা পায় নি। বলা কি যায়! মেজকর্ত্তার বড় ছেলে! যার শখ হলে গরীব মানুষের ঘর জ্বলে যায়, মানুষ এ পৃথিবীর বাতাসে শ্বাস টেনে স্বর্গে গিয়ে সেই নিশ্বাস ফেলে।

অন্য কোন ফাজিল ছোঁড়া হলে কি উচিত ভুকলিকে বলে দিতে হত না, এ বজ্জাতটার কথা ভিন্ন এর ক্রোধ আর প্রতিহিংসা কে ঠেকাবে, কিসে ঠেকাবে, ভিটেমাটি ছাড়া করে সপরিবারে তাদের উচ্ছন্নে দেওয়া এর পক্ষে কত সহজ! অন্য দিকে, ভাঙা ঘর দুয়ার যদি নতুন হয়, বাঁধা জমিটুকু যদি ছাড়ানো যায়, পেট ভরে যদি দুটো খেতে মেলে, গায়ে যদি দুটো শাড়ী গয়না ওঠে—এসব তুচ্ছ করে উড়িয়ে দেওয়াও তো তাদের পক্ষে সহজ নয়!

গণেশের ভাঙা কুটির ঘিরে সে রাতটি নামে বিহ্বল, ক্লেদাক্ত, ভয়ানক। অন্ধকার রাত্রির অতল রহস্যের মতই পুঞ্জীভূত ভয় ও লোভের সঙ্গে অসহায় একটি দীনহীন পরিবারের চরম সংগ্রামের রাত। এ জগতে এমন অদ্ভুত এত অসঙ্গত ঘরোয়া সংগ্রামও চলে অনুভব করতে পারলে অ্যাটম বোমার সংগ্রামী জগতেরও রোমাঞ্চ হত। লাভের হিসাব দূরে থাক্, একদিকে প্রায় সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা, তবু সেই সর্ব্বনাশের দিকে ঝুঁকে সুনিশ্চিত লাভ ও নিরাপত্তার ভরসার সঙ্গে লড়াই করা! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বরাবর তারা প্রণাম ঠুকেছে, দেবদেবীকে পূজো দিয়েছে, স্বর্গ আর নরক ছাড়া কোন ভবিষ্যৎ তারা জানে না, অথচ সেই বিরাট ঈশ্বরের সেই নিখুঁত বিধি-ব্যবস্থা তাদের এতটুকু কাজে আসে না। সর্ব্বশক্তিমান মেজকর্ত্তার ছেলের ভোগে ভুকলিকে লাগাবে কি লাগাবে না সে পরামর্শে ঘুণাক্ষরে ভগবানের নাম পর্য্যন্ত তারা উচ্চারণ করে না। তাদের ঘরোয়া ব্যাপারে, জমিদারের ছেলে তাদের মেয়েটাকে ভোগ করতে চায় এই সমস্যার বিচারে, পাপ-পুণ্যের হিসাব তারা তোলেই না। তারা যেন টের পেয়ে গেছে ও ঈশ্বর বল আর পাপ-পুণ্য বল—ওসব তাদের জীবন-মরণের হিসাব-নিকাশে আসে না।

শুধু সমাজ আর অভিজ্ঞতার হিসাব দিয়ে তারা আজ রাতের নৈতিক যুদ্ধ মাৎ করতে চায়। ভুকলি প্রায় নির্ব্বাক, মাঝে মাঝে দু-একটি কাটা কাটা কথা শুধু বলে, আলোচনার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। ভুকলি শুধু তাদের মনে পড়িয়ে দেয় যে সেও আছে, সেও একটা রক্তমাংসের মানুষ। তাতেই কাজ হয়।

গোমড়া মুখে ভেবে ভেবে শেষ পর্য্যন্ত তারা ঠিক করে, না, এ পথ ভাল নয়। এতে শেষ পর্য্যন্ত মঙ্গল হয় না।

গাঁয়ে দৃষ্টান্ত আছে, মেজকর্ত্তার নিজের নজর পড়েছিল ঘোষেদের বিনির ওপর। কি হল কি এল কি গেল দুদিন ভাল ঠাহর হল না, কোথায় রইল মেজকর্ত্তার শখ, কোথায় রইল বিনি, সমাজ গেল ধর্ম্ম গেল। বিনি আজ ঘুঁটেকুড়ুনীর বাড়া।

বড় ক্ষণস্থায়ী বড়র এই চোখের পিরিতি, হয়তো তিন রাত্রি মিলন সইবে না, বিষিয়ে যাবে। হেমন্তের মনে হবে, কেমন যেন পচা পচা গন্ধ ঢুকলির গায়ে, খস্‌খসে চামড়া, ভোঁতা হাবা কথা, টনটনে আদায়ের বুদ্ধি। বাবুদের ছেলেমেয়ের ফাঁকা পিরিত তবু দুটো মাস একটা বছর চলে' তবে ফাঁকিতে দাঁড়ায়, চাষীর মেয়ে বাবুর ছেলের দুদিনের বেশি ভর সয় না। মেয়েপুরুষের তফাৎ শুধু নয়, আকাশ-পাতাল তফাৎ। খিদের সময় যেমন হাঁসটা মুরগিটা দেখে প্রাণটা হঠাৎ চন্‌চনিয়ে ওঠে, ঢুকলিকে দেখে মেজকর্ত্তার ছেলের হয়েছে তাই, এ ফাঁদে ধরা দেওয়াটা উচিত হবে না।

হেমন্ত এসে শুনল, ঢুকলি মামাবাড়ী গেছে।

কদিন বাদেই এসবে আজ্ঞে।—ভয়ে ভয়ে গণেশ জানাল।

কি নির্লজ্জ বীভৎস হিংসা বংশানুক্রমিক জমিদারের! একেবারে তো প্রত্যাখ্যান করে নি, মুখে লাথি মেরে তো জবাব দেয় নি জঘন্য প্রস্তাবের, আচমকা আত্মসমর্পণ করতে ভরসা না পেয়ে ছল করে দুদিন শুধু সময় চেয়ে নিয়েছে। শুধু এই জন্য এমন দিশেহারা অত্যাচার! মনগড়া অপরাধের দায়ে গণেশকে বেঁধে এনে বেদম মার, মহাজন ত্রৈলোক্যকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জমি বে-দখলের মামলা রুজুর শাসানি, গভীর রাত্রে লোক পাঠিয়ে হানা দিয়ে ভাঙা ঘর দুয়ার তছ্‌নছ্‌ করা! এসব কি তবে ঢুকলির জন্যে, বালবিধবা কচি চাষাড়ে মেয়েটার জন্য হেমন্তের উন্মাদ ভালবাসার প্রমাণ? আগের দিন চোখে দেখে পরের দিন হাত ধরে টেনে এতই সে ভালবেসে ফেলেছে মেয়েটাকে যে কলকাতার উচ্চশিক্ষা ভুলে ভালবাসার নিয়মকানুন ভুলে যে ভাবে হোক মেয়েটাকে পাওয়ার জন্য যাচ্ছেতাই কাণ্ড আরম্ভ করেছে?

পাড়ার নকুল দাস, আগে সে পুলিসের জমাদার ছিল, এখন বুড়ো বয়সে

ঘরে বসে খায়, সে যেচে আপসের দায়িত্ব নেয়। গণেশকে ভৎর্সনা করে বলে, যে ছেলে খুশি হলে মেম বিয়ে করতে পারে, সে ছেলে তোর মেয়ের দিকে কেন তাকিয়েছে বুঝতে পারলি না হারামজাদা—মেয়েকে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিলি? বালির বাঁধ দিয়ে তুই সাগর ঠেকাবি? কাল মেয়েকে নিয়ে আয়গে যা। আমি এদিক সামলে নিচ্ছি।

সকালে গিয়ে হেমন্তকে কুঁজো হয়ে প্রণিপাত জানায়, মুচকি হেসে সবিনয় ভৎর্সনার সুরেই বলে, করছেন কি ছোটবাবু, মশা মারতে কামান দাগছেন? হারামজাদা গণেশ আজ মেয়েকে আনতে ভিন গাঁ গেছে, নইলে ওর কান ধরে টেনে এনে নাকে খত দেওয়াতাম।

মেয়ে আনতে গেছে?

আজ্ঞে আনতে গিয়ে সেখান থেকে না ভাগে। বড্ড ভয় পেয়ে গেছে। যা দাবড়ানিটা দিলেন!

কোথা ভাগবে?

স্বজন আছে, কুটুম আছে, তীর্থ বিদেশ আছে। দেনায় ঘরদোর জমিজমা মাথাটি বিকানো। শালার কি আছে, গাঁয়ে কোন্ লোভে ফিরবে?

হেমন্তকে চিন্তিত দেখে নকুল মুচকে হাসে, বলে, আপনি ভরসা দিলে ফিরিয়ে আনতে পারি। খরচাপত্র করে গিয়ে পড়ি একবার, কি বলেন? নগদ টাকা কিছু গুঁজে দিই হাতে!

ভুকলি কোথাও যায় নি, মামাবাড়ী থাকলে তো যাবে! বাড়িতেই লুকিয়ে ছিল। পাঁচুর কাছে যারা আজ এসেছে পরামর্শের জন্য, চেঁচামেচি শুনে এই ছেলেরা হৈ চৈ করে গিয়ে হাজির না হলে মাঝরাত্রে মেয়েটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেত। এরা গণেশকে ভরসা দিয়েছে। মাঝখানে নকুল আপসে সব মিটিয়ে দেওয়ায় হয়েছে মুশকিল। গণেশ আর চায় না যে ছেলেরা তাকে রক্ষা করুক। চিরদিনের রক্ষাকর্ত্তা জমিদার, সেই জমিদারের ছেলে ভবিষ্যৎ জমিদার হেমন্ত, তার রক্ষণাবেক্ষণেই গা ঢেলে দিতে গণেশ রাজী হয়ে গেছে।

এখন পাঁচু কি বলে?

আমি বলি কি, ভুকলিকে শুধানো যাক, সে কি বলে!

ষোলটি ছেলে চমৎকৃত হয়ে যায়, চুপ করে থাকে।

পাঁচু মর্মে মর্মে টের পায় নেতৃত্ব দেওয়া কি কঠিন কাজ! তার কথার মর্মই কেউ ধরতে পারে নি।

পাঁচু এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে থাকে, দু'বার গলা সাফ করে। মুখের ভাব কঠিন করে। ধীরে ধীরে বলে, খানিক সত্যি শুনি, খানিক গুজব শুনি। এলোমেলো আবোলতাবোল কত রকম কত কথা! আসল ব্যাপার জানি কি? তলে তলে কত কিছু ঘটতে পারে, গণেশ সাঁতরা বানিয়ে রটাতে পারে দশ কথা। তবে কি-না, দুকলি যদি বলে তার মন নেই, সে বাঁচতে চায়, সে ভিন্ন কথা। তাই ওকে শুধানো।

হারাণের ছেলে দানু বলে, তা বটে, তুই ঠিক বলেছিস পাঁচু! ও ছুঁড়ি যদি তলে তলে বজ্জাতি করে থাকে, তবে মোরা এর মধ্যে নেই। ওকে শুধোলে হবে কি?

পাঁচু বলে, উহুঁ, তা নয়। বজ্জাতি করেছে না করেছে সে মোরা দেখতে যাব না। বড়লোকের ছেলে যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে নষ্ট করে থাকে মেয়েটাকে, সে ওরা বুঝবে। জবরদস্তি অত্যাচার মোরা ঘটতে দেব না—বাস্। না কি বলিস?

সকলের উৎসাহ অনেক কমে গেছে টের পাওয়া যায়! পাঁচু নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলে, ওটা বললাম কথার কথা, মেয়েটা খারাপ হয়েছে এমন তো নয়! মোর মন বলে, ও খাঁটি আছে। নয়তো ওই শালার পো হাঙ্গামা করবে কেন? তবু একবার শুধিয়ে রাখা, পরে না বলতে পারে মোদের ব্যাপারে তোমরা এস নি!

এ যুক্তি সকলের মনে লাগে। তাই বটে, গণেশ বা দুকলি তো তাদের কাছে ধন্না দিয়ে বলে নি, মোদের বাঁচাও!

পাঁচুকেই দুকুলির মনের ভাব বুঝতে যেতে হয়। মেয়েদের মন বোঝার বিদ্যাও সে যেন শহরের স্কুলে আয়ত্ত করেছে। তবে চাষী মেয়েরা মোটে রহস্যময়ী নয়, ওতে তাদের লাভ নেই, পোষায়ও না। তখন বেলা হয়েছে, মেঘহীন আকাশে ঠাটাপোড়া রোদ। দুকলির মা শাক বাছছিল, উনোনের

তোলা কাঠ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে। রান্নাঘরটা পড়ে গেছে সাঁতরাদের, শোবার ঘরের দাওয়ার এক পাশে বেড়া দিয়ে রান্না হয়।

ঢুকলির মা বলে, পোড়াকপালে মেয়ে রে বাবা, ঘর না পুড়িয়ে কি ছাড়ে? সোয়ামিকে যে দিন খেলো হারামজাদি, সেদিন জানি ও মেয়ে নিয়ে মোর মরণ হবে।

তেমন ঝাঁজ নেই, জ্বালা নেই তার কথায়। নকুলের সঙ্গে গণেশের কত্তাবাড়ী দরবারে যাওয়ার খবর পাঁচু জানত। আধ-অন্ধকার ঘরে গণেশ শুয়ে ছিল, সেখান থেকে তার গর্জ্জন আসে, মেয়ে তোর করল কি, মেয়ে? বাগানে বেগার খাটা নিয়ে গণ্ডগোল, তাতে তুই মাগী তোর মেয়েকে টানিস কেন রে? ফের রা করবি তো মুখ থেঁৎলে দেব।

ঢুকলির দোষ কি সাঁতরা পিসী? পাঁচু বলে।

কে জানে বাপ কার দোষ?

পাঁচুকে উদ্দেশ করে গণেশ বলে, হেমন্তবাবুর শখ চেপেছে ফল-সবজির বাগান করবে, মোকে বলে বেগার খাটতে। না বলতে খাপ্পা হয়েছিল, আপসে চুকেবুকে গেছে। বড়লোকের রাগ কতক্ষণ রয়?

তা বটে। বড়লোক রেগেই রয়, আরও বেশি রাগ হলে সেটা বড়লোকেরও বেশিক্ষণ সয় না। ঢুকলির সঙ্গে আর মোকাবিলা না করলেও হয়, ব্যাপার বোঝা গেছে। গণেশ সোজা পথ ধরেছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ঢুকলি তাতে সায় দিয়েছে। মেয়ের জন্য তাই লাঞ্ছনার ভয় নেই গণেশের, আগামী পুরস্কারও মেয়ের কল্যাণে তার কপালে ঝুলছে। ঢুকলি আড়ালে গেছে— সামাজিক ভাবে।

সেটা অভ্যাস করতেই বোধ হয় ছেলেমানুষ পাঁচুর জন্য পর্য্যন্ত ঘরে আধ-অন্ধকারে ঢুকলি গা ঢাকা দিয়ে আছে।

সবাই জানবে, ঘোঁট পাকাবে, টিটকারি দেবে, কিন্তু তার বেশি যেতে কেউ সাহস পাবে না, না ব্যক্তিগত ভাবে, না সামাজিক ভাবে। কেউ বাড়াবাড়ি করলে হেমন্ত তাকে টিট করে দেবে।

তবে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়, মনটা এদের খুশি নয়, নেহাৎ নিরুপায় হয়েই

গা ভাসিয়ে দিয়েছে। তা, মানতে হলে শক্তিমানের দাপটকে এমনি করেই মানুষ মানে। তাতে হেমন্তের জবরদস্তি, কুৎসিত অত্যাচার কাটানো যায় নি, নিছক মন্দ মেয়ের কলঙ্ক বা মা-বাপের মেয়ে বেচার কেলেঙ্কারী হতে চলে নি ব্যাপারটা। কিন্তু তবু এ অবস্থায় অন্যায়টা ঠেকাতে এগুনো মুশকিল। বড়দের বা ছেলেদের সহানুভূতি জাগবে না, যার সর্ব্বনাশ তার যদি প্রতিরোধ না থাকে তো দশজনের কিসের গরজ? গণেশ নিজেই হয়তো গাল দিয়ে বসবে দশজনকে, একেবারে অস্বীকার করবে কারো কোন কুমতলব আছে তার মেয়ের সম্পর্কে!

কাকা যোকে শুধোতে পাঠাল, পাঁচু বলে, বলল কি, পাঁচু, তোর সাঁতরা পিসেকে শুধিয়ে আয়, ব্যাপার কি! বাবুরা যদি বাড়াবাড়ি করে, গাঁয়ে কি মানুষ নাই? সয় বলে কি সব অন্যায় সইবে গাঁয়ের লোক? গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো পক্ষে দাঁড়ালে গণেশ সাঁতরার ভয়টা কি?

তোর কাকার বড় দয়া। দয়া করে পাঠিয়ে দেছে, যা রে পাঁচু শুধিয়ে আয়, ব্যাপার কি!

এর পর কথা চলে না। পাঁচু বিব্রত বোধ করে এক ঘটি জল চেয়ে খায়। জল দেয় ডুকলির মা, ডুকলি যে ঘরে আছে তার কিন্তু প্রমাণ মেলে এবারে! চাপা গলায় গণেশের সঙ্গে সে কথা কইছে, দু-একটা ধারালো কথা পাঁচুর কানে আসে। নিমেষে পাঁচু চাঙ্গা বোধ করে। বাঁচবার উপায় থাকলে ডুকলি যদি বাঁচতে চায় তবে আর কিসের পরোয়া করে পাঁচু! হেমন্তের বাবারও সাধ্য নেই তাকে স্পর্শ করে।

কিন্তু বৃথাই আশা, অপমান ঠেকাবার পণ নিয়ে ডুকলি রুখে উঠে বিদ্রোহ করে না। ঘরের মধ্যে কলহের গুঞ্জন থেমে যায়, ডুকলি কাঁদছে কি-না বাইরের থেকে ঠিক ধরা যায় না। হাজার কাঁদলেই বা কি আসে যায়! নিজের মান বাঁচাবার যত সাধই তার থাক্, মরি বাঁচি গোঁ ধরে তেজের সঙ্গে নিজে যদি সে রুখে না দাঁড়ায়, এমন একটা সুযোগ পেয়েও মরিয়া হয়ে ঘরের আড়াল ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে এসে জোর করে মনের কথা না বলতে পারে, ঘরের কোণেই সে কেঁদে বুক ভাসাবে আর বাপের দুটো যুক্তি আর একটা ধমকে এমনি এলিয়ে

যাবে বাঁচার সাধ। ভুকলি যদি দোমনা হয় কার কি করার আছে? মন খারাপ করে পাঁচু বিদেয় হয়ে আসে।

৩

খান দুই বাড়ী আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে পাঁচু খানিকটা এগিয়েছে, পিছনে ভুকলির ডাক শোনে—অ পাঁচু, পাঁচু! একটু দাঁড়া না!

পাঁচু দাঁড়াতে দাঁড়াতে ভুকলি এসে তার নাগাল ধরে। পায়ে চলা সরু মেটে পথটা এখানে দুপাশের বাঁশঝাড় হেলে পড়ে ঢেকে রেখেছে। পাঁচুর হাত চেপে ধরে ভুকলি ব্যাকুলভাবে বলে, কি বলছিলি পাঁচু?

ক'দিনের ভয় ভাবনায় ভুকলির মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে, কালিমাড়া মুখে তার রাজার ছেলের সঙ্গে পিরিতের সুখকল্পনার চিহ্নও নেই। পাঁচু নিজেকে ধিক্কার দেয়। হাঃ, কালীনাথের দলের সে বিশ্বাস পেয়েছে, পাকা কানাইরা তার বন্ধু, তাই মগজে তার সব সময় মস্ত মস্ত চিন্তা গিজ গিজ করে, সোজা কথা সহজভাবে আর ঢোকে না মাথায়। এমন একটা ব্যাপারে গাঁয়ের ছেলেরা উৎসাহী হয়ে যেচে এল তার কাছে বিহিতের ব্যবস্থা করতে, সে গা ভাসিয়ে দিল চিরকেলে ঝিমানো ভীরুতায়, সাবধানে চুলচেরা হিসাব করতে বসল এতে ওই হয়, ওতে ওই হয়! একটা কুৎসিত অন্যায় ঘটতে যাচ্ছে, ছেলেরা কোমর বেঁধেছে সে অন্যায় ঠেকাতে, সে কোথায় উৎসাহের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে কাজে, তার বদলে তার শুধু মাথাব্যথা অন্যায়টা ঠেকানো উচিত কি উচিত নয়! অত্যাচার প্রতিরোধের প্রথম শর্ত্ত যেন কেউ অত্যাচার চায় কি চায় না স্থির করা। ছি, পাঁচু ছি!

বলছিলাম, বাবুদের ভয়ে পাঁক গিলতে হবে? গাঁয়ে মানুষ থাকে না? তিন গুঁতোতে ভাঙা যায় না হারামজাদার ছিঁচলেমি? তা তোরাই যদি না চাস তো—

না চাই কি গো! কে বললে চাই না?

তোর বাপ যে গাল দিলে মোকে?

বাপ না বাপ, মাথা ঠিক আছে? ভয়ে হাত পা সেঁধিয়ে গেছে পেটের মধ্যে।

পাঁচু বলে, বটে? তা দাদু বললে, তোর নাকি ফুর্ত্তি খুব, কলকাতা যাবি, মোটর চাপবি!

দাদুর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব। ছোঁড়া মোর ফুর্ত্তি দেখেছে, না? ওর বোনকে বাঘে ধরুক ঘোগে খাক, ও যাক ফুর্ত্তি দেখতে!

তা, তোমার মনের খবর কে জানবে বলো? বাঘে ধরলে তো চেঁচায় মানুষ, দশটা আপন জনকে তো ডাকে যে, মোকে বাঁচাও গো।

তোর বৌকে বাঘে ধরলে দেখিস কত চেঁচায়, গলা দিয়ে কত আওয়াজ বেরোয় দেখিস! তোর বৌকে যেন দশটা বাঘে ধরে পাঁচু, তার মধ্যে যেন কটা সাহেব বাঘ থাকে।

পাঁচু তখন খুশি হয়ে তাকে ভরসা দিয়ে বলে, আচ্ছা যা, বাঘে তোকে ধরবে না ঢুকলি, ভয় নেই। বাঘ আমরা জব্দ করব।

ঢুকলি মিনতি করে বলে, ছায়ায় একটু বসি আয় পাঁচু। আড়ালে বসে কটা কথা কই।

পাশের বাঁশবন প্রায় ছুঁয়েছে, তার মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্তরাল ও ঘন নিবিড় ছায়া। কথা বলবার তাগিদ পাঁচুও বোধ করছিল। শক্ত হওয়ার মর্ম্মটা ঢুকলিকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। কিসে তার সত্যিকারের ভরসা সে ধারণাও হয়তো তার নেই।

পাঁচুকে ঢুকলি জঙ্গলের গভীর গহনে টেনে নিয়ে যায়, আচমকা শান্তিভঙ্গে মস্ত একটা বিষাক্ত সাপ কয়েক হাত তফাৎ দিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে পালিয়ে যায়, এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়ানোর বেশি গ্রাহ্যও করে না। মানুষের ভয়ে দু'দিন চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে থেকে কি যেন হয়েছে ঢুকলির, মানুষের চোখ কানের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েও তার স্বস্তি নেই, আরও সে নিরাপদ আড়াল চায়।

কোথা চলেছ?

ওই হোথা বসিগে' চ'।—ঢুকলি জঙ্গলের আরও ভেতরের দিক দেখিয়ে

দেয়। বাঁশবনের সেই দুর্গম নির্জ্জন স্থানটিতে পৌঁছে পাঁচু দেখতে পায় কয়েক হাত জায়গা সাফ করে একটি চাটাই বিছিয়ে রাখা হয়েছে, কাছে আছে একটি সরা-চাপা মাটির কলসি।

ঢুকলি বলে, চুপি চুপি জায়গাটা খুঁজে রেখেছি, বাড়ীতেও বলি নি। মুখপোড়া এলে টুক করে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রইতাম।

ছোট ছোট নিশ্বাস ফেলে ঢুকলি। পাঁচু অভিভূত হয়ে থাকে। এবার তার ঢুকলির কাছে নিজেকে ছোট মনে হয়, একটা মেয়ের কাছে!

এসো মোরা বসি।

চাটাইয়ে বসে হেসে কেঁদে কত কথাই ঢুকলি তাকে বলে, রাত্রিবেলা ভয়ে আঁৎকে আঁৎকে ওঠার কথা বলতে বলতে সে গা ঘেঁষে আসে পাঁচুর। জগৎ-সংসার যখন তার ঘাড় মটকে দিতে উদ্যত হয়েছে, একজনকে খুঁজে পায় নি ভরসা করে যার মুখের দিকে তাকাতে পারে, তখন একা সে সাপখোপের এই ভয়ানক জঙ্গলে আত্মগোপনের স্থানটি খুঁজে বার করেছিল—আজ এখন সেইখানে সে বন্ধু পেয়েছে একজন, পৃথিবীতে তার একমাত্র আপনজন! কিশোর প্রাণের অতল কৃতজ্ঞতায় কখন সে পাঁচুর গলা জড়িয়ে ধরে।

পাঁচু সাহস দিয়ে বলে, ভয় কি, আমি তো আছি!

তাই বটে। চাষার ছেলে পাঁচু থাকতে রাজপুত্রে ঢুকলির কিসের ভয়, কিসের লোভ?

আকাশের মাঝামাঝি সেই সূর্য্য, তেমনি প্রচণ্ড রোদ। আটুলিগাঁর মেটে পথ কুঁড়ে ঘর বনবাদাড়, কর্ত্তাদের দোতলা দালান, শালবনের সবুজ ঢাল, সব তেমনই আছে বাঁশবনের সোঁদাগন্ধী নিবিড় ছায়ায়। নতুন একটা পৃথিবীর জন্ম হল পাঁচুর জন্য! অথবা তার কিশোর জীবনের সমস্ত শোভা সমস্ত আনন্দ সব তেজ সব উদ্দীপনায় সামঞ্জস্য ঘটেছে। এই চড়া রোদে ঘামতে ঘামতে বাড়ীর পথে হেঁটে চলায় তাই দিগ্‌বিজয়ী নাচের আমেজ বোধ হয়। প্রথমেই মনে হয়, পাকা কি ভাববে? এ কৌতূহল এত প্রচণ্ড, পাকার মনোভাব আন্দাজ করতে এমন আগ্রহ বোধ করে পাঁচু যে, তার ইচ্ছা হয় এখুনি আবার

ঢাকা রওনা হয় পাকাকে শুধু এই কথাটা জিজ্ঞাসা করে আসতে। পাকা নিশ্চয় হাসবে, নয় ছি ছি করবে। পাকা ভালবাসার কাব্য জানে। তার কাব্যের জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাবে। ভালবাসার অনেক প্রস্তুতি, অনেক আয়োজন, অনেক হাঙ্গামা। বলা নেই কওয়া নেই আচমকা বাঁশঝাড়ের পচা হাওয়ায় কি প্রেমের আনন্দ সৃষ্টি হয় ?

পাঁচুর মুখে একটু দুষ্টামিভরা মুচকি হাসি ফুটে থাকে। পাকার সঙ্গে তার তর্ক নেই। তার শুধু জানার ইচ্ছা পাকা কি বলবে!

৪

বেলা থাকতেই গণেশ গিয়ে হেমন্তের দরবারে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। তার মুখের ভাব করুণ, চোখ প্রায় ছলছল করছে।

বলতে ভরসা পাই নে ছোটকত্তা! কাল বাগানের কাজ শুরু করতে লাগব।

কেন ?

আজ্ঞে মামাবাড়ী গিয়ে মেয়েটা জ্বরে পড়েছে। দেখতে যাব।

অপমানে ফরসা মুখ রাঙা হয়ে যায় হেমন্তের। নকুল বলল রাজী হয়েছে, আবার বিগড়ে গেল গণেশ ? ঘরের কোণে দোনলা বন্দুকটা ঠেস দিয়ে রাখা ছিল। সেটা হেমন্ত হাতে তুলে আনে। ছাইবর্ণ হয়ে যায় গণেশের মুখ।

তুই শালা ইয়ারকি পেয়েছিস আমার সঙ্গে ? পাখী মারতে গিয়ে খানিক আগে দেখে এলাম মেয়ে তোর জল আনছে, মামাবাড়ী গিয়ে জ্বরে পড়েছে ? তোর ক'গণ্ডা মেয়ে রে হারামজাদা ?

মাথা হেঁট করে থাকে গণেশ। ভয়ে লজ্জায় তার বুক ফেটে যায়। এমনি বাঁকা বাঁকা ভাষা আড়াআড়ি কথাবার্ত্তাই হয়েছে তার হেমন্তের সঙ্গে। হেমন্ত কখনো বলে নি তোমার মেয়েকে আমার চাই গণেশ, সেও কখনো বলে নি মেয়ের বদলে আমায় কি দেবে। মেয়েটা তার উহ্য থেকেছে তাদের দরদস্তুরে। খুঁজে পেতে এ মেয়ের সে বিয়ে দিয়েছিল। জামাই তার পায়ে

হাত দিয়ে প্রণাম করত, মাথা নত করে তার প্রীতিবাক্য সদুপদেশ শুনত।] এ ছোঁড়া তাকে শালা হারামজাদা বলে গাল দিচ্ছে! সে কি-না দরদস্তুর করেছিল, অসামাজিক উপায়ে মেয়ের বয়সকালের সাধ আহ্লাদের রফা সামঞ্জস্য করবার সঙ্গে মোটা কিছু পণ বাগাবার চেষ্টা করেছিল, তাই আজ তার এমন লাঞ্ছনা!

জমি নিয়ে খাজনা নিয়ে বেগার খাটা নিয়ে তাকে বেঁধে এনে হেমন্ত মুখে থুতু দিলে বুকে লাথি মারলে তার এতটা লাগত না। সে আলাদা ব্যাপার, সে ব্যাপারের আলাদা রীতি, আলাদা নিয়ম। নির্জ্জন ঘাট থেকে পথ থেকে তুকলিকে হেমন্ত যদি ধরে নিয়ে যেত গায়ের জোরে, সেও হত আলাদা কথা। সামাজিক বিয়ের জন্য হোক বা না হোক, মোটামুটি তার মেয়ের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়তে তার সঙ্গেই বোঝাপড়ায় নেমেছে হেমন্ত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তার বাপের মর্য্যাদা বরবাদ করে নি। সে-ই আজ সব আড়াল তুলে দিয়ে শালা হারামজাদা বলে গাল দিচ্ছে মুখোমুখি।

চালাকি ছাড়, গণেশ! দশখানা করকরে নোট গুনে নিয়ে এখন বজ্জাতি?

নোট?

ওরে শূয়ার! এখন আকাশ থেকে পড়লি? নকুল তোকে টাকা দিয়ে আসে নি?

বাগানো তুনলা বন্দুকের দিকে চেয়ে গণেশ ধীরে ধীরে বলে, না, কেউ মোকে টাকা দেয় নি। তোমার টাকা আমি চাই না।

শুনে হেমন্ত তৎক্ষণাৎ নরম হয়ে যায়। বন্দুকটা টেবিলে রেখে বলে, নকুলটা তা হলে বজ্জাতি করেছে, টাকা তোমায় দেয় নি? দাঁড়াও ওকে ডেকে আনাচ্ছি। তোমার সামনে ওর দুটো কান যদি আমি কেটে না নিয়েছি—

সে তুমি কেটো। গণেশ বলে, কান কেন, গলা কেটো। আমি তোমার টাকা চাই নে। একশো কেন, লাখ টাকা চাই নে।

এমন আবেগময় ব্যাপার, অথচ জমিদার-বাচ্চা হেমন্তের কাছে কোন মূল্যই পেল না। তার হল শুধু জ্বালা! সে জ্বালা নিবারণ করতে গভীর রাত্রে জন

কতক লোক নিয়ে সে চড়াও হতে গেল গণেশের ভাঙা কুঁড়েতে। আহা, যেন রূপকথার রাজকুমার চলেছেন দৈত্য-দানবের কবল থেকে রাজকন্যার উদ্ধারে!

চাষী ছেলেদের হাতে নিদারুণ মার খেয়ে তারা ফিরে এল। এমনটা তারা অবশ্য ভাবতেও পারে নি, আগে জানলে প্রস্তুত হয়েই যেত।

হেমন্তকে নাকে খত দেওয়াল ছেলেরা। টিকলো নাক আর চেরা থুতনির খানিকটা চামড়া উঠে গেল। হেমন্ত সত্যই রূপবান, সুন্দর ছাঁচে ঢালা তার মুখখানা, বনেদি জমিদারের ঘরে বংশানুক্রমে রূপসী মেয়ে কেনার ফলে সাধারণত যেমন হয়। লণ্ঠনের আলোয় বীভৎস কুৎসিত দেখাল হেমন্তের মুখ। ভেতরের এক কদর্য্য রোগই যেন ফুটে বেরিয়েছে।

রাত্রেই চারিদিকে জানাজানি হয়ে যায়। ঘুম স্থগিত রেখে আটুলিগাঁ উত্তেজিত জটলা চালায়। রাগে দুঃখে বুক ফেটে যায় মেজকর্ত্তা বসন্তের, হাত-পা কামড়ে তার মরতে ইচ্ছা করে। অতরাত্রে হাতের কাছে কেউ নেই, তাই হেমন্তের মা'র উপরেই একচোট ঝাল ঝাড়ে। একটা চাষার মেয়ে বাগাতে কেলেঙ্কারি করে, বংশের নাম ডোবায় এমন হতভাগা অপদার্থ ছেলে সে বিইয়েছে কেন, এই হল হেমন্তের মা'র অপরাধ! বদ বংশের মেয়ে না হলে তার পেটে এমন ছেলে জন্মায়?

তোমাদের কাছেই শিখেছে অকাজ কুকাজ। যেমন বাপ ছিল, তেমনি ছেলে হয়েছে।

শিখেছে? নাকে দড়ি দিয়ে যাদের টেনে আনবে তাদের কাছে কানমলা খাওয়া শিখেছে?

বহুদিন পরে বসন্ত আজ আবার হেমন্তের মাকে মেরে বসে। তার জমিদারীতে বাস করে তাকে প্রজারা অবজ্ঞা করছে এই মনঃপীড়া নিয়ে আজকাল তার দিন কাটে, নিজের ছেলের এই আত্মসম্মানবোধের অভাবে যেন তার চরম হল। প্রজার ঘরে এদিক ওদিক দু'টো একটা ফুল ফুটলে, চোখে পড়লে জমিদারের, জমিদারের ছেলের পূজায় তা লাগে। কিন্তু এই কি তার প্রক্রিয়া? হেমন্ত কি গাঁয়ের সাধারণ বখাটে ছোঁড়া যে কাঙালের মত পিরিত করতে চাষার বাড়ী যাবে, চোরের মত মার খেয়ে নাকখত দিয়ে বাড়ী ফিরবে?

সামান্য চাষার তুচ্ছ একটা মেয়ে! হুকুম দিয়ে ডেকে পাঠালে যে আসে, না এলে যাকে বাপ-দাদা সমেত পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে আনা যায়। গায়ের জোরে মেয়েটাকে ধরে আনিয়ে হেমন্ত যদি কেলেঙ্কারি করত তাতেও গৌরব ছিল বসন্তের।

এখন শুধু ভরসা, হেমন্ত প্রচণ্ড প্রতিঘাত হানবে। ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে সমস্ত লজ্জা অপমান কলঙ্ক। আতঙ্কে গলা বুজে যাবে আটুলিগাঁর, বুক ছোট হয়ে যাবে—আজ রাত্রির ঘটনা তুচ্ছ হয়ে তলিয়ে যাবে ভয় ও ভক্তিতে। সকালে তাই শত শত বার বসন্তকে নিজের মৃত্যু কামনা করতে হয়, অসহ্য ক্রোধের জ্বালার মধ্যে আসে অকথ্য যন্ত্রণাবোধ, হতাশা। ভোরে আটুলিগাঁর কাক ডাকবার আগে হেমন্ত শহরে পালিয়ে গেছে।

আটুলিগাঁর মেজকর্তার ছেলে চাষার হাতে মার খেয়ে রাতারাতি ভেগেছে কলকাতায়।

আমার ছেলে নয়, মধু। অনেকবার সন্দেহ জেগেছে, আজ প্রত্যয় হল। ছোটলোক চাকর-মুনিব কেউ ওর জন্ম দিয়েছে। ত্যাখো, ও যখন ওর মার পেটে এল আমি বেশির ভাগ সময় সদরে, নয় কলকাতায় থাকতাম—

হেমন্তের মাকে মাঝে মাঝে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেওয়ার জন্য ছাড়া কোনদিন যে খটকা বসন্ত কারো কাছে প্রকাশ করে নি, মনের মধ্যে পুষে রেখেছে, আজ তা বেরিয়ে আসে। মধু ভটচাজ অবশ্য বহু কালের ইয়ার স্তাবক, এ রকম মানসিক অবস্থায় এ সব লোককেই বেশি অন্তরঙ্গ মনে হয়। বাপ ছিল এ অঞ্চলের বিখ্যাত উকিল, মধু কিছুদিন ডাক্তারি পড়েছিল, চিকিৎসা পেশা করে গাঁয়ে আছে। বাপের জমিজমা কিছু অবশিষ্ট আছে, টাকা-পয়সা-সম্পত্তির বেশির ভাগ উড়ে গেছে বয়স-কালে। লোকটা ঝানু।

মধু বলে, মাথা বিগড়ে গেছে? যা-তা বলছ কেন? অন্যের কাছে তোমার চেহারা পেয়েছে, না?

যাই বল মধু, আমার ছেলে ভয়ে পালিয়ে যেত না।

মধু মৃদু হাসে।—ভয়ে? এত বড় জমিদারি চালালে কি হবে, তোমার ভাই এ সব বুদ্ধি কম। লজ্জায় পালিয়েছে ছেলেটা, ভয়ে নয়। একালের ছেলে, শহরে পড়েছে, ঘষামাজা পেয়েছে, এই যাকে বলে কি-না মার্জ্জিত রুচি। একটা ছুঁড়ির সঙ্গে ফচকেমি করতে গিয়েছিল, লোকে কি ভাবছে, কি করে সবাইকে মুখ দেখাবে, এই সব ভেবে লজ্জায় পালিয়েছে। বুঝলে না?

আবার বলে মধু, ছেলে যাক না শহরে, কি হয়েছে? এ ব্যাপারটা না ঘাঁটাই তো ভাল। যতই হোক, মেয়ে নিয়ে ব্যাপার, লোকের মনটায় নানা রকম হয়। শাস্তি দিতে চাইলে কি ছুতোর অভাব ঘটে? ওই গণেশটাকে, ছোঁড়াগুলোকে, ছুঁড়িটাকে ঠুকে ঠাণ্ডা বানিয়ে দাও। হুকুম দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো।

ছোঁড়াগুলো কে জানো মধু?

জানি বৈকি। বুড়োগুলোকেও জানি।

বয়স্করা কিন্তু ছেলেদের মতলব জানত না, পিছনে ছিল না। জ্ঞানদাস পর্য্যন্ত ভাসা ভাসা জেনেছিল। ঘটনার পর শুধু সে আর তারই মত দু-চারজন গোঁয়ার কাজটা পছন্দ না করেও সমর্থন করেছে। সাধারণভাবে বয়স্কদের সমাজ চমকে গেছে ছেলেদের কাণ্ডে, শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এ নিছক গোঁয়ারতুমি; শোচনীয় অবিবেচনা। এ ছাড়া কি আর উপায় ছিল না হেমন্তকে ঠেকাবার, যাতে চারিদিক বজায় থাকত, কর্ত্তাবাবুরা আহত অপমানিত ও কুপিত হত না? জমিদারের ছেলেকে ঠেঙানো ভাল, কিন্তু ঠেঙিয়েই কি পার পাওয়া যায়? জমিদারও ঠেঙাবেই, সেটা কি এখন ঠেকাতে পারবে ছেলেরা? আঘাত যে ব্যাপক ভাবেই আসবে, দোষী নির্দ্দোষ নির্ব্বিশেষে শাস্তি পাবে, নাস্তানাবুদ হবে, তাও জানা কথাই।

এখন কোন্ দিক দিয়ে কি ভাবে অত্যাচার আসে, বড়দের তাই ভাবনা।

বসন্তের ছেলে না হয়ে সাধারণ কেউ হলে এ ব্যাপার নিয়ে সামাজিক মজলিস বসত, ব্যাপারটার সঙ্গতি-অসঙ্গতি এবং কি করা-না-করা নিয়ে। রসালো মজাদারও হত মজলিসটা, ঠাট্টা তামাসা, কথা কাটাকাটি রাগারাগি এবং হয়তো বা ছোটখাট দু-একটা হাতাহাতিতে এবং মিটমাট হত জোড়াতালি

দেওয়া মীমাংসায়। কিন্তু জমিদারের ছেলে-ঘটিত এ ব্যাপারে প্রকাশ্য মজলিস অসম্ভব। কে ঘাঁটতে যাবে বিষয়টা, কে ঘোষণা করবে যে সে জানে কি ঘটেছিল, সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা তো দূরের কথা।

হাটে মাঠে ঘরের দাওয়ায় দু-চারজনের মধ্যে সাবধানে ঘরোয়া আলাপ আলোচনাই চলে। সেই গুজবেই মুখরিত হয়ে থাকে আটুলিগাঁ।

জ্ঞানদাস আপসোস করে বলে, আগে একটু পরামর্শ করলি না পাঁচু!

কি পরামর্শ? ঘরে ডাকাত পড়েছে তার পরামর্শ কি?

মেয়ে নিয়ে কাণ্ড, এ বড় ঝকমারি কাজ। লোকে এগোয় না মোটে, সায় দেয় না। খাজনা বন্ধের ব্যাপারে ছাখ, বুক ঠুকে সব ঘাড় তুলে দাঁড়িয়েছিল। এতে মন করবে কি, নোংরা ব্যাপার ওতে গিয়ে মোর কাজ নাই। ঠেঙিয়েছিস আচ্ছা করেছিস, ওর বাপ শালাকেও ঠেঙানো দরকার। তা ঠেঙালেই তো হয় না, আঁটঘাঁট বাঁধতে হয় আগে।

কি আঁটঘাঁট বাঁধব?

পাড়ায় গাঁয়ে ঘোঁট পাকাতি আগে যে সবাই ছাখো গরীবের 'পরে কি অত্যাচার। বাবুদের ছেলে জবরদস্তি মেয়েছেলের ধর্ম্ম নষ্ট করেছে। দু-চারজন ভদ্দরলোককে মধ্যস্থ মানতি। তাতেই ভড়কে যেত বজ্জাতটা, মিটে যেত ব্যাপার। তবু যদি আসত জোর খাটাতে, তখন পিটিয়ে দিতি। ব্যাপার হত কি, আগে থেকে হৈ চৈ করা থাকলে দশজনকে পিছনে পাওয়া যেত। রাগ হত সবার।

খুব সহজ রাজনীতি। পাঁচুও বোঝে। কিন্তু বাঁশবনে দুকলি তাকে রাজনীতি ভুলিয়ে দিয়েছে। আগে ঘোঁট পাকালে হেমন্ত যদি ভড়কে গিয়ে পিছিয়ে যেত, তাকে আঘাত করার, ঘাড় ধরে তাকে উঠানে নাকে খত দেওয়ানোর সুযোগও তাহলে যে ফসকে যেত! আগে পাঁচু জানত না, দুকলি নিজে জানিয়ে দিয়েছে সে সত্যই কত ভাল, কত ভীরু, কত অসহায়। টাকার জোরে বা গায়ের জোরে হোক, দুকলিদের নিয়ে যারা খেলা করে তাদের মত পাষণ্ড জগতে নেই। পাঁচুর আগের হিসাব পালটে গেছে। স্বেচ্ছায় খুশি হয়েও যদি কোনো দুকলি কোনো হেমন্তের সঙ্গে ভাব করে, পাঁচু তাকে এতটুকু

দোষ দেবে না, মন্দ ভাববে না। মন্দ শুধু হেমন্তেরা, সব দোষ ওই এক পক্ষের। ওদের ফাঁসি দিতে হয়।

শ্যামল তাকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। বলে, তা বৈকি, যা অন্যায় অত্যাচার সেটা তাই থাকে, হাসি মুখে খুশি হয়ে একজন মেনে নিলেই সেটা শুদ্ধ হয়ে যায় না।

যেহেতু গুরু-শিষ্য দুজনেরই মনে উঁকিঝুঁকি মারে তাদের বোধগম্য এই কথাটার পিছনের প্রকাণ্ড সত্যটা যে জগতে যত পাপ যত অনাচার সব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধনবান শক্তিমানদের সৃষ্টি, দুজনেই তারা অস্বস্তি বোধ করে। কৃতকার্য্যের জন্য পাঁচুর মনে কোনো ক্ষোভ, কোনো আপসোস নেই। নলিনী দারোগাকে মারবার সাধটা নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে তার মনে অসহ্য চাপ দিচ্ছিল। দুকলির মান বাঁচাতে হেমন্তকে শাস্তি দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় সাময়িক ও আংশিক একটা শান্তি এসেছে। বড় চিন্তা তাই একটু পীড়া দেয়, অস্বস্তি দেয়। এক দিকে মনে হয়, কত কথা চিন্তা করার ছিল, কিছুই হল না। অন্য দিকে সেই সঙ্গে মনে হয়, নিজের কাজের যেন অজুহাত খুঁজছে, কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করছে।

বিকেলে আকাশ ছেয়ে ঘনকালো মেঘ ঘনিয়েছে। মেঘ ঘনাবার সমারোহ মাথায় নিয়েই পাঁচু শ্যামলের কাছে এসেছে। জানা কথা যে আজ দারুণ বর্ষা নামবে। এত দেরি করে যখন এসেছে, মাঠের অর্দ্ধেক ফসল জ্বালিয়ে দিয়ে একেবারে বন্যা বইয়ে দিয়ে ছাড়বে এবারের বর্ষা। তাই নিয়ম।

বৃষ্টি নামবে। বাড়ী যাও।

যাই।

যাই বলেও পাঁচু যায় না। বন্ধুর জন্য তার মন কেমন করছিল। শ্যামলের সঙ্গে অনেকটা বন্ধু-সঙ্গ মেলে, যতই সে বুড়ো হোক। আনমনে সে বলে, এমনি মেঘ দেখলে পাকা কি করে জানেন? গুম্ খেয়ে যায়।

গুম্ খেয়ে যায়?

হাঁ। মেঘ হলে ওর নাকি মিছিমিছি মন কেমন করে, গান শুনতে সাধ যায়, ভয়ানক কষ্ট হয়। নিজেকে তাই ধিক্কার দেয়।

লণ্ঠনের আলোয় শ্যামলের মুখচোখের কৌতূহল সবটা ধরা যায় না।—ধিক্কার দেয়, না?

পাকা বলে, এই তো প্রমাণ ভেতরে ভেতরে আমি ভদ্দরলোক। মেঘ হয়েছে বৃষ্টি হবে, প্রতি বছর মেঘ হয়, প্রতি বছর বৃষ্টি হয়। মেঘ হলে আমার এমন বিশ্রী লাগবে কেন? জানিস পাঁচু, আমি ঢং করি তোদের সঙ্গে। ভেতরে ভেতরে আমি ওই খাঁটি ন্যাকা হাঁদা ভদ্দরলোকের বাচ্চা। এমন করে পাকা বলে, যদি শুনতেন!

বাইরে টপটপ মোটা মোটা জলের ফোঁটা পড়তে শুরু হয়েছে। শ্যামল বলে, পাকার একটা খবর পেয়েছি, তোমায় বলি নি।

পাঁচু সাগ্রহে বলে, পাকার খবর?

পাকাকে দলের সভ্য হতে বলা হয়েছে। পাকা রাজী হয় নি।

রাজী হয় নি! পাকা?

কালীনাথ ওকে একদিন বাতিল করেছিল। কালীনাথ নিজে ঢাকায় গিয়ে পাকাকে জানিয়েছে তার নাম কাটা ভুল হয়েছিল। সেদিন রাত্রেই কালী-মন্দিরে শপথ করিয়ে তাকে একেবারে দলের মেম্বার করা হবে। পাকা নাকি কেঁদে ফেলেছিল, বলেছিল, আর তা হয় না কালীদা। অনেক বুঝিয়েও কালীনাথ তাকে রাজী করতে পারে নি।

তলিয়ে না জানলেও পাঁচু মোটামুটি পাকার দুঃখ জানত। এই সেদিনও সে শ্যামলের এই বাড়ীতে কালীনাথদের সঙ্গে পাকাকে নিয়ে ঝগড়া করেছে, বলেছে পাকাকে তারা কেউ বোঝে না। ঢাকায় পাকার রকমসকম দেখে পাঁচু খুশি হতে পারে নি, কিন্তু বলা মাত্র বাপের রিভলভার ও সৎমার গয়নার বাক্স বিপ্লবের জন্য দান করে পাকা সেটা পুষিয়ে দিয়েছিল। তবু কালীনাথ নিজে গিয়ে বলাতেও পাকা রাজী হল না দলে আসতে?

পাকা কারণ দেখায় নি?

দেখিয়েছে। ওর নাকি ব্রহ্মচর্য্য নেই। ছেলেটা একটু পাগলাটে।

পাঁচুর মনে পড়ে। ব্যায়ামাগারে পাকার সেদিন নাম কাটা গিয়েছিল। খেদের সঙ্গে পাকা বলেছিল, চরিত্র কাকে বলে জানিস পাচু? গা বাঁচিয়ে

চলার শুচিবাইকে। চাদ্দিকে গোবর ছড়া দিয়ে মাঝখানে বসে থাকলে চরিত্র ঠিক থাকে, বিধবারা নইলে চরিত্র ঠিক রাখে কি করে বল্? গোবরের গণ্ডী পেরোলেই চরিত্র নষ্ট হয়! ব্রহ্মচর্য্য কাকে বলে শুনবি? যে বাড়িতে মেয়েলোক থাকে সে বাড়ির চৌকাঠ না ডিঙোনোতে। মেয়েলোকের ঘরের চৌকাঠ ডিঙোলেই ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়।

৫

বৃষ্টিতে ভিজে পাঁচু বাড়ী ফেরে। গণেশের বাড়ী হয়ে আসে। এগারটি ছেলে আজ রাত্রে গণেশের উত্তর ভিটের আধ-ভাঙা ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, ইতিমধ্যেই ঘরের অর্দ্ধেকটা জলে ভেসে গেছে। সমস্ত ঘরটা গলে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। ঘরের মেঝেতে বাঁশ পুঁতে যেদিকে বৃষ্টি পড়ে না সেদিকে মাচা তৈরি করে ছেলেরা জড়াজড়ি করে শুয়েছে। কাঠ বাঁশের অভাব তাড়াতাড়িতে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি, মাচাটির যায় যায় অবস্থা।

অন্য ঘরটি বর্ষায় বাসের একেবারে অযোগ্য। অতবড় চালায় খড় তুলবার সাধ্য গণেশের হয় নি, বুদ্ধিমানের মত দাওয়ার কোণটা ঘিরে নিয়ে সেইটুকু চালা সে মেরামত করেছে। হাত চারেক লম্বা হাত দুই চওড়া ঘর, তবে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে না। গুটিসুটি হয়ে গাদাগাদি করে শুয়ে বসে সুখে রাত কাটাও।

বাড়ীতে সবাই অন্ধকারে জেগেই ছিল, সুভদ্রা লণ্ঠন জ্বালে। বিকালে মেঘ ঘনাবার আগে গোবিন্দ পিয়ন একখানা চিঠি দিয়ে গেছে। আজ তার এ পাড়ায় চিঠি বিলি করবার দিন নয়, কৌতূহলের খাতিরে নিজের গরজেই এসেছিল। পাকার চিঠি, ইতিমধ্যে খাম খুলে পড়া হয়েছে। ধনদাস আর জ্ঞানদাস চেষ্টা করে সাধারণ চিঠির মোটামুটি পাঠোদ্ধার করতে পারে।

ধনদাস বলে, কি চিঠি লেখে তোর বন্ধু, মানে বোঝা দায়। বিষয়টা কি? আগে পড়ি।

বিষয়টা গুরুতর, কিন্তু লম্বা চিঠিতে এখানে ওখানে শুধু ছুঁয়ে গেছে পাকা, বাকি সব মনের কথা, জল্পনা কল্পনা। তবে সে জল্পনা কল্পনার মানেও পাঁচু আন্দাজ করতে পারে, পাকার বর্ত্তমান মনের ভাবটা চিঠিতে বেশ ফুটেছে। পাপ-পুণ্য উচিত-অনুচিত তা পাকা বলছে না, কিন্তু সকলের বেলা তো এক নিয়ম খাটে না, মানুষ তো স্বাধীন। যেমন ধর, কারো প্রাণ বাঁচাতে যদি কেউ চুরি করে, সেটা কি পাপ? কারোর ক্ষতি যদি সে না করে তবে যা খুশি করার অধিকার পাকার নিশ্চয় আছে। আমি মরি বাঁচি গোল্লায় যাই নরকে ডুবি অন্যের তাতে কি এল গেল, খুশি হলে আমি তো আত্মহত্যাও করতে পারি? আইনে অবশ্য বলে পারি না, কিন্তু আইন যারা করেছে তারা মূর্খ, যে আত্মহত্যা করবে সে নাকি আইনের ধার ধারে! অন্যের অনিষ্ট না করে নিজেকে নিয়ে যা খুশি করার অধিকার নিশ্চয়ই মানুষের আছে, নইলে স্বাধীনতা কিসের, নইলে তো শুধু অন্যের ইচ্ছায় চলতে হয়।

এসব কথা কিসে উঠল কেন উঠল পাকা তা লেখে নি, অনুমান করতে যদিও পাঁচুর কষ্ট হয় না। ঢাকায় কটা দিন সে চোখ কান বুজে ছিল না। পাকার মশারির বাইরে দাঁড়িয়ে সুধাকে কাঁদতে দেখার, ওভাবে কাঁদতে দেখার মানে বুঝতে, চাষাভুষোর ছেলে সে, তার মাথা ঘামাতে হয় না। সে না হয় হল, জগতে কারো ক্ষতি না করো পাপ করার অধিকার না হয় পাকা দাবী করল, কি করেছে না জানিয়েও পাঁচুর কাছে কৈফিয়ৎ দাখিল করল যা খুশি করার স্বাধীনতার, কিন্তু আত্মহত্যার কথা লেখে কেন পাকা? শুধু কি যুক্তি হিসাবে উল্লেখ করেছে, না অন্য কিছু আছে পাকার মনে? আরও অনেক কথা পাকা লিখেছে। তার জীবনে সব উলটো হয় কেন পাকা বুঝতে পারছে না। যেদিকে যাদের সঙ্গে যাবার জন্য সে ব্যাকুল হয়েছিল তারা একদিন বিনা দোষে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজ যখন তাদের সঙ্গে ভিড়বার উপায় নেই, নিজেই সে অধিকার নষ্ট করেছে, তখন আবার তার কাছে ডাক এল! পাঁচু জানে না, এমনিই হয়েছে চিরকাল, যখন যা চেয়েছে পাকা, এমনিভাবেই সব গোলমাল হয়ে গেছে।

কোন্ দিকে কাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল পাকা, আজ ডাক এলেও যাদের সঙ্গে ভিড়তে পারছে না, সে সব কিছু লেখে নি। পাঁচুর বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

বিষয়টা কি?—ধনদাস প্রশ্ন করে।

আবোল-তাবোল লিখেছে খেয়ালের কথা।—নিজের মাথায় আঙুলের টোকা দিয়ে পাঁচু বলে, মাথাটা এখনো ঠিক হয় নি।

অ!

ধনদাসকে বুঝিয়ে এড়াবার জন্য শুধু নয়, পাঁচুর সত্যই ধারণা হয়েছে যে পাকার মাথা বিগড়ে গেছে। সে পাকাকে জানে, ভালবাসে, তাই তার এলোমেলো ভাসাভাসা চিঠিখানার মধ্যে বেদনা ও হতাশার গভীরতা সে ধরতে পারে। আত্মহত্যার উল্লেখটা তাকে দারুণ দুর্ভাবনায় ফেলেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে শুয়েও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত এই দুশ্চিন্তা নেড়েচেড়ে জেগে থাকে। একবার ভাবে, এ অসম্ভব, সে মিছে ভাবছে, পাকার পক্ষে আত্মহত্যার কথা মনে আনাও সম্ভব নয়। আবার ভাবে, পাকার পক্ষে অসম্ভব কিছু আছে কি?

মাথা ঠিক থাকলে, বিবেচনার শক্তি থাকলে, একটা ব্যাপারকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে এত বড় করে তুলতে কি পারত পাকা, এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া অস্বাভাবিক ব্যাপার যা নয়? সারা জীবন তছনছ হতেই হবে, উদ্দেশ্য আদর্শ কাজকর্ম্ম সব পণ্ড হয়ে যাবেই যাবে, আত্মহত্যার কথা পর্য্যন্ত ভাবতে হবে! এমন ভয়ঙ্কর যদি এ ফাঁদটা, একবার পা দিলে জীবনে আর সামলে নেবার সাধ্য থাকে না, সংসারে তবে ব্যাটাছেলের তো বাঁচাই কঠিন!

তারা কি ফচকে ফাজিল ছোঁড়া, শুধু বজ্জাতি করে বেড়ায়, অসামাজিক ঘটনাচক্র তৈরি করার ফিকির ছাড়া জীবনে আর কিছুই নেই তাদের যে ওরকম কিছু ঘটলে চিরদিনের জন্য পাপী অভিশপ্ত হয়ে যাবে? পাকা কি তার নতুন মামীকে তৈরি করেছে, না ঘটনাগুলি সৃষ্টি করেছে? তাছাড়া, সে-ই যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে রসাতলে পাঠাল, এত বাড়াবাড়ি কেন পাকার!

ভালবাসা? এই যদি ভালবাসা হয়, এত কষ্টকর আর এমন সর্ব্বনাশা

ভালবাসা মাথায় থাক্ পাঁচুর। জগতের কোটি কোটি পুরুষ মেয়ের সাধারণ ভাবে সাধারণ পিরিত হলেই তার যথেষ্ট হবে। কোন মেয়েছেলের জন্য কোন ব্যাটাছেলে আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শ-পরিকল্পনা কাজকর্ম সব চুলোয় দিয়ে গুমরে গুমরে আত্মহত্যার কথা চিন্তা করবে, ভাবতেও পাঁচুর গা ঘিন ঘিন করে।

দুদিন ক্রমাগত বর্ষণের পর সকালের দিকে আকাশ খানিকটা পরিষ্কার হয়ে আসে। বিকালে আর এক দফা শুরু হয়ে রোদ ওঠে পরদিন। গ্রামের চিরকেলে জোড়াতালি দেওয়া শ্রীহীন বঞ্চিত জীবন বর্ষাকালে পাশবিক কদর্য্য হয়ে ওঠে। বহুযুগ পিছনের পুরোনো পচা সভ্যতা-ভব্যতার একটু যে আবরণ থাকে অন্য সময়, পশুর জীবন থেকে যা খানিকটা তফাৎ করে রাখে মানুষের জীবনকে, বর্ষায় যেন তাও ধুয়ে মুছে যায়। মনে করাও কঠিন হয়ে পড়ে যে এই মাটির পৃথিবীতে মানুষ স্থানে স্থানে শহর বানিয়েছে, কলকারখানা চালিয়েছে, শক্ত স্থায়ী পথে পথে যানবাহনের চাকা ঘুরিয়েছে, বৃষ্টিতে ইট পাথরের শুকনো আশ্রয় বানিয়েছে, দোকানে খাদ্য বস্ত্র আরাম সাজিয়ে রেখেছে স্তরে স্তরে, মানুষ আর বুনো নেই, সভ্য হয়েছে।

শ্যামল হাসে। ওয়াড়হীন তেলচিটে বালিশে ভর দিয়ে মাটির দেওয়ালে বসানো জানলার কাঠের গরাদের ফাঁকে সে বাইরের থৈ থৈ জল দেখছিল, একটা মরা বাছুর ভেসে এসে জানলার নীচেই বকুল চারার ডালে ঠেকে আছে। গরাদের আলকাতরা উঠে গেছে বহুকাল, পোকায় খেয়ে কাঠ জীর্ণ করে ফেলেছে। এবার শ্যামলের ঘরে জল পড়বে না আশা করা গিয়াছিল। প্রথম দিকে জল পড়ে নি, তারপর টিপ টাপ টুপ টাপ ফোঁটা পড়তে শুরু হয়েছে, চৌকি পাতার জায়গা মেলে নি। হোগলা এনে তার চৌকির ওপর টাঙিয়ে ঢাকতে হয়েছে। বর্ষা শ্যামলের সয় না, অল্প অল্প জ্বর হয়েছে। নিরুপায় হয়েই সে দু-এক মাস শহরে গিয়ে থাকতে রাজী হয়েছে। বর্ষণ স্থগিত হলেই তাকে নিয়ে যাওয়া হবে।

প্রতিহিংসাও বৃষ্টি ধরবার অপেক্ষায় ছিল।

কত ভেবে কি ভাবে ছকে নিয়ে প্রতি-আঘাতের ষড়যন্ত্র ও আয়োজন হয়েছিল প্রথমে ধরাও গেল না, ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হল। বিপিন ঘোষের বাড়ী ডাকাতি হল, শোনা গেল নগদে গয়নায় বেশ কিছু গেছে। বিপিন অবস্থাপন্ন লোক। কারো বাড়ীতে ডাকাত পড়া আশ্চর্য্য নয়, গাঁয়ের লোক আশ্চর্য্য হয়ে গেল এইজন্য যে ডাকাত পড়ার হৈ-চৈটা তেমন ভাবে তারা টের পেল না। ডাকাতি হলে রাতারাতিই সমস্ত গ্রাম টের পায়, হুলস্থুল হয়, ডাকাতির সময়েই অথবা ডাকাতরা চলে গেলে। গ্রাম দূরে থাক্, পাড়ায় সব লোকে ভোরের আগে জানতে পারে নি রাত্রে পাড়ায় একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, অনেকে শুধু একটা গণ্ডগোল টের পেয়েছিল।

জল্পনা কল্পনা বিস্ময় প্রকাশের সুযোগও ভাল রকম পেল না আটুলিগাঁর অধিবাসীরা। এগারটা নাগাদ সদর থেকে পুলিস এসে গাঁ ছেয়ে ফেলল। তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল চারিদিকে।

একটা ডাকাতি নিয়ে সরকারের এত মাথাব্যথা হয়, পুলিসের এমন তৎপরতা দেখা যায়, আটুলিগাঁর জানা ছিল না। চিরদিন গাঁয়ের লোকেরাই দল বেঁধে পারলে ডাকাতি ঠেকায়, না পারলে ডাকাতরা লুটেপুটে সরে পড়ে। ধীরে সুস্থে মন্থরগতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সরকারী তদন্ত ও প্রতিবিধানের মোটামুটি প্রহসন চলে। লোকবিশেষ ও অবস্থাবিশেষে কিছু ব্যতিক্রম হয়, এইমাত্র। বিপিন এমন কি বিশেষ লোক, স্বদেশী ডাকাতির মত এমন কি বিশেষ অবস্থা যে সরকারের এত বেশি টনক নড়ল!

আটুলিগাঁর সাধারণ মানুষ বোকা হাবা নয়, এক দুপুরের ঘটনার গতি আর ঘটনাগুলি ঘটাবার কাজে উৎসাহী মানুষগুলির যোগাযোগ দেখে ব্যাপারটা তারা বিকাল বেলাই মোটামুটি আঁচ করে নেয়। মধু ভটচাজ, তারিণী পাঁজা প্রভৃতি অনেকেই নাকি জানে, কারা ডাকাতি করেছে। তারা আটুলিগাঁয়েরই একদল কিশোর ও জোয়ান ছেলে এবং দু-চারজন বয়স্ক লোক। এগারটা নাগাদ পুলিস আসে, বারোটা নাগাদ গণেশ আর ধনদাসের বাড়ী খানাতল্লাস আরম্ভ হয়, তারপর চাষীপাড়ার আরও অনেক

বাড়ী। প্রথমেই গ্রেপ্তার হয়েছে গণেশ আর ধনদাস। জ্ঞানদাস আর পাঁচুকে পাওয়া যায় নি।

গণেশের বাড়ীতে সাতজন ডাকাত গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা অবশ্য ছেলে-মানুষ। এক দুপুরে একুশটি ঘর লণ্ডভণ্ড করে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষকে লাঠির গুঁতো মেরে ডাকাত খোঁজা হয়েছে। হাতকড়া পড়েছে একুশজনের হাতে। খাজনা বন্ধের বদনামি আটুলিগাঁর চাষীপাড়া! এত বছর পরেও পোড়া ভিটের কলঙ্কচিহ্ন আঁকা আটুলিগাঁ!

নলিনী তদন্তের ভার নিয়ে এসেছে।

পুলিস এসেছে শুনেই পাঁচুকে একরকম বগলদাবা করে জ্ঞানদাস খিড়কি পথে ডোবার ধারের বাঁশবন দিয়ে সরে পড়েছিল। কর্কশ থাবা, মোটা মোটা আঙুল, তাই দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে পাঁচুর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, পাঁচুর কোনো কথা কানে তোলে নি।

শেষে মুক্ত হাতে একটা পলাশ গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে পাঁচু প্রতিরোধ করায় সে থেমেছিল, মুঠি শিথিল করেছিল।

বুঝিস নে কেন বোকা হাঁদা, হট্টগোলের মধ্যে পেলে তোকে যে মেরেই সাবাড় করবে। তুই তো আসল আসামী।

কিসের আসামী?

পাঁচু তখনও ব্যাপার বোঝে নি। একুশ সালের গাঁ জ্বালানোর অভিজ্ঞতা জ্ঞানদাসের, তারপর থেকে এতগুলি বছর অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা। সে চট্ করে যা আন্দাজ করে ফেলেছে পাঁচুর তা বোঝার ক্ষমতা নেই।

হেমবাবুকে মেরেছিলি। এটা তার উস্থল শুরু বুঝিস নে তুই? এজন্য বলছিলাম অত বাহাদুরি করিস নে পাঁচু, করিস নে। খুদ্দুর প্রাণী তুই, বল বুঝে না কাজ করলে খতম হয়ে যাবি। সাধ করে খতম হতে তোর ব্যগ্রতা কেন রে হারামজাদা, কিসের শখ অত?

তবু পাঁচু মুখ গোমড়া করে থাকে, চারিদিকের জঙ্গলের মত।

উদ্দিকে ঢুকলিকে বুঝি লোপাট করলে এতক্ষণে!—জ্ঞানদাস ধিক্কার দিয়ে বলেছিল।

তখন গা ঝাড়া দিয়েছিল পাঁচু, জ্ঞানদাসের সঙ্গে প্রায় উড়ে গিয়েছিল গণেশের বাড়ীর পিছনের শুকনো মরা পাটক্ষেতে। গণেশের হাতে তখন হাত-কড়া পড়েছে, তার বাড়ীতে প্রলয় চলছে। পাঁচুকে পাটের আড়ালে দাবিয়ে রেখে জ্ঞানদাস একা গিয়েছিল। ঢুকলির জন্য জ্ঞানদাসকে বাহাদুরি করতে হয় নি। বাড়ীর পিছনে ডাঁটা-শাকের ক্ষেতে মাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলি দাঁড়িয়ে ছিল। বাড়ীর সামনে পুলিস এলেই গাঁয়ের মেয়েরা খিড়কি দিয়ে পিছিয়ে যায়। যাতে দরকার হলেই পুকুর ডোবায় নেমে জলের নীচে ডুবে আত্মগোপন করা চলে। দেশে যখন বর্গীরা আসত তখন থেকে বাংলা দেশের মেয়েরা এটা অভ্যাস করেছে।

জ্ঞানদাস বলে, ঢুকলি, মোর সাথে আয়।

ঢুকলি বলে, মা?

মার ডর নেই, তুই আয়।

সমাপ্ত